আল্লাহপ্রেমের গোপন কথা



ওসমান নূরী তপবাস

এরকাম প্রকাশনী

بسم الله الرحمن الرحيم

ইস্তাম্বুলঃ ২০১৯ খ্রি./১৪৪০ হি.

আল্লাহপ্রেমের গোপন কথা

ওসমান নূরী তপবাস

মূল বইয়ের নাম: Gönül Bahçesinden Muhabbetteki Sır
লেখক: ওসমান নূরী তপবাস
আনুবাদক: আখতারুজ্জামান
সম্পাদক: আহমাদ আমিন
প্রচ্ছদ: রাসিম শাকির ওলু
প্রকাশনায়: এরকাম প্রকাশনী
ISBN: 978-605-302-467-5
ঠিকানা: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No:60/3-C Başakşehir, İstanbul, Turkey
টেলিফোন: (+90-212) 671-0700 pbx
ফ্যাক্স: (+90-212) 671-0748
ই-মেইল: info@islamicpublishing.org
ওয়েবসাইট: www.islamicpublishing.org
Language: Bengali

এরকাম প্রকাশনী

আল্লাহপ্রেমের গোপন কথা

ওসমান নূরী তপবাস

এরকাম প্রকাশনী

সূচিপত্র

লেখক সম্পর্কে

ওসমান নূরী তপবাস-এর জন্ম ১৯৪২ সালে। তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের এরেনখোয়ে তিনি জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর মায়ের নাম ফাতেমা ফেরাইদি হাসিম এবং পিতার নাম মুসা তপবাস। তাঁর মা ফাতেমা ছিলেন এইচ. ফাহরি ফিগিলিসের কন্যা। তপবাসের শিক্ষা জীবন শুরু হয় এরেনকর জিহনি পাশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর ১৯৫৩ সালে ইস্তাম্বুলের অন্যতম প্রসিদ্ধ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ইস্তাম্বুল ইমাম খতিব উচ্চ বিদ্যালয়ে তার পড়াশোনা চলতে থাকে। বিশিষ্ট সব শিক্ষক, যেমন- এম. মেলালেদ্দীন অকটেন, মাহির ইজ এবং নূরুদ্দীন তোপকু সেখানে পড়াতেন। সেই সময় এম জেকাই কোনরাপা, ইয়েমেন দেদে, আহমেত দাউদপলু, মাহমুদ বায়রাম এবং আলি রিজা সাগমানের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ চলতে থাকে। উস্তাদ নাজিব ফাযিলের মত বিখ্যাত কবির সাথেও তার পরিচয় হয়। তিনি ফাযিলের বন্ধু মহলের সান্নিধ্যেও আসেন। তার বক্তৃতা শুনতে যোগ দিতেন। তাঁরই সম্পাদিত "বুয়ুক দোউ" পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন এবং অবশেষে হয়ে উঠলেন তার চিন্তধারার অন্যতম অনুসারী। ১৯৬০ সালে ওসমান নূরী তপবাস এবং চাচা আবিদিন তপবাস একই সাথে মাধ্যমিকের সনদ লাভ করেন।

গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর কিছু সময় ব্যবসা করেন। ১৯৬২ সালে তিলোর সিট-এ সামরিক বাহিনীতে অতিরিক্ত শিক্ষক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতা তার প্রিয় বিষয় হওয়ার কারণে তিনি সেনাবাহিনীতে থাকার সময় অনেকের সাথে সেই সূত্রে জড়িয়ে পড়েন।

সামরিক বাহিনীর পর্ব শেষ হওয়ার পর তিনি ব্যবসা বানিজ্যে ফিরে যান। কিন্তু কিছুই তাকে মানবতার সেবা এবং শিক্ষাদান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। ইলিম ইয়ায়মা জেমিয়েতি নামের একটি জ্ঞান প্রচার সমিতিরও তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর ব্যবসায়ের নীতি ছিল সেবাদানমূলক। তাঁর ব্যবসাটি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং গরীবের সহায়তা প্রদানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরিবারের সেবাকল্যাণমূখী কর্মকাণ্ডের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

১৯৮৫ সালে হুদায়ি ওয়াক্ফ নামের একটা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার অধীনে তিনি সেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্যের প্রায়োগিক ক্ষেত্র শুধু স্বদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রতিবেশী দেশগুলোর শিক্ষার্থীর মাঝেও এই সেবা

ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ধর্মীয় শাস্ত্র এবং কবিতার প্রতি অনুরক্ত তপবাস ১৯৯০ সালের প্রারম্ভে লেখালেখি শুরু করেন।

ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত তাঁর রচিত গ্রন্থমালার তালিকা এখানে দেয়া হলো।

১. Bir Testi Su (১৯৯৬), টেয়ারস অব দি হার্ট নামে ইংরেজীতে অনূদিত।

২. Rahmet Esintileri (১৯৯৭), প্রফেট অব মার্শি নামে ইংরেজীতে অনূদিত।

৩. Nebiler Silsilesi I-IV (১৯৯৭-১৯৯৮)

৪. Tarihten Gunumuze Ibret Isiklari (১৯৯৮)

৫. Abide Sahsiyetleri ve Muessesleriyle Osmanli (১৯৯৯)

৬. Islam Iman ve Ibadet (২০০০), ইংরেজী অনুবাদের নাম স্পিরিট এন্ড ফর্ম

৭. Muhabbetteki Sir (২০০১)। ২০০১ সংস্করণটি তুর্কি থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে।

৮. Imandan Ihsana Tasavvuf (২০০২)

৯. Vakif – Infak - Hizmet (২০০২)

১০. Son Nefes (২০০৩) শেষ নিঃশ্বাস নামে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

ওসমান নূরী তপবাসের রচিত গ্রন্থগুলো বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি আদর্শ সেমিনার, সম্মেলন এবং বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন।

তিনি বিবাহিত এবং চার সন্তানের পিতা।

ভূমিকা

হাজারো শুকরিয়া সর্বোচ্চ প্রশংসার অধিকারী সেই মহান আল্লাহ্ তা'আলার যিনি তাঁর অসহায় বান্দাদের তাঁর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসের আনন্দ এবং শান্তির আশির্বাদপুষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নামেই শুরু করছি। বিশ্ব জগতের অহংকার নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর উপর আশীর্বাদ এবং শান্তি বর্ষিত হোক। যিনি মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে অসীম আলোর দিকে পরিচালিত করেছেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বশীল সৃষ্টির পেছনে অনন্য গোপন রহস্য হল ভালবাসা। আর এ কারণেই যেখানে ভালবাসা নেই সেখানেই অবনতি। আর সেখানেই পূর্ণাঙ্গতার প্রকাশ ঘটে যেখানে এই অনন্য অনুভূতি অর্থাৎ ভালোবাসা রয়েছে। মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী রাহ. যেখাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

আল্লাহ্ মেঘের কানে একটি গোপন কথা ফিস ফিস করে বলেছেন; আর তা করা মাত্রই মেঘ বৃষ্টিরূপী কান্না হয়ে ঝরে পড়েছে। কখনও তিনি সেই অনন্য রহস্য দিয়ে গোলাপকে সৃষ্টি করলেন, গোলাপ রং এবং সুগন্ধ দ্বারা সৌন্দর্য্যমন্ডিত হয়ে উঠলো। সেই গোপনীয়তা দিয়ে পাথর সৃষ্টি করলেন আর পাথর খনির ঐশ্বর্য্যের উৎস হয়ে উঠল। সেই সৃষ্টির শক্তি তিনি মানুষকেও প্রদান করলেন এবং তাদের মধ্যে একজনকে এই শক্তি দিয়ে এতটাই বলীয়ান করলেন যে অনন্ত পর্যন্ত এই নশ্বর জীবনকে তিনি আলোকিত করবেন।

সেই গোপনীয়তা হল ভালবাসার গোপন রহস্য। সে কারণে মানুষ শুধুমাত্র সেই পথেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহক নবীজী সা.-এর দয়া এবং আনুকুল্য লাভ করতে পারে এবং কালক্রমে এই পৃথিবীতে ও পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারে। আর এটাই হল ভালবাসার গোপনীয়তার ভিতরে লুকায়িত সরল সত্য। যারা এই সরল সত্যটা জানে এবং এর অনুশাসনগুলো মানেও তারা প্রগাঢ় এক আবেগ এবং হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব উল্লাস অনুভব করে। ঠিক যেমন নবীজীকে ভালবেসে গাছের গুড়ি কেঁদে তা অনুভব করে।

এই স্তরের ভালবাসা মানুষকে পূর্ণাঙ্গতার পর্যায়ে এবং কোন কিছু সৃষ্টির সাফল্যে পৌঁছে দেয় এবং এর আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল যে, এই স্তরে পৌঁছালে মানুষ সরল এক অর্থে আলোর দিকে পৌঁছে যায়। আসলে এই পথে চলতে পারার জন্য দরকার বিবেক সম্পন্ন এবং সত্যবাদী বিশ্বাসীর সঙ্গ। এই ধরনের সতীর্থদের ততদিন পর্যন্ত দরকার যতদিন

পর্যন্ত না সম্রাটসম আত্মা এবং ক্রীতদাসসম দেহের মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি না হয়। মহার্ঘ্য হৃদয় তিব্রতা লাভ করলে মানুষ প্রশান্তি এবং স্বস্তি ফিরে পায়। কেননা, সে সত্যকে খুঁজে পায়।

বান্দাকে এই আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতা লাভের জন্য বিচিত্র সব বিশ্বাসের পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হতে হয়। অনন্তের পথে এই সফরের প্রতিটি পর্যায়ের মানুষকে বিচার করা হয় তার সততার আলোকে। আল্লাহর করুণা এবং দয়া লাভের মূল চাবি হচ্ছে অপরাধমুক্ত এবং আশাবাদ- দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র যা দিয়ে লোভ এবং হিংসাকে জয় করে তৃপ্তি অর্জন করা যায়। যে বান্দা এটা অর্জন করতে পারে, সতর্ক থাকতে পারে, অসাবধানী হওয়ার বিপদ থেকে তখন সে প্রভুর উপাসনা সতর্ক এবং গভীর ভাবে করতে পারে। নিজের নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে মানুষ নিজের ক্রোধকেও দাস বানিয়ে হৃদয়কে শক্তিশালী করতে পারে।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের সহিহ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, নবীজী বলেন যারা সত্যিকারের যোদ্ধা তারাই শুধু উপলব্ধি করতে পারে জীবন এবং মৃত্যুর পিছনের দৈবিক প্রজ্ঞাকে। তারা নিজেদের এই পার্থিব পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে না। তারা শুধুমাত্র ভাল কাজ করে এবং জ্ঞান, উপলব্ধি, আনুগত্য এবং উপাসনা দিয়ে জীবনকে সাজিয়ে তোলে। কেননা এ ধরনের বিন্যাসই মানুষের হৃদয়কে সত্যের প্রতি ভালবাসা জাগাতে সক্ষম হয়। মানুষ প্রশান্তি এবং মৃত্যুর সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে পারে। সে তখন মৃত্যুকে পরমাত্মার সাথে পুনঃমিলন হিসেবে মনে করে এবং আগ্রহ সহকারে এজন্য অপেক্ষা করে।

একজন আস্তিক তার সারাদিনের অন্যের সংস্থান করার জন্য দিনে উপার্জন করে এবং তার আধ্যাত্মিক পুষ্টির জন্য মধ্য রাত্রিতে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হয়। সে কারণেই সে অর্থ উপার্জনের জন্য খুব বেশী উদ্বিগ্ন হয় না এবং জাগতিক দুঃশ্চিন্তায়ও বিচলিত হয়ে পড়ে না। তার আত্মা যেন ক্ষমার মেঘ হয়ে তাদের চারিদিক ঘিরে থাকে। তার নির্মলতার ঝর্না এবং তার এলাকাবাসীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে ওঠে। সাথে সাথে তার পরিবারও যেন পৃথিবীর স্বর্গে পরিণত হয়।

এই পৃথিবীর আলো এবং অন্ধকারের নিষ্ঠুর যুদ্ধের পরীক্ষাগারে যারা এই স্বর্গ রচনা করতে চায় তারা সবসময় সঠিক এবং সত্যের দিকটাই বেছে নেয় - সেই সহজ, সরল পথ যা দৈবিক আদেশ প্রাপ্ত। তারা গভীর নিমগ্নতায় পবিত্র কুরআনের বাধ্যতামূলক নির্দেশগুলো পালন করে। বিশ্বজগতের সেই নিঃস্ব এবং শব্দহীন ভাষাটিও তারা একই সাথে পড়তে এবং এর প্রজ্ঞা রহস্য এবং আবিস্কারের চেষ্টা করে। এভাবেই তারা তাদের প্রদত্ত আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি এবং নির্মলতার আয়না হয়ে ওঠে। এই মহৎ পর্যায়টা যেন অনেকটা শ্বাশ্বত কুরআনের

পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মত। আসলে আমাদের পূর্ব পুরুষদের দ্বারা সংঘটিত বদরের যুদ্ধ থেকে শুরু করে বাকী যুদ্ধগুলো অর্থাৎ নীতিগতভাবে সমর্থিত সংগ্রামগুলো ছিল সেই মহৎ পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা।

এই রচনাটি বিনীতভাবে উক্ত বিষয়ে লিখিত। বইটির সারমর্মও তাই। যার শিরোনাম আমি দিয়েছিন "হৃদয়ের বাগান থেকে আল্লাহকে ভালবাসার রহস্য।" হে দিবালোকের প্রভু! আমাদের মধ্যে সমৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতায় প্রকাশ ঘটাও।

আল্লাহ্ যেন বিশ্বাসের আনন্দ আমাদের জন্য মঞ্জুর করেন। তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে কুরআনের আলো প্রজ্জ্বলিত করেন। আমাদের উপলব্ধিতে যেন প্রজ্ঞার ঝর্নাধারা বইয়ে দেন। আমাদের প্রভু যেন তাঁর ভালবাসা, করুণা এবং সমবেদনা দ্বারা আমাদের সিক্ত করেন।

পরম করুণাময়কে ভালবাসার গোপন রহস্য

বলা হয়ে থাকে, আল্লাহর অসীম রহস্যময় গোপন গুণাবলীর মধ্যে অত্যুজ্জ্বল সাক্ষ্য হল, "আমি এক গোপন, অলৌকিক রহস্য। আমি নিজেকে প্রকাশ করতে চাই এবং সে কারণে সৃষ্টিই আমার প্রকাশের মাধ্যম।" আর এটাই পরম পূর্ণাঙ্গতা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর এই রহস্যময় অসীম এবং ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষমতাকে অলক্ষ্যে রাখতে চাননি। তাই তিনি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

তিনি তাঁর অনন্ত প্রেমের একটা ছোট্ট বিন্দু থেকে এই বিশ্বজগত এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর এই পৃথিবীকে তাঁর অন্য সব সৃষ্টির উপরে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ্ মানব জাতিকে অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীবকে এই মাটি থেকে তৈরী করেছেন।

মাহন স্রষ্টা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে ভালবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো তাঁর শিল্প নৈপুন্য এবং পূর্ণাঙ্গতার চিহ্নই তুলে ধরেছে। মানুষ আল্লাহর একটা স্বর্গীয় শ্রেষ্ঠ শিল্প কর্ম। যার অস্তিত্ব ভালবাসা ও বদান্যতার একটা নিখুঁত বহিঃপ্রকাশ।

সুতরাং বলা যায়, এই বিশ্বকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একে সবুজ শ্যামলিমা, বিস্তৃত মরুভূমি এবং পর্বতমালা দিয়ে সজ্জিত করা নয়; বরং মানুষই এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভালবাসার নির্জরণী এবং সৃষ্টির সেরা নিদর্শন। আর এ কারণেই সৃষ্টির সেরা মর্যাদা দেয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মানুষের উচিত সৃষ্টির যাবতীয় নির্দশনগুলোকে মমতা এবং ভালবাসার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং নিজের মধ্যে লালন করা।

অধিকন্তু যেহেতু সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভালবাসা, সে কারণে সমগ্র সৃষ্টির অবিসংবাদী প্রবণতার মধ্যে ভালবাসার গুণটা বর্তমান পাওয়া যায়। এমনকি মারাত্মক বিষাক্ত প্রাণীটিও তার সম্ভাবনাকে পিঠে বহন করে লালন করে সেই একই জিনিষ, সৃষ্টির মূল উপজীব্য - ভালবাসা।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কারণ মানুষেরই মধ্যেই ভালবাসার এই বোধটা সবচেয়ে তীব্র। তৎসত্ত্বেও এই পৃথিবী অগ্নিপরীক্ষা ও দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ। কিন্তু মানুষ তার ভালবাসার প্রতিদান মহান আল্লাহর প্রেমের মহিমার ব্যাপ্তির মধ্যে পেয়ে থাকে অর্থাৎ অন্তহীন ভালবাসতে পারার ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ তখনই পূর্ণাঙ্গতা পায় যখন সে তার এই শক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমে উৎসর্গ করে। প্রায়শই সে ইতর শ্রেণীর লক্ষ্যহীনতার মধ্যে

নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তখন জন্ম হয় হতাশ একজন মানুষের। অন্যকথায়, তখনই সে আল্লাহকে খুঁজে পায় যখন সে আল্লাহর প্রেমে মশগুল হয়ে তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসে; পুরস্কার হিসেবে সে তার ইবাদতের গভীরতা অনুসারে আধ্যাত্মিক মুক্তির আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়।

আসলে কোন্ দিকে মানুষ তার ভালবাসাকে প্রবাহিত করছে তার উপর নির্ভর করেই মানুষের ঐশ্বরিক বিচারের রায় নির্ধারিত হয়। এর কারণ, আল্লাহ তা'আলা কিছু ইতিবাচক এবং কিছু নেতিবাচক গুণ দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার বিশাল সংখ্যক গুণাবলী থেকে তিনটা গুণের ভাগ দিয়েছেন।

১. শর্তহীন অস্তিত্ব ২. শর্তহীন মহিমা এবং ৩. শর্তহীন সততা।

কিন্তু একই সাথে তিনি মানুষকে এর ঠিক উল্টোটাও দিয়েছেন।

১. শর্তহীন অনিশ্চয়তা ২. চরম কদর্যতা এবং ৩. চরম অসততা।

এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত আছে, **"এবং মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে বিচারিক শক্তিও দিয়েছেন যার দ্বারা সে ঠিক-বেঠিক নির্ণয়ে সক্ষম।"** (শামস, ৯১ঃ৮)

উপরোক্ত এই দুই ধরণের পুরোপুরি বিপরীত প্রবক্তার টানা-পোড়েন মানুষের মধ্যে সারাজীবন চলতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে এটা বলা অসংগত হবে না যে, দূর্ভাগ্যবশতঃ এই নেতিবাচক প্রবণতাই মানুষকে বেশী নিয়ন্ত্রিত করে। যারা এই ফাঁদে পা দেয় তারা এতটা অন্ধ হয়ে পড়ে যে, তারা শুধু নিজেদের ক্ষমতায় বিমুক্ত হয়ে থাকে। এটা একটা বড় ধরনের দূর্বলতার পরিচয়। এই ধরণের আত্মপ্রেম মানুষকে তার অপরিমেয় ক্ষমতার সম্ভাবনার উম্মোচন থেকে বিরত রাখে। তাছাড়াও এটা সবচে' মারাত্মক আত্মিক অসুস্থ্যতা। যার ফলে তারা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন যে কোন বহিরাগতকে প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যের সাথে অস্বীকার করে।

তাসাউফের পারিভাষায় এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল, "নশ্বর দেহের মৃত্যুর আগেই মানসিক মৃত্যু।" অর্থাৎ সূফীদের মতে, নেতিবাচক প্রবণতা থেকে উৎসারিত অশুভ ফাঁদ এড়িয়ে চলা এবং এর পরিবর্তে জীবনের ঘূর্ণাবর্ত থেকে নিজেকে রক্ষা করা। যাই হোক, এই ধরনের উপলব্ধির মানে এই নয় যে, নিজের অহকারকে গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলা যাবে। বরং এর অর্থ হল, অহংকারকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

রূমীর ব্যাখ্যা এ ব্যাপারে নিম্নরূপ, যে পানি জাহাজকে ভাসতে সাহায্য করে সেই পানিই জাহাজের অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। কিন্তু জাহাজটা যদি পানি দিয়ে ভরে যায়, তাহলে সেই একই পানি তার ধ্বংসের কারণ হয়। একইভাবে জাহাজের আর একটা উদাহরণ দেয়া যায়। জাহাজ চলাচলের জন্য আগুনও দরকার অর্থাৎ জাহাজের বয়লার আগুন দ্বারা চলে। কিন্তু যদি সেই আগুন জাহাজের ডেক-এ ছড়িয়ে পড়ে তবে তা পুরো জাহাজকে পুড়ে ছাই করে ফেলবে।

অতএব, পরম প্রভুর নৈকট্যলাভ সেই অনুগত উম্মতের পক্ষেই লাভ করা সম্ভব যে ঐসব নেতিবাচক ঝোঁকের ক্ষতিকর প্রভাবকে প্রতিহত করতে পারবে। আর তা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পরম করুণাময়ের দিকে তার ভালবাসাকে পরিচালিত করার মাধ্যমেই শুধু সম্ভব। তবু মহান প্রভুর দিকে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পনের পথে নানারকম ঝুঁকি দেখা দেয়। কখনো কখনো এমনও মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডটা খুবই শক্তিশালী বৈদ্যুতিক শক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এটা একজন মানুষকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। মূসা আলাইহিস সালামের উপর আল্লাহ্ তা'লার অলৌকিকত্বের প্রকাশ এর একটা আদর্শিক উদাহরণ।

মূসা আ. সিনাই পাহাড়ে আল্লাহর কালাম বা বাণী প্রত্যক্ষ করেন। মানুষ সাধারণত শব্দ বা অক্ষরের মাধ্যমে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। কিন্তু মূসা আ. অক্ষর বা শব্দ ছাড়াই আল্লাহর সাথে ভাবের আদান-প্রদানের আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ায় বিমোহিত হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। অতঃপর তিনি করজোরে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু আল্লাহর প্রত্যুত্তর ছিল, "তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।" এরপরও মিনতি করার পর আল্লাহ তাঁকে পাহাড়ের দিকে তাকাতে বললেন। আল্লাহর নূরের তাজাল্লির কারণে প্রশস্ত পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এই দৃশ্যে আতঙ্কিত হয়ে মূসা আ. জ্ঞান হারালেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

উপরিউক্ত ঘটনা আমাদের মধ্যে এই উপলব্ধি জাগায় যে, ভালবাসার জন্য ক্রমান্বয়ে উন্নীত হওয়া প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক ভালবাসা আত্মস্থ করার জন্য কিছু বিশেষ চর্চার প্রয়োজন। এর জন্য আল্লাহর বন্ধুর গুণাবলীর সাথে ক্রমান্বয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সখ্যতা করে আধ্যাত্মিক নৈকট্যলাভ এবং নিজের অহংবোধকে যতদূর সম্ভব জয় করা। আর এ ধরনের চর্চার মাধ্যমেই মানুষের হৃদয় ভালবাসতে পারার জন্য তার সহজাত শক্তিকে বাড়াতে পারে এবং এভাবেই সে খাঁটি হয় ও নেতিবাচক প্রবণতার মুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। আর শুধুমাত্র তখনই হৃদয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতা লাভে সক্ষম হয়ে ওঠে যখন ঝকঝকে আয়নার মত ইলাহী প্রেমের প্রতিফলকের কাজ করে।

মা-বাবা, পতি-পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের প্রতি ভালবাসা এবং বস্তুগত ও আত্মিক সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য পার্থিব আনুকূল্য -এ সবই মহান আল্লাহ তা'আলার তাঁর বান্দার প্রতি অসীম দয়ার ফসল। কিন্তু এসব ধরনের ভালবাসাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। এগুলো আল্লাহর পথে চলার নির্দেশক মাত্র। যারা শুধুমাত্র অখণ্ড সুন্দরকে ভালবেসেছে অথচ এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে ভালবাসেনি, তাদের অনুগত হওয়াটা কাম্য নয়। কারণ তারা পরমাত্মার অংশ হয় না। অন্যকথায় যারা জাগতিক প্রেমে মগ্ন হবে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে। রুমী এই ধারণাকে নিচের কয়েকটি ছত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"যারা এই পৃথিবীর প্রেমে পড়েছে
তারা অনেকটা অন্ধকারের তীরন্দাজ।
এক বোকা লোক অন্ধকারে একটা পাখি শিকার করার চেষ্টায় করছিল।
কিন্তু ডালে বসা পাখিটি পর্যন্ত তা দেখে হতভম্ব।"

প্রত্যেকটা সচেতন লোক যে নিজের পরিণতি সম্পর্কে ভাবে সে সহজেই বুঝে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাকে ইহজাগতিক অতিরিক্ত ভোগ এবং স্নেহ-মততার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। পূর্ণাঙ্গ মহিমার অধিকারী শুধুমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বিমুগ্ধ চিত্তে আমরা যেসব সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করি সেগুলো আর কিছুই নয়, পরম করুণাময়ের প্রতিফলনমাত্র।

লায়লী এবং মজনুর প্রেমকাহিনী উপরের কথাগুলোর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদি মজনুর হৃদয় শুধুমাত্র লায়লার প্রেমে নিমগ্ন থাকতো তাহলে সে হয়তো মজনুর প্রতিমা হত। আসলে লায়লা মজনুর সম্পর্ক একটা অস্থায়ী ভূমিকামাত্র। কেননা মজনু স্বর্গীয় প্রেমে নিমগ্ন হওয়া মাত্রই লায়লা তার আনুকুল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। যদিও লায়লা মজনু উপাখ্যানের শুরুটাই ছিল লায়লাকে ঘিরে; কিন্তু কিছুকাল পরে লায়লার পরিবর্তে তার ভালবাসা আল্লাহ তা'আলার দিকেই বইতে শুরু করে।

ভালবাসা এতদূর পর্যন্তই গ্রহণযোগ্যতা পায় যতক্ষণ পর্যন্ত এটা নিজ লক্ষ্যে অবিচল থাকে। কিন্তু যদি ভালবাসার পরিণতি ঘটে বিভ্রম এবং হতাশায় তাহলে সেটি হয়ে পড়ে সুবিশাল কোন অট্টালিকা। পরম আশ্রয়কেন্দ্র এবং হৃদয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো- এ সবের কোন কিছুই সে ভালোবাসা দিয়ে অর্জিত হয় না। শুধুমাত্র এগুলো চাওয়ার প্রহেলিকা থেকে মুক্ত হতে পারলেই হৃদয় তার সফর জারি রাখতে পারে সেই ভালবাসার আশীর্বাদ নিয়ে যা ভূমিকে উর্বরতা দান করে। কিন্তু বিপদটা ঘটে যখন এই ভালবাসা অপাত্রে দান করা হয়। অবস্থা আরও শোচনীয় হয় যখন অপাত্রেই প্রেম বাঁধা পড়ে থাকে। যদি মজনু লায়লীর প্রতি মোহাবিষ্ট প্রেমে সারাজীবনের জন্য বাঁধা পড়ে যেত তাহলে তার প্রেম আধ্যাত্মিক শক্তি হারাতো। সে আর সব সাধারণ মজনুর মত অসীম প্রেমের অতরে হারিয়ে যেত।

যখন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর ভাইয়েরা চক্রান্ত করে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। তখন আলাহ তা'আলা তাঁকে পরিত্যাগ না করে তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের আলো জ্বেলে দিলেন। পথিমধ্যে একজন তৃষ্ণার্ত পথিক সেই কুয়োয় বালতি নিক্ষেপ করল এই আশায় যে, হয়তো এখানে পানি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ইউসুফ আ.-কে সেই বালতিতে উপরে উঠে আসতে দেখে পথিক তার তৃষ্ণার কথা ভুলে গেল। সে এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে একই সাথে হতবিহবল এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। একাগ্রতার অভাবে পথিক এই অলৌকিক দৃশ্যেও আধ্যাত্মিক দিকটা ধরতে ব্যর্থ হলো। সে সেই বস্তুগত অর্জনের উপরই

বেশী গুরুত্ব দিল অর্থাৎ তার মনে জাগলো ইউসফকে সস্তায় বিক্রি করলেও তার কিছু জাগতিক লাভ হবে। তার বিষয়টি ঠিক মজনুর ঐ মত যে লায়লার প্রেমে মশগুল থেকে পরম সত্ত্বার সাথে মিলিত হতে পারেনি।

সেই পথিক যে কুয়োয় বালতিসহ দড়িটা পানির জন্য থামিয়ে ছিল, পানি পাওয়ার পর তার জন্য সেটা খুব স্বাভাবিক হত যদি সে পানির কথা ভুলে ইউসুফের নিঃস্কলুষ ক্ষমতায় মুগ্ধ হতে পারতো। তার পক্ষে আরও উচিৎ হত যদি সে পূর্বেও উজ্জ্বল কিরণ যা স্বর্গীয় প্রেমের অত্যুজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ, তা প্রত্যক্ষ করার জন্য সসীম এবং আপেক্ষিকতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারতো। কিন্তু নির্বোধ পথিকটা বস্তুগত লাভের আশায় প্রতারিত হয়েছে; তার হিসাব তখন শুধু ছিল ইউসুফ আ. থেকে কী বস্তুগত লাভ সে হাতিয়ে নিতে পারবে। আর এভাবেই এক অভাবনীয় স্বর্গীয় দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা লাভ থেকে সে বঞ্চিত হল।

এখানে আমি মূল যে ভাবটা প্রকাশ করতে চাইছি সেটি হল, মহিমাময় প্রেমকে উপলব্ধির জন্য আদর্শ পথের সন্ধান করা। যারা এই পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছাতে চায় তারা বাহ্যিকতাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির চর্চা এবং অন্তর্গতভাবে তাদেরও নিয়তি দ্বারা পরিচালিত হয়েই সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এ ধরনের মানুষেরা নানারকমের উন্নত ও বিবিধ পর্যায় অনুকরণ করে পথ চলে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য এবং এদের প্রত্যেকে আল্লাহ কর্তৃক বরাদ্দ অংশটুকু লাভ করে। আর এর প্রতিফল আল্লাহ ফিরিয়ে দেন, ফানা ফিল্লাহ তথা পরম করুণাময়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। যেমন নদীর গন্তব্য সাগরে পতিত হয়। আর চূড়ান্ত গন্তব্য হল, বাকা বিল্লাহ তথা আল্লাহর সাথে বসবাসের মধ্যে দিয়ে।

জেনে রাখা ভাল যে, যুক্তির সীমানা সসীম। যুক্তির সীমা অতিক্রম করে এমন যে কোন কিছু পাগলামির পর্যায়ে পড়ে। মূলত হৃদয়ের ক্ষমতা অসীম। পরম প্রশান্তি হল মহান প্রভুর মধ্যে অবিভূত এবং শ্বাশ্বতের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। রুমী চমৎকারভাবে তাঁর এই অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। কিভাবে তিনি ফানা ফিল্লাহ এবং বাকা বিল্লাহর পর্যায়ে পৌঁছে স্বর্গীয় প্রেমে আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং কিভাবে এই আগুন আমৃত্যু তাঁর আত্মার সাথে একীভূত হয়ে ছিল-

"আমার মৃত্যুর পর আমার কবর খুঁড়ে দেখো কিভাবে আমার ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এই শারিরীক খাঁচাই মৃত্যুকে আতঙ্কময় করে তোলে। যখন তুমি শরীরের খোলস থেকে মুক্ত হতে পারবে তখনই মনে হবে মৃত্যু যেন মুক্তোর মত হিরনময়।"

আল্লাহর বন্ধুদের সবচে' বড় গুণ হল, ইলাহী প্রেমে নিজেকে বিলীন করে দেয়া। রুমী সেসব প্রকৃত প্রেমিকদের অনুসন্ধান করেছেন যারা ভালবাসার আগুনে পুড়েছেন অর্থাৎ সেই অনির্বচনীয় অভিব্যক্তি দ্বারা তিনি এই অভিলাষকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

"আমার প্রয়োজন সেই প্রেমিককে যারা ভেতরের শিখা থেকে অত্যুজ্জ্বল আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং যারা হৃদয়ের সেই আগুনকেও ছাই-এ পরিণত করবে।"

দু'ধরনের ভালবাসা আছে। প্রকৃত এবং রূপক। আল্লাহ ছাড়া এই বিশ্বজগতের যে কোন সত্ত্বার প্রতি প্রেম, আসক্তি এবং আরাধনা হল রূপক ভালবাসা। অন্যদিকে বিশ্ব জগতের প্রভুর প্রতি ভালবাসা এবং তার প্রতি অনুরক্ততা প্রকৃত ভালবাসা।

যারা তাদের হৃদয়কে আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভালবাসায় দ্যুতিময় করতে পেরেছে শুধু তারাই সবসময় তাদের মধ্যে প্রকৃত সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করতে এবং আল্লাহর অনন্ত শক্তির চিহ্নগুলোকে বুঝতে পেরেছে। অন্যকথায়, তারা প্রকৃতির মধ্যে 'আহসানী তাকউয়িম' অর্থাৎ সর্ব উৎকৃষ্ট বুননকে আবিস্কার করতে পারে।

তাদের জন্য সীমাতিরক্ত সত্যটুকু ছাড়া আর কোন রূপক রং এবং সুগন্ধের দরকার হয় না। কেননা, তারা আল্লাহর জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে। তারা বাহ্যিক আবরণ পরিত্যাগ করে পূর্ণ বাস্তবতায় পৌঁছাতে পেরেছে। সেই বাস্তবতায় তারা ইলাহী অনন্তকে ধারণ করতে সক্ষম।

আল্লাহ এবং তার সৃষ্টির মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে তা পৃথিবী এবং মহাকাশের মধ্যেকার কোন বস্তুগত দূরত্ব নয়। এই ব্যবধান হল সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সৃষ্টির অস্তিত্বের মধ্যকার পার্থক্যের অনুভূতি। একারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন আমি তার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত তখন আমার প্রজ্ঞার অংশ হয়ে ওঠে। এবং মানব জাতির ভিতরে তার সর্বব্যাপী উপস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়।" পরম করুণাময় আরো বলেন, "আমি মানবজাতির গোপনীয়তা এবং মানবজাতি আমার গোপনীয়তা।"

অতএব স্বর্গীয় গুপ্তধন এবং রহস্যময়তা মানব জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহিমান্বিত অস্তিত্বকে মানব জাতির পবিত্র কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন ।

নিজের এই গুণকে মানুষের মধ্যে উপস্থাপিত করার আনন্দদায়ক বার্তার ব্যাখ্যা আল্লাহ এভাবে দেন-

"আমিই মানুষের রহস্যময়তা"।

যদি এই সারসত্ত্বা এবং আনন্দবার্তা একজন বিশ্বাসীর মধ্যে প্রেমের পূর্ণাঙ্গতা এবং মমতাকে পৌঁছে দিতে পারে তখন তার হৃদয় স্বর্গীয় জগতের রহস্যময়তার দিকে পরিভ্রমণ করতে শুরু করে। তখন সমস্ত বস্তু ও বাস্তবতা, মানুষ ও বিশ্বজগতের রহস্যময়তা এবং

স্বর্গীয় পরলৌকিক জগতের রহস্যময়তা- সবকিছু তার কাছে প্রতিভাত হয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সৃষ্টির হৃদয়ে সর্বব্যাপী গভীরতা অনুভূত হয়।

যখন তাঁর সৃষ্টি এই পরিপক্কতা অর্জন করে তখন আল্লাহ তাঁর ও মাখলুকের মধ্যকার আধ্যাতিক ব্যবধান ধীরে ধীরে কমতে থাকে। মাখলুক উপলব্ধি করতে শুরু করে "মৃত্যুর আগেই মৃত্যুকে মেনে নেয়া"র অনুভূতির রহস্য। এই জগতের সসীম হওয়া, এর ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং এর অস্থায়ী সৌন্দর্য বাতাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিরাজ করে। স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়ার বিশাল আনন্দকে তখন মাখলুকের আত্মা উপলব্ধি করতে পারে।

সবারই জানা আছে, আল্লাহর প্রেমের সমুদ্রে ভাসতে পারার ক্ষমতা যা করুণার ঝর্নাধারা এবং মমতার মাধ্যমে সম্ভব, তাতে শুধু নবীজিরই দখল রয়েছে। মুহাম্মাদ সা.-কে ভালবাসতে পারার অর্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভালবাসতে পারা। তাঁর প্রতি অনুগত থাকা মানে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এবং প্রিয় নবী সা.-এর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণার অর্থ মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করা। সুতরাং প্রিয় নবী সা.-এর পরম সম্মানিত অস্তিত্ব মানবজাতির জন্য একটা ভালবাসা এবং আত্মীয়তার জায়গা তৈরী করে। আলেমরা বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টির অস্তিত্ব মানবতার ধারক মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি আল্লাহর অসীম ভালবাসা। অতএব পুরো বিশ্বজগত প্রিয় নবী সা.-এর অস্তিত্বের আলোকে আলোকিত। আর এ কারণেই আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলগণ ইহজাগতিক ক্ষণস্থায়ী ভালবাসার প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকেন। সেজন্যই যথা সর্বস্ব দিয়ে প্রিয় নবী সা. কে ভালবাসাটা বাধ্যতামূলক। নবীজির কন্যা ফাতিমা রা. পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর মানসিক বিপর্যয়ের যে অবস্থা বিবৃত করেছিলেন তা পিতার প্রতি একজন কন্যার ভালবাসার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ-

"প্রিয় নবী সা.-এর মহাপ্রয়াণ আমার মনে এমন এক মহাবিপর্যয়ের অনুভূতি এনে দিয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল সবকিছুই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে। যে অন্ধকার অপরিবর্তনশীল।" (ইবনুল জাওজি, আল-ওয়াফা)

নবীজির প্রতি ভালবাসার সবচে' সুন্দর এবং অর্থবহ প্রকাশ হল তাঁর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য। আর এই আনুগত্যের স্বরূপ হল, মৃত ব্যক্তিটি যাদেরকে ভালবাসতেন তাঁর অনুপস্থিতিতে তাদের ভালবাসা। আল্লাহর প্রতিও ভালবাসার মেরুদণ্ড তৈরী করে এই ভালবাসাই। এর ব্যত্যয় কুরআন এবং সুন্নাহর পরিপন্থী। ইলাহী প্রেম কেবলমাত্র প্রিয় নবী সা.-কে ভালবাসতে পারার মধ্য দিয়েই অর্জন করা সম্ভব।

নবীজির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই সর্বোচ্চ পন্থা। যার দ্বারা একজন মানুষ আল্লাহকে ভালবাসতে পারার পথের হদিস পেতে পারে। আল্লাহ মানুষের উপলব্ধি এবং বুদ্ধিমত্তাসহ

বাকী সব মানবিক ক্ষমতাবলী সীমিত আকারে দিয়েছেন। এর বিপরীতে আল্লাহর সত্ত্বা সব সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য প্রিয় নবী সা.-এর নূর, তাঁর সম্মানিত অস্তিত্ব, আল্লাহর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর সৃষ্ট সম্মানিত প্রতিটি প্রাণীর যোগ্যতার বিস্তারকে ভালবাসা প্রয়োজন।

আল্লাহর প্রতি ভালবাসার বৃত্তে অবগাহন সম্ভব হয় শুধুমাত্র করুণার ঝর্নাধারা এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে। এই বৃত্তের বাইরের যেকোন ভালবাসা আল্লাহপ্রেমের ব্যপ্তির যুক্তিকে দুর্বল করে দেয়। সে অনুসারে নবীজীকে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালবাসা একটা বিশাল আশীর্বাদস্বরূপ। যারা এই কাজে ব্যর্থ হবে তাদেরকে ইহকাল এবং পরকাল দুই জগতেই গভীর অনুতাপে ভুগতে হবে।

আল্লাহর বন্ধুদের হৃদয় সাগরের ভেতরে মুক্তোর মত। তারা বৃষ্টি কণার চাইতেও বড় মুক্তোর জন্ম দেয়। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সহায়তায় অপরিপক্ক হৃদয়কে বেশ বড়সড় মুক্তোয় পরিণত করতে পারে। যে খোঁজে, তার প্রয়োজন এই মুক্তা লুক্কায়িত বৃষ্টির কনাটিকে খুঁজে বের করা।

মসনবিতে লেখক বলেন ঃ "আল্লাহ মেঘের কানে গোপন কিছু ফিস ফিস করে বলেন এবং এর চোখ থেকে তখন প্রচুর পানি নির্গত হয়। তিনি গোলাপ ফুলের কানেও কিছু ফিস ফিস করেন এবং তাকে রং ও সুগন্ধি দিয়ে মোহনীয় করে তোলেন। তিনি পাথরের কানেও গোপনে কিছু বলেন এবং সেটাকে খনির ঝকমকে এক মূল্যবান রত্নে পরিবর্তিত করেন। তাঁর বিশালত্ব দিয়ে তিনি মেঘ কে বৃষ্টিতে পরিণত করেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা দিয়ে তিনি মেঘকে বৃষ্টিতে এবং মামুলি একখণ্ড পাথরকেও রত্নে পরিণত করেন

তিনি মানুষের শরীরকেও গোপন কিছু দীক্ষা দেন অতঃপর যে এই গোপনীয়তা রক্ষা করে তাকে অনন্তে উন্নীত করেন। স্বর্গীয় জগত থেকে অনুপ্রেরণা পাওয়ার পর নশ্বর দেহ থেকে আত্মার মুক্তির পর এই নশ্বর শরীরই আল্লাহর নৈকট্য লাভের রহস্য অর্জন করে।

পুরো মানব ইতিহাস জুড়ে যাদের কাছে এই রহস্য উম্মোচিত হয়েছে তারাই সেই আলোকবর্তিকার বাহক হয়েছেন। এবং ভালবাসার মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছেন। আমাদের প্রার্থনা হোক আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর গভীর মমতার প্রগাঢ়, প্রিয় নবী সা.-এর মমতা আমাদের জন্য নিশ্চিত করেন। আমাদের কাম্য হোক মৃত্যুর আগে আল্লাহ যেন আমাদের জান্নাত লাভের জন্য যাবতীয় ভাল কাজ করার সুযোগ দেন। এবং মৃত্যুর আগে যেন তিনি তাঁর প্রেমে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে তোলেন।

পূর্ণাঙ্গ মানুষ

আল্লাহ্ তা'আলার সবচে' সফল সৃষ্টি মানুষ। সে কারণেই সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের মধ্যেই শুধু তাঁর সমস্ত গুণাবলী বর্তমান। তাঁর মতই তিনি মানুষকে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর সে কারণেই তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তাকে সর্বোচ্চ সম্মানজনক স্থান দেয়া হয়েছে।

মানুষকে তার নৈতিক অবস্থানের সমৃদ্ধি ঘটানোর সুপ্ত সম্ভাবনা দিয়ে যেমন একদিকে বলীয়ান করা হয়েছে; অন্যদিকে তার মধ্যে নেতিবাচক আকাঙ্খার এমন সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে যা তাকে অনৈতিকতার গভীর তলদেশে নিক্ষিপ্ত করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ সারাজীবন ধরে নিজের মধ্যে এই দুই বিপরীত মেরুর বৈশিষ্ট্যের প্রবল দ্বন্দ্বে সদা সর্বদা সংগ্রামরত। এই ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলের সংঘাত প্রকৃত পক্ষে মানুষের মানসিক দুনিয়ারই। এই বিশ্ব জগতের সদা চলমান সংগ্রামেরই প্রতিফলন।

একজন ব্যক্তিকে সংযত মানুষ হিসেবে তৈরী করে সত্যিকারের সাহস দেয়া হয়। সেই সাহসের উৎস হল তার ভেতরের আধ্যাত্মিক সংঘাত থেকে পাওয়া শক্তি। এই শক্তি তার ভেতরকার মৌলিক এবং সহজাত নৈতিকতাকে সংরক্ষণ করে।

অতএব পূর্ণাঙ্গ মানুষ সেই হতে পারে যে তার প্রকৃতির বেহেশতি বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্য পেয়েছে। এ ধরণের মানুষরা অসাধারণ দায়ী এবং বদান্যতার আঁধার। তারাই এই বিশ্বজগত নামক বইটির ভূমিকা এবং সারাংশ। যে মঞ্চে সৃষ্টির সেরারা তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এমনকি একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহতেও তার নিঃস্কলুষ হৃদয়ের প্রতিফলন ঘটে। যেমন তার দেহের প্রতিটি অংশের উপর তার অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। তার হৃদয় হয়ে ওঠে ঐশ্বরিক ভালবাসার আশ্রয়স্থল এবং আল্লাহর জ্ঞান দ্বারা পুর্ণ এক চমৎকার প্রাসাদ। এই অর্থেই বলা যায় একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের হৃদয় হয়ে ওঠে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার যোগ্য আবাস।

একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষকে পুরোপুরি বিশেষণ এবং ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। শেখ সা'দী রহ. বলেন,

"হৃদয় হল আল্লাহর নিজেকে উম্মোচনের সঠিক স্থান।"

একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের কথার মধ্যে লুক্কায়িত আধ্যাত্মিক অর্থ গোপনই থাকে। তার কাজসমূহ নির্দোষ হয়। কেননা তিনি মহান নবীজীর আদর্শের আলোকে আলোকিত। তার হৃদয় হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের যথার্থ আলয়। প্রিয় নবী সা.-এর পক্ষেও সত্যকে খুঁজে পাওয়া এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রেরিত দূত হওয়া আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসম্পন্ন হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ মানুষ এই শ্বাশ্বত সূত্রের প্রকৃত বাণীকে বুকে ধরে রাখে- "শরিয়া হল আমার ভাষা, তরিকা হল সেই ভাষা চর্চার পথ, এবং হাকিকাত হল বাস্তবতায় পৌঁছায় আমার অবস্থান।" একজন আলেম সেই সাথে যোগ করেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন- "জান্নাত বা জাহান্নাম কোনটাই আমাকে ধারণ করতে পারে না যতটা পারে আমার ইবাদতকারী বান্দার হৃদয়"।

যে আল্লাহর প্রেমে মশগুল হয়ে নিজের কামনা বাসনাকেও ভুলে যায় ঠিক যেমন পতঙ্গ আলোর চারদিকে ঘোরে, সেই পূর্ণাঙ্গ মানুষ। আল্লাহ তা'আলাই হয়ে ওঠেন তার দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবনেন্দ্রিয়। তার জন্য পূর্বনির্ধারিত যাই থাকুক না কেন তাই হয়ে ওঠে একটা চমৎকার সম্ভাবনা। যতই সে সবসময় ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে ততই এই পার্থিব জীবনের প্রতি তার ভালবাসা দূরীভূত হতে থাকে। সমস্ত ক্ষণস্থায়ী অর্জনগুলো তার অর্থবহতা হারিয়ে ফেলে।

পূর্ণাঙ্গ মানুষ সবসময় নিরীক্ষণ করে এবং ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশ এই বিশ্ব জগতের নিখুঁত শৃঙ্খলার সে তারিফ করে। বিশ্ব জগতে ঘটমান ব্যাপারগুলো থেকে সে অসংখ্য শিক্ষা লাভ করে। সে একজন বিনয়ী বিশ্বাসীর প্রকৃত উপলব্ধির মধ্যে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহর বিস্ময়কর প্রকাশের সহ্য ক্ষমতার তুলনায় তার তুচ্ছতা এবং দূর্বলতাগুলোকে সে বুঝতে পারে। আর এই কারণেই বেশীরভাগ সময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ একজন প্রকৃত মানুষের প্রার্থনা এবং অনুরোধগুলো প্রত্যাখ্যান করেন না। তার বিনয় এবং সততার কারণে সে নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করে না; অপরিসীম দয়ার বীজ তার চরিত্রকে সাকার করে এবং তার হৃদয় কাউকে অবহেলা করতে পারে না। বিশ্ব জগত যে একটি নিখুঁত নিয়মের অধীনে চলছে এবং ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা দ্বারা ঘেরা এই সত্য সম্বন্ধে সে পুরোপুরি সচেতন। বিশ্বব্রম্মাণ্ডের ঐশ্বরিক নিয়মই আমাদের জন্য উত্তম।

একদিন সুনবুল সিনান এফেন্দি তার শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, "যদি তোমাকে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন কিভাবে তা করবে?" এরকম একটি ভিন্ন ধারার প্রশ্নে তাঁর শিষ্যরা উত্তর দিতে ইতস্ততঃ বোধ করল। একজন বলল, "আমি পৃথিবীর একজন নাস্তিককেও ছেড়ে কথা বলবো না।" অন্য একজন বলল, "আমি পৃথিবীর বুক থেকে শয়তানকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো।" কেউ কেউ বলল, "সব মাতালদের জন্য শাস্তি

নির্ধারণ করবো।" একজন শিষ্য চুপ করে বসে ছিল; সে সিনান এফন্দির মনোযোগ আকর্ষণ করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা তুমি কি করতে?

সে বিনীতভাবে উত্তর দিল, "হে আমার উস্তাদ! খোদা আমাকে ক্ষমা করুন। এই প্রশ্নটির আড়ালে যে সত্যটি লুকিয়ে আছে তা হল সৃষ্টি পরিচালনার মধ্যেই ঘাটতি রয়েছে যা নির্ভেজাল নয়। আমার সীমিত মনন দিয়ে কি এর উত্তর দেয়ার দুঃসাহস আমি করতে পারি? অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।"

উস্তাদ এরকম একটা বিজ্ঞোচিত উত্তর শুনে বললেন, "আমরা তাহলে বিষয়টির মূল খুঁজে পেলাম বা বুঝতে পারলাম।"

সেই ঘটনার পর এই শিষ্যই মার্কেজ এফেন্দী নামে পরিচিত হন। কালক্রমে তার আসল নাম মুসা মুসলেহ উদ্দিন হারিয়ে গেল। এবং বর্তমানে তিনি মার্কেজ, যার অর্থ 'মূল' এই নামে পরিচিত।

যেহেতু খাঁটি মানুষ আল্লাহর প্রেমে মশগুল থাকে সে কারণে তার হৃদয়ে কোন লোভ বসতি গড়ার সুযোগ পায় না। আধ্যাত্মিক শক্তিতে বেশ শক্তিশালী হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে তার জন্য মানুষের হৃদয়ে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা থাকে। অথচ এই পাওয়াটা তাকে ঔদ্ধত বা অহংকারীও করে তোলে না।

এমনকি সে যখন মানুষের সঙ্গে থাকে এবং আল্লাহর অনুশাসনগুলো মান্য করে, তখনও সে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব ভুলতে পারে না। সে আল্লাহর অনুশাসনগুলোকে খুব গুরুত্ব দেয়। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা এবং মমতা প্রদর্শন করে। সে সব প্রাণীকে ভালবাসে। কিন্তু শোষক এবং অন্যায়কারীদের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করে না। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয়ে করুণাধারার বোধটি থাকার কারণে সে এক তার জন্য ব্যথিত হয়। শুধুমাত্র যে পার্থিব সম্পদের দরকার তার হয় সেটিও হয় দরিদ্র এবং দুঃখী দের সাহায্য করার জন্য।

একজন খাঁটি মানুষ আল্লাহকে জানা এবং তাঁকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদিত করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, "মানুষ আমার গোপনীয়তা এবং আমি মানুষের গোপনীয়তা।" একজন খাঁটি মানুষ আল্লাহর প্রকৃত বান্দা। তাকে জাগতিক কোনো দুঃখ-কষ্ট এবং সমস্যা স্পর্শ করে না।

কথিত আছে যে, ঘর্মাক্ত এবং পুরো শরীরে দাগ আছে এমন একজন লোকের যীশুর সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো। ব্যক্তিটি তার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও যীশুকে বলল, "হে আমার প্রভু!

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য। কেননা আপনি আমাকে বেশীর ভাগ মানুষকে যা দেন আপনার দেয়া সেই মনস্তাপ থেকে রক্ষা করেছেন।"

তার মানসিক পরিপক্কতা এবং সচেতনতার স্তর পরীক্ষা করার জন্য যীশু জিজ্ঞেস করলেন, "হে মানুষ! কি মনস্তাপ থেকে আল্লাহ তোমাকে রেহাই দিয়েছেন?" লোকটা প্রত্যুত্তর দিল, "হে আল্লাহর প্রতিনিধি! সবচে' কষ্টকর অসুখ এবং সমস্যা হল, সত্যকে জানতে না পারা এবং তা থেকে বঞ্চিত হওয়া। কেননা, তার ক্ষমা পাওয়ার কারণেই আমি আজ উৎফুল এবং সুখী। আর কোন জাগতিক পাওয়াই এর সংগে তুলনীয় নয়।"

একজন খাঁটি মানুষ বাস্তবতার নিরিখে বুঝতে পারে যে, এই পৃথিবীর সবকিছুই একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার সাথে প্রভুর একটা বিস্ময়কর জায়গায় মিলন ঘটবে।

একজন খাঁটি মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য থাকে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এই গন্তব্যের পথে অনেক কাঁটা এবং কুসুম থাকলেও সবই তার কাছে একই রকম। একইভাবে, তার চোখে কম বা বেশী ঠান্ডা-গরম অথবা ধন-দৌলত বা দরিদ্রতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সব কিছুই তার কাছে আপেক্ষিক। একজন খাঁটি মানুষ মনে করে যে, সে এই পৃথিবীতে ক্ষণিকের মুসাফির মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, পুরো পৃথিবীটাই তার কাছে বালিতে ইমারত গড়ার মত একটা খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব তার কাছে সতীর্থ মানুষ অথবা পৃথিবীর কোন দাবীরই কোন মূল্য নেই। তার সঙ্গে সম্পর্কিত সব বিষয়েই বেশ মিতচারী। প্রার্থনায় সে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পথটাই বেছে নেয়।

কিছু দায়বদ্ধতা প্রভুর কাছে তার রয়েছে। যেমন প্রার্থনা এবং শুকরিয়া আদায়। তার পরিবার এবং তার নিজের জন্যও কিছু বিশেষ অধিকার এবং দায়বদ্ধতা রয়েছে। একজন খাঁটি মানুষকে এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে বলতে হয়।

একজন খাঁটি মানুষ একটি অমায়িক আত্মা। সে সবসময় তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং কখনো কথার বরখেলাপ করে না। তার নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সে কখনোই অন্যকে আঘাত করে না। সতীর্থ মানুষ এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ- উভয়ের ক্ষেত্রেই সে সমান আচরণ করে।

এমনকি তার স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কিছুও তাকে বিষন্ন করে না। যে আক্রমণকারীকে সে সাহায্য করতো, খাঁটি মানুষ আঘাত পাওয়ার পরও তার সাথে দয়ালু আচরণই করে। যেহেতু একজন খাঁটি মানুষ আল্লাহর অনুশাসনগুলোই অনুসরণ করে এবং শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টিই লাভেরই চেষ্টা করে। সে কারণে তার আচরণ এবং কর্ম কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কেননা আল্লাহ তার এ সমস্ত সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন। এমনকি সেই মূর্খদেরও যারা তাকে অমান্য করে।

প্রথম ন্যায়বান খলিফা আবু বকর রা. মিসতাহ রাদি. নামক এক সাহাবিকে দান-খয়রাত করতেন। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারলেন যে, সেই লোকটিই তার কন্যা আয়েশার নামে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করে চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছে। আয়েশা ছিলেন প্রিয় নবী সা.-এর সর্বকনিষ্ঠা পত্নী। সুতরাং আবু বকর রা. তাকে আর সাহায্য না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে মিসতাহের পরিবার অসহায় এবং মরিয়া হয়ে উঠল।

যাহোক, পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যারা তার অনুশাসনগুলো মানে না তাদের জন্যও নিম্নলিখিত কয়টি আয়াত নাজিল করেছেন,

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي
سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ
أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে যাদেরকে আমি ধন-সম্পদ এবং আভিজাত্য দান করেছি তারা যেন আপন গরীব আত্মীয় স্বজন এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহ ত্যাগ করেছেন তাদের সাহায্য না করার শপথ না নেয়। তারা যাতে ক্ষমাহীন এবং ধৈর্য্যশীল হয়। আল্লাহ তোমার প্রতি ক্ষমাশীল হন তা কি তোমরা চাও না? কেননা আল্লাহ সবসময় ক্ষমাশীল এবং সবচে' করুণাময়।" (সূরা নূর, ২৪:২২)

وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"ভাল কাজ না করা, যথাযথ ভূমিকা না পালন করা অথবা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য কেউ যেন আল্লাহ দোহায় না দেয়ঃ কেননা আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং শোনেন।" (সূরা বাকারা, ২:২২৪)

উপরোক্ত আয়াতটা নাজিল হওয়ার পর আবু বকর রা. বলেছিলেন, "আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুক তা অবশ্যই কাঙ্খিত।" অতঃপর তিনি শপথ ভঙ্গ করার জন্য ক্ষতিপূরণ দিলেন এবং সেই ব্যক্তিকে দান করা আবার শুরু করলেন যে একই সাথে তার কন্যা এবং নবীজীর

পত্নী এবং সমগ্র বিশ্বাসীদের মাতা আয়েশা রাদি.-কে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। এটা একটা অসাধারণ ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে আবু বকরের মেধা এবং সততার দুর্লভ একটি উদাহরণও বটে।

একজন খাঁটি মানুষ আল্লাহর রাহে সঠিক সময় এবং সঠিক স্থানে ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অথচ অন্যরা তা অপচয় মনে করে। সঠিক সময় এবং স্থান না পেলে খাঁটি মানুষ সেই জায়গায় দান করে না। অনেকে তখন তাকে কৃপণ এবং খুব নিন্দনীয় মনে করে। প্রকৃতপক্ষে জীবন পুরোপুরি সত্যের জন্য। কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে আল্লাহর সেই অনুশাসনের উল্লেখ আছে,

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“নিকট আত্মীয়দের এবং দরিদ্র ও পথিকদের তাদের প্রাপ্যটুকু দিও। কিন্তু নির্বোধের মত অতিরিক্ত ব্যয় কর না। মনে রেখ, আসলে অপচয়কারী শয়তানের সমগোত্রীয় আর এটা প্রমাণিত যে, শয়তান আল্লাহর কৃতঘ্ন একটি সৃষ্টি।” (ইসরা, ১৭:২৬-২৭)

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

“তুমি একেবারে কৃপন হয়ো না আবার বেহিসেবী খরচও করো না। তাহলে তুমি নিন্দনীয় এবং নিঃস্ব হবে।” (ইসরা ১৭:২৯)

উমর ইবনু আব্দুল আজীজ রাহ. এই আয়াতগুলো বেশ ভালভাবে হৃদয়াঙ্গম করেছিলেন। তিনি আপন পরিবারের সম্মতি নিয়ে এতিম এবং দরিদ্রদের মধ্যে তার সম্পদ বিতরণ করে দিয়েছিলেন। তিনি এই আদর্শের অনুকরণীয় প্রতিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। যেহেতু, ধনী লোকেরা তার রাজত্বকালে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল এবং তাতে কোন গরীব না থাকায় যাকাত দেয়ার মত কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রাসাদের পরিবর্তে তাবুতে বাস করে তিনি বিলাসিতার বিরুদ্ধে একটা নজীরবিহীন উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

একজন খাঁটি মানুষ তার অহংকে সবসময় নিয়ন্ত্রণে রাখে। অন্য মানুষের অক্ষমতা এবং ঘাটতি সম্পর্কে তার তেমন কোন আগ্রহও থাকে না। সে অন্যের গোপনীয়তার ব্যাপারে তেমন পাত্তা দেয়না। তবে তা বলেও বেড়ায় না। একজন খাঁটি মানুষ আল্লাহর সেই গুণটি অনুসরণ করে। যেমন অন্যের ভুলগুলো আল্লাহ তা'আলা গোপন করেন।

পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দগুলোর জন্য লালায়িত না হয়েও একজন খাঁটি মানুষ তৃপ্তিকর জীবন-যাপন করতে পারে বলে সে সমাজে উচ্চ অবস্থানে থাকে। যা সবার ঈর্ষার কারণ হয়। এমনকি পৃথিবীকেও আদেশ করা হয় তাকে মেনে চলতে। একটা হাদীসে বলা হয়েছে, *"যে ব্যক্তি পরকালের কথা বেশী চিন্তা করে আল্লাহ তাকে মানসিক ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ করেন। তার কার্যাবলীতে শৃঙ্খলা এবং শক্তি যোগান এবং পুরো পৃথিবী তার কাছে নতি স্বীকার করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মূলত এই জাগতিক মোহের দাস হয়ে ওঠে আল্লাহ তার মনের ঐশ্বর্য্যকে নষ্ট করে দেন এবং তাকে একজন পরাজিত মানুষে পরিণত করেন। সে শুধু সেইটুকুই পায় যা তার জন্য পূর্বনির্ধারিত ছিল।"* (তিরমিযী)

একজন খাঁটি মানুষ এত উন্নত চরিত্র এবং প্রকৃতির অর্জন করে যে, সে কখনও কারো কথায় রাগান্বিত বা বিষন্ন হয় না। শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া। সেই ইলাহী বিধান গুলির সে চর্চা করে।

اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"যারা তাদের সমৃদ্ধির সময় অথবা নিদারুণ দুর্দশায় ও মুক্ত হস্তে দান করে। যারা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এবং সব মানুষকে ক্ষমা করতে পারে। তারাই আল্লাহর ভালবাসা পায়। কেননা যারা ভাল কাজ করে তাদেরই তিনি ভালবাসেন।" (আল-ইমরান, ৩:১৩৪)

জাফর আস সাদিক এই আয়াতটির সারকথা মেনে চলতেন। যেমন, সেই ভৃত্যকে ক্ষমা করেছেন যে তার কাপড় খাবার দিয়ে নষ্ট করে দিয়েছিল। অথচ তা সত্ত্বেও তিনি তার ভাল মন্দ সবদিকের দেখাশোনা করেছেন। হাসান আল বসরী তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যারা তার গীবত করতো এবং তিনি তাদের জন্য উপহার পাঠিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেছেন।

একজন খাঁটি মানুষ সব সময় দয়ার্দ্র এবং প্রার্থনার পর্যায়ে থাকে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসও আলাহর মহিমার গুণ-কীর্তন করে। তার প্রতিটি শব্দ যেন প্রজ্ঞার মুক্তা বিন্দু। তার চোখ দু'টো যেন অজ্ঞতামুক্ত এবং ভালবাসার ঝর্নাধারা। তার উপস্থিতি দ্বারা সে মানুষকে আল্লাহর

কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার বন্ধুরা সব সময় আনন্দিত, উৎফুল্ল, ভাল লাগায় পূর্ণ থাকে। কেননা তার কথাবার্তায় আনন্দ যেন উপচে পড়ে। তার শ্রোতাদের মানসিক পরিপক্কতার স্তর অনুযায়ী সে অনেক আধ্যাত্মিক আজ্ঞা তাদের প্রদান করে। সে সত্যের ভাষ্যকার তাদের জন্য, যারা ঐশ্বরিক রহস্য উদঘাটনের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সেই ধরনের মানুষদের ভালবাসেন যারা উপরোক্ত নিয়তের অধিকারী। পুরস্কার হিসেবে তিনি অন্যদেরও তাদের ভালবাসতে শেখান। তারাও খুশী হয়ে বদান্যতা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে চলতে তার বান্দাদের পরিচালিত করে। তারা নিজেদের আত্মাহুতি দেয় তাদের চারপাশের মানুষদের অহং এর অন্ধকার জগৎ থেকে উদ্ধার করে স্বর্গীয় আলোর দিকে নিয়ে যেতে। এই প্রচেষ্টায় মুহাম্মাদ সা. সবচে' বেশি কষ্ট এবং যাতনা ভোগ করেছেন। এই বিষয়ে তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে, *"তারাই নবী যারা এই কঠিনতম পরীক্ষা সহ্য করে। নবীর পরীক্ষা তার অনুসারীদের থেকেও কঠিন।"*

একজন খাঁটি মানুষ ঐশ্বরিক গোপনীয়তার শেষ ভণ্ডার। শুধুমাত্র তারাই এই ঐশ্বরিক রহস্যময়তার সাথে পরিচিত। তারা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গতাকে প্রশংসা করতে সক্ষম হয়। যদিও একজন খাঁটি মানুষও বাহ্যিকভাবে অন্য সাধারণ মানুষের মতই। প্রকৃতপক্ষে সে এমন বান্দা যার আত্মা আল্লাহর মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। সে সবচে' উৎকৃষ্ট নকশাযুক্ত রহস্যের প্রতিনিধিত্ব করে। সে আলোর খনি। নবীজির সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভাল মানুষদের ধারাবাহিকতায় সে একটি হীরকণ্ড। যার ঐশ্বরিক জ্ঞানে প্রবেশাধিকার ছিল হযরত খিযিরের উত্তরাধিকার। এবং সেটাই তার উপর বর্তিত হয়।

একজন খাঁটি মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরও মরে যায় না। তার কাজের প্রভাব চিরদিনের মত টিকে থাকে। বহু লোকের কাছে শাহ-ই নকশবান্দা, ইমাম গাজালী, মওলানা রুমী এবং আদাবলী রাহ.-এর মহান ব্যক্তিদের আদর্শের প্রভাব এখনও গ্রহণযোগ্য। তারা এখনও অনেকের কাছে বেঁচে আছেন এবং তাদের মৃত্যুর পরও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও বেঁচে থাকবেন।

আল্লাহ্কে পেতে হলে শুধু ক্ষমতা বা সুনাম থাকলেই চলবে না বরং তা আধ্যাত্মিক শক্তির একটা সুফল। এ কারণেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একজন খাঁটি মানুষকে ইহকাল এবং পরকালের ভয় এবং বিষন্নতা থেকে রক্ষা করেন। মৃত্যুপূর্ব এবং পরবর্তী জীবনে সুখ প্রদান করেন। আলাহ তা'লা বলেন,

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

"মনে রেখ, যারা আল্লাহর যথার্থ বন্ধু তাদের কোন ভয় বা দুঃখ নেই।" (ইউনুস, ১০:৬২)

মানুষের মর্যাদার ইতিহাসে খাঁটি মানুষরাই উদাহরণ। তাদের নির্দেশনাতেই নির্ধারিত হয় কারা কালক্রমে বিশ্ব বিজেতা হয়ে ক্ষমতা লাভ করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উসমানী সাম্রাজ্যের প্রথম তিনটি শতাব্দী, শাইখ অদেবআলী এবং অন্যান্যদের ধারাবাহিকতায় তার আশীর্বাদপুষ্ট অনেক শাসক দ্বারা পূর্ণ ছিল। তারা পরিবেশটাকে তাদের দিক নির্দেশনা এবং পর্যাপ্ত আশীর্বাদ দ্বারা পূর্ণ করে রেখেছিলেন। তাদের সম্প্রদায়কে একটা আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে পরিচালনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে সুলতান ইয়াভুজ সেলিম উসমানী সুলতানদের মধ্যে সবচে' উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একজন শক্তিশালী শাসক হয়েও তিনি ইসলামের অনুগত এবং আল্লাহর বন্ধু হওয়াটাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তার এই দিকটা নিয়ে তিনি একটা কবিতাও লিখেছেন,

"বিশ্ব বিজেতা হওয়া একটা অর্থহীন যাত্রা,
আসলে আল্লাহর বন্ধু হওয়াটাই সবচে' বড় কথা।"

আমরা আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাই করি, যাতে করে সুলতান ইয়াভুজের মত একইরকম উৎসাহ নিয়ে আমাদেরও গরীব এবং দূর্বলদের ভালবাসতে পারার তৌফিক দান করেন। সুলতানুল আরিফিন মাহমুদ সামী রামাজানো গুর রাহ.-এর মত খাঁটি এবং মহান ওলীদের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে আমরা যেন না ভুলি। কারণ তারা তাদের আধ্যাত্মিক অনেক উপকার সাধন করেছেন।

মহান ওলীদের উত্তরসূরী মূসা তপবাস এফেন্দির দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা এবং তার বহু বছরের দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। (এই অধ্যায় লেখার সময় ওস্তাদ মূসা এফেন্দি অসুস্থ ছিলেন এবং তিনি ১৯৯৯ সালে মারা যান।)

দৃঢ়ভাবে আল্লাহর পথ অনুসরণ

দৃঢ়চিত্তে অনুসরণ করার আক্ষরিক অর্থ হল, "ভয়শূন্য এবং অটলভাবে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদিত করা।" সূফীদের পরিভাষায় এর সংগতিপূর্ণ অর্থ হল, "কোনরকম ক্ষতি এবং ধ্বংস ছাড়াই মানুষের নিঃস্কলুষতা এবং পরিবত্রতাকে সংরক্ষণের ক্ষমতা।"

মনের আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষার ফলাফল হল, মন যতই মুহাম্মাদ সা.-এর ফুলের মত চরিত্র অর্জনের জন্য আধ্যাত্মিকতার কাছাকাছি পৌঁছায় ততই অহং দমন করা সহজ হয় এবং নিস্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয়। সেই সাথে রহস্য ততই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা উম্মোচিত হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ লক্ষ্যের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। তখন আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছুই তাৎপর্য্য হারিয়ে ফেলে। এমন লোক ঐশ্বরিক আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে।

এই পর্যায়ে পৌঁছানো যে কত কঠিন সে ব্যাপারে জোর দিতে গিয়ে আমাদের নবীজীকেও সাবধান করে আল্লাহ তা'আলা সূরা হুদে কয়েকটি আয়াত নাজিল করেছেন। যদিও নবীজি সৃষ্টির অপরিহার্য শর্ত, সমস্ত সৃষ্টির করুণাধারা এবং একই সাথে নৈতিকতার নিখুঁত উদাহরণ ছিলেন। আয়াতটি এরকম, "সুতরাং যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে, দৃঢ়ভাবে সরল পথ অনুসরণ কর।" মুহাম্মাদ সা. এলাহী দায়িত্বের বিশাল বোঝার ভার অনুভব করে বলেছেন, *"সুরা হুদের অধ্যায়টা আমার বয়স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।"* তাঁর সাহাবীরা প্রশ্ন করেছিলেন, "হে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল! আপনার পূর্বসূরী নবীদের গল্পগুলোই কি আপনার বয়স এত বাড়িয়ে দিয়েছে?" মুহাম্মাদ সা. উত্তর দিলেন, "সেই আয়াত, **"সুতরাং সরল পথ অনুসরণ কর, যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে"** (হুদ, ১১:১১২)। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর, মুহাম্মাদ সা.-এর চুলের কিছু অংশ সাদা হয়ে যায়, আগে যা ছিল পুরোপুরি কালো রঙের। মুফাস্সিরগণ এই আয়াতটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

"হে মুহাম্মাদ! কুরআনের নৈতিকতা অনুশাসনগুলো অনুযায়ী আচরণ করলে অবশ্যই আপনি ঋজুতার দৃষ্টান্ত হবেন। যদিও আপনার সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ভণ্ড এবং পৌত্তলিকদের কথায় মনে কিছু করবেন না। আল্লাহ তাদের বিচার করবেন। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী আপনার ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক দায়িত্বগুলো পালনে দৃঢ় থাকুন এবং সত্য ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না। সেই পথ অনুসরণ করা যতই কঠিনই হোক না কেন।

এই আদেশসমূহ অনুসরণ এবং প্রয়োগে যত বাধাই আসুক না কেন হতোদ্যোম হবেন না। আপনার প্রভু আপনার সাহায্যকারী।"

এই সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি. বলেন, "কুরআনের অন্য কোন আয়াতই এই আয়াতটির আদিষ্ট দায়িত্বের মত এতটা ভারী মুহাম্মাদ সা.-এর কাছে মনে হয়নি।"

অন্যদিকে মূলতঃ এই আয়াতটি নবীজির জন্য নাযিল হলেও, তা সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং যা মুহাম্মাদ সা.-এর বয়স বাড়িয়ে দিয়েছিল তা হল, এই অনুশাসনের পথে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে পরিচালিত করার গুরুদায়িত্ব। কেননা নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা তাঁর সেই দায়িত্বটা নিশ্চিত করা হয়েছে,

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"প্রকৃতপক্ষে, সরল ও সত্য পথে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য আমার প্রেরিত অন্য অনেক নবীদের মধ্যে তুমি একজন" (ইয়াসিন, ৩৬:৩-৪)

সুতরাং সেই সরল সত্য পথ অনুসরণ করা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। এই আদেশের থেকে কঠিন আর কোন অনুশাসন নেই। তাসাউফের মতাদর্শে সবচে' প্রথম এবং প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে আল্লাহর এই অনুশাসন সবক্ষেত্রে মেনে চলার জন্য। এটা পালন করা এত কঠিন বলেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সূরা ফাতিহা বার বার পড়তে বলা হয়েছে। সূরা ফাতিহার মূল বার্তা, আমাদের সত্য ও সরল পথে পরিচালিত করা। এই কারণেই মুসলিমরা প্রতিদিন ডজন বার এই সূরাটি পড়ে যা এটাই প্রমাণ করে যে, এই পথে চলা কতখানি কঠিন ব্যাপার।

কুরআনে বর্ণিত সরল পথটি হল, আল্লাহর পথে চলা। অর্থাৎ যথাযথ পথে। আল্লাহর নাজিল করা কিতাব অনুযায়ী চলা। কুরআন অনুসরণ করা। বিশ্বাস এবং বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো মেনে চলা। ইসলাম এবং নবী মুহাম্মাদ সা.-এর এবং তার সাহাবীদের জীবনাচারণ মেনে শরিয়াহ অনুসারে চলা। ন্যায়বান ও আল্লাহর রাহে শহীদের পথে চলা। এটাই হল ইহকালের সুখ-শান্তি এবং পরকালে বেহেশত লাভের উপায়।

সরল সত্যপথ শুধুমাত্র সেই সব নির্বাচিত মানুষদের জন্য যারা আল্লাহর আশীর্বাদপুষ্ট। তারা হলেন, প্রথমত নবীরা, তারপর সত্যবাদীরা, শহীদেরা এবং ন্যায়বান মানুষেরা। আর যারা তাদেরকে অনুসরণ করে তারাও সরল ও সত্য পথের অনুসারী। এটা এমন একটা পথ যা বিশ্বাসীদের আল্লাহর অভিমূখী করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, **"যারা আল্লাহর পথে চলে, যা কিছু জান্নাতে রয়েছে, তার সবই তাদেরই জন্য। মনে রেখ, কিভাবে সব বিষয় আল্লাহর দিকেই আনত হয়। "** (সূরা, শুরা, ৪২:৫৩)

আল্লাহকে স্মরণ এবং তাঁর তুষ্টি বিধান করেই একমাত্র সরল পথে থাকা সম্ভব। **"একমাত্র আল্লাহই তোমার এবং আমার প্রভু। অতএব তার প্রার্থনা কর। এটাই সরল পথ।"** (আলে ইমরান, ৩:৫১) **"যে দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে সেই সরল পথের সন্ধান পায়।"** (আলে ইমরান, ৩:১০১)

সূরা আন'আমে সরল পথকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বলো, "এসো, আমি তোমাদের অনুশীলন করাবো, আল্লাহ যা যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। কাউকে তার শরিক না করা, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা, দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও নিজ সন্তানকে হত্যা না করা। আমরা তাদের এবং তোমার জন্য জীবন ধারনের মৌলিক চাহিদা পূরণ অব্যাহত রেখেছি। অশোভনীয় কাজ প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কখনো কর না। বিচার অথবা আইনের ব্যবহার ছাড়া কারো জীবন ছিনিয়ে নিও না। কেননা, আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ পবিত্র। অতএব, তাঁর আদেশ হল তোমাকে প্রজ্ঞাবান হতে হবে, পূর্ণ বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত। এতিমের সম্পদের সমৃদ্ধি সাধন ছাড়া সেই সম্পদের উপর কোন রূপ অধিকার রাখা চলবে না। পণ্যের ক্ষেত্রে মাপ এবং ওজনে ক্রেতাকে প্রতারিত করা যাবে না। কোন প্রাণীর উপর এমন কোন বোঝা চাপানো যাবে না যা সে বহন করতে পারবে না। যখনই কথা বলবে, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না। এমনকি তা যদি তোমার নিকটতম আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহর অঙ্গীকার পুরণ করবে যা তিনি আদেশ করেছেন। বস্তুতপক্ষে, এটাই আল্লাহর আদিষ্ট সরল পথ। এটাই অনুসরণ কর, অন্যদের পথ অনুসরণ কর না। তারা তোমাকে পথভ্রষ্ট করবে। অতএব, আল্লাহর এই আদেশ যে তুমি ন্যায়নিষ্ঠ হও।" (সূরা আন'আম, ৬ঃ১৫১-১৫৩)

মানুষ স্রষ্টার অন্যান্য সৃষ্টির চাইতে আল্লাহকে যদি বেশী না ভালবাসে তাহলে সে কখনোই সরল ও সত্য পথের সন্ধান পাবে না। এই পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে আল্লাহর প্রাপ্য অর্থাৎ তাঁকে জানা দরকার। অতএব, এটা বলা যেতে পারে যে সরল এবং সত্যের পথ হল আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। কারণ যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করে এবং সেই অনুসারে নিজের জীবনকে সাজায়, সেই তার প্রকৃতির নেতিবাচক গুণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এবং শয়তানের শয়তানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এই পর্যায়ে পৌঁছালে সেই ব্যক্তির মন আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ লাভ করে। তার কাছে আধ্যাত্মিক জগতের জানালা খুলে যায় এবং পুরো জগত প্রজ্ঞার এক বিশাল পুস্তকে রূপান্তরিত হয়।

আল্লাহর জ্ঞান অর্জনকারী আবু সাইদ আল খাররাজ নামের একজন আলোকিত মানুষ স্বপ্নে শয়তানকে দেখতে পান। স্বপ্নে তিনি লাঠি দিয়ে শয়তানকে আঘাত করার চেষ্টা করেন। ইবলিস তখন বলেছিল, "হে আবু সাঈদ! আমি তোমার লাঠিকে ভয় করি না। কেননা এই লাঠিকে চোখে দেখতে পাওয়া যায়। আমি যেটাকে ভয় পাই তা হল, আল্লাহর জ্ঞানে আলোকিত সেই ব্যক্তির মনকে যে মন আল্লাহর আরশ থেকে পাওয়া আধ্যাত্মিক

জ্ঞান। সে জ্ঞান সূর্যের মত উজ্জ্বল আলোর ইলাহী এক শক্তিতে পূর্ণ। জ্ঞানের শক্তির প্রখরতায় যে কোন কিছুই ভস্মীভূত হয়ে যেতে বাধ্য।"

দৃঢ় ঋজুতা ছাড়া সরল পথ অনুসরণকারী একজন শিষ্যের পক্ষে সেই পথে চলা প্রায় অসম্ভব। তার বিশাল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায় এই ঋজতা অর্জন না করতে পারলে। সেই কারণে এই ঋজুতাকে আলল্লাহ তা'আলা একটি বিশাল অলৌকিকতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অন্য একটি সংজ্ঞানুসারে সরল পথের অর্থ হল সব কাজে পরিমিতি বোধ থাকা অর্থাৎ অমিতব্যয়ী অথবা কৃপন হওয়ার মত চরম কোন পর্যায়ে না যাওয়া। সরল পথে ধৈর্য্যের সাথে লেগে থাকা এবং আদিষ্ট ইলাহী বিধানগুলো মেনে চলা।

তাই আল্লাহর প্রেরিত নবী সা. ঈমানদারদের সব কাজে এই পরিমিতি বোধ অনুসরণ করতে বলেন। এটা সবার জানা প্রয়োজন যে, এই নীতি অনুসরণ করেই প্রিয় নবী সা. সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি বাহ্যিকভাবে একজন সাধারণ মানুষের সীমার মধ্যে থেকেছেন যাতে তাদের জন্য তিনি একটা দৃষ্টান্ত হতে পারেন। তাঁর জীবন পরিবারের অন্য সকলের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং অন্যসব সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি সফল উদাহরণ। আল্লাহর দূত তাঁর এইসব কার্যকলাপকে সঠিকভাবে এবং সঠিক জায়গায় চর্চা করেছেন এবং আপন সম্প্রদায়কে এই বিষয়ে সঠিক চর্চা করেছেন। নিজ সম্প্রদায়কে এই শিক্ষার সঠিকভাবে প্রয়োগের পথ দেখিয়েছেন। নবীজির এই অনুশাসন থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং হটকারীদের মানতে গিয়ে নিজের দায়িত্ব কর্তব্যে অবহেলা করা তাই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব আমাদের অবশ্যই মুহাম্মাদ সা.-এর নির্দেশিত পথে জীবন কাটানো উচিত।

মহান সূফী সাধক আবদুল খালিক গুজদুওয়ানী এই বিষয়টির সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথমবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আমরা কি আমাদের অহং দ্বারাই পরিচালিত হবো নাকি হবো না?" শাইখ প্রত্যুত্তরে বললেন, "এই দুইটিকে আলাদা করা খুব শক্ত কাজ। অহং আসলে মানুষের আকাঙ্খাকে প্রতারিত করে। শয়তানের প্ররোচনায় ঐশ্বরিক কী না তা চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায় এই অহংকারের কারণে। এই কারণে আল্ল-াহর অনুশাসনগুলো মেনে চলা এবং তাঁর নিষেধগুলো থেকে বিরত থাকাই ভার। এটাই সত্যিকারের আনুগত্য।"

আল্লাহ্ বলেন, **"বলো, এটাই আমার পথ। আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে অবনত হতে আহবান করছি। সেই বিশেষ জ্ঞানের দিকে যা আমি অনুসরণ করছি। এবং যে আমাকে অনুসরণ করছে। আল্লাহ মহান এবং আমি কখনোই পৌত্তলিকদেরকে আল্লাহর শরিক সাথে করবো না।"** (ইউসুফ, ১২ঃ১০৮)

যুগে যুগে মানবজাতি যে অজ্ঞতার অন্ধকার অতিক্রম করেছে যেমন যখন মানুষ বস্তু জাগতিক ক্ষমতা এবং অহং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত তখন আল্লাহ তা'আলা কিছু অসাধারণ ধার্মিক ব্যক্তিদের এইসব অনালোকিত মানুষদের পথ দেখানোর দায়িত্ব দিলেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের সম্প্রদায়ের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। যাদের দায়িত্ব ছিল,

১. কুরআন পাঠ করা এবং ব্যাখ্যা করা।

২. সেই পবিত্র গ্রন্থের প্রজ্ঞা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা।

৩. তাদের প্রকৃতি পবিত্র করা অর্থাৎ বিপথগামী মানুষদের যথাযথ দিক নির্দেশনা দেয়া।

আদম আ. থেকে শুরু করে পথ প্রদর্শকদের এই পবিত্র ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণতা লাভ করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.- এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। সরল পথ হল তাদের বাতলানো পথে একগুচ্ছ সৎ কাজের আমল করা। সহি আমলের দুইটা শর্ত আছে,

১. আল্লাহর বিধানকে যথাযথ এবং বিনীতভাবে পালন করা।

২. স্রষ্টার সৃষ্টিসমূহকে ভালবাসা এবং তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করা।

অন্যকথায়, আল্লাহর রাসুলকে দৃঢ়তার সাথে ভালবাসা এবং তাঁর দৃষ্টান্তমূলক ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করা। কুরআন এবং সুন্নাহর আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন-যাপন করা। জাগতিক মোহ থেকে দূরে থাকা এবং প্রাথনা, আনুগত্য ও জ্ঞানের রহস্য উম্মোচনে লেগে থাকা।

একজন ব্যক্তির উচিত সত্য এবং নিষ্ঠা নিজের মধ্যে জাগ্রত করে। নিজের ইন্দ্রিয়গুলো কে নিয়ন্ত্রণে রাখা। আল্লাহর রাহে আমরা যে সমস্ত কাজ করে থাকি সেগুলো থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যা আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকারকে পুরোপুরি নাকচ করে দেয়। এজন্যই শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই যাবতীয় কাজ করা উচিত।

উমর ইবনুল খাত্তাব পর্যন্ত পর্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকতেন এই ভেবে যে, তিনি আল্লাহর পথে আন্তরিকতা এবং ঋজুতার সাথে চলতে পারছেন কিনা। যখন তিনি খলিফা হলেন তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, "হে মক্কাবাসী! যদি আমি আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে সরে যাই অথবা ভুল পথে হাঁটতে শুরু করি আপনারা তাহলে কি করবেন?" একজন বেদুইন দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "হে খলিফা! চিন্তা করবেন না। যদি আপনি ভুল পথে চলেন তাহলে আমরা আমাদের তলোয়ার দিয়ে আপনাকে শুদ্ধ করে দেবো।" এই উত্তরে খলিফা খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললেন, "হে প্রভু সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্যই। আপনি এমন এক সম্প্রদায়ের আশীর্বাদ আমাকে দিয়েছেন যারা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে আমাকে আবার সরল পথে ফিরিয়ে আনবে।"

মুহাম্মাদ সা. শুধুমাত্র হুযাইফা নামক এক বিশ্বাসীকে মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তার জন্য মুনাফিকদের খবর দিলে উমর রাদি.-এর কানে এই কথা আসলে। তিনি হুযইফাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ও হুযাইফা! আল্লাহর কসম! আমাকে বলো, আমার মধ্যে কি ভণ্ডামির কোন চিহ্ন লক্ষ্য করেছ?" হুধায়ফা উত্তরে বললেনঃ "ও খলিফা! আমি শুধুমাত্র আপনার ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আপনার মধ্যে সেই চিহ্ন নেই।"

হাসান আল বসরি রাহ. তাঁর শিষ্য হাদীস প্রণেতা তাউসকে বললেন, "হে তাউস! যদি হাদিস শেখাতে গিয়ে তুমি অহংকার বোধ কর, তাহলে এই বিষয়ে শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকো।" তিনশত শিক্ষার্থীর শিক্ষক ইমাম গাজ্জালী রাহ.-ও নিজের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। "এই ছাত্রদের পড়ানোর উদ্দেশ্য কি আল্লাহর নৈকট্য লাভ নাকি আমি খ্যাতির মোহের ফাঁদে পড়ে বিপদগ্রস্থ হওয়া?" এই প্রশ্ন তিনি নিজেকে বারবার করতেন।

সুলতান ইয়াভূজ সেলিম মিশরে সমরাভিযান থেকে ফেরার পথে জানতে পারলেন ইস্তাম্বুলের জনগণ সুলতানের আগমনে গভীর উত্তেজনা নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে কারণে, নিজ শহরের অনেক নিকটে এসেও তিনি কামলিকা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু গাড়লেন। তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন পাছে তার অহং বোধ জেগে ওঠে, তখন তিনি তার ভৃত্য হাসান খানকে ডেকে বললেন, "রাতে সবাই বাড়ী ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত চলো অপেক্ষা করি; তারপর আমরা ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করবো। মানুষের প্রশংসা এবং হাত তালির দরকার নেই। কেননা বিজয়ের অহংকার আমাদের শক্তিহীন করে ফেলবে।"

অবশেষে জনগণের করতালি এবং প্রশংসা ছাড়াই চুপিসারে তিনি শহরে প্রবেশ করলেন। এসব উদাহরণ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন যেকোন পরিস্থিতিতেই সরল পথকে অটলভাবে অনুসরণ করতে পারি এবং সে কারণে আমাদের উচিত মনকে সব ধরণের কালিমা থেকে মুক্ত রাখা।

এই হৃদয়েই আল্লাহ্ প্রতিভাত হন। প্রার্থনার মূল্য নির্ভর করে হৃদয়ের স্বচ্ছতার উপর। কুরআনের ভাষায় **"এমন দিন আসবে যখন না ধন-সম্পদ না পুত্র সন্তানের প্রাপ্তি ঘটবে। বরং সেই শুধু সমৃদ্ধি লাভ করবে যার হৃদয় ছিল আল্লাহর প্রেমে মত্ত।"** (শু'আরা ২৬ঃ৮৮-৮৯)

এই কথারই পুনরাবৃত্তি আমরা শুনতে পাই রাসুলের উক্তিতে, *"সত্যিকারার্থে আল্লাহ্ তোমার চেহারা বা ধন সম্পদের বিচার করেন না; বরং তিনি বিচার করেন, তোমার বিশুদ্ধ মন এবং ভাল কাজ"* (সহিহ মুসলিম)

আমি আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাই করি যে, তিনি যেন সরল পথে চলার তৌফিক দান করেন। আমীন!

ন্যায়বান এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকা

একদা এক অজ্ঞ লোক ছিল, আল্লাহর বন্ধুদের সে ঘৃণা করতো। একদিন এক দরবেশ শাইখের আশ্রমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মনে শাইখের হাল হাকিকত জানার কৌতূহল জাগলো। সে লুকিয়ে চোরের মত উঁকি দিয়ে দেখল যে, অনেক দরবেশ একসাথে বসে আছেন। সেখানে ওয়াজ চলছে। উদ্ধ্যত লোকটা তাদেরকে হীন ভেবে নিজের পথে রওয়ানা দিল।

সেই রাতে সে একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নটা অনেকটা এরকম- শেষ বিচারের দিন হয়েছে। হাশরের মাঠের বিচারের পর শয়তান তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে সেই আশ্রমের শাইখ উপস্থিত হলেন এবং শয়তানকে বললেন,"ওকে ছেড়ে দাও, গতকাল ওকে আমাদের জমায়েতে দেখা গেছে।"

শয়তান উত্তরে বলল, "কিন্তু সে একজন ভীষণ অহংকারী লোক এবং দোজখই ওর প্রাপ্য।"

ঠিক তখনই লোকটার ঘুম ভেঙে গেল। সকালে প্রথম যে কাজটি সে করল, আশ্রমে গেল এবং প্রজ্ঞার আসরের সভা হল।

আনাস ইবনু মালিক রাদি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, একদল ফেরেশতা জিকির জমায়েতের আসর খুঁজতে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এরকম জিকির আসরের সন্ধান পাওয়ার পর তারা সেই আসরের চারদিক ঘিরে ধরলেন এবং বললেন,"হে প্রভু! আপনার ঐ সকল বান্দারা আপনার পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করছেন। আপনার প্রেরিত রাসূলের গুণগান করছে। এবং আপনার কাছে ইহকাল এবং পরকালের আকাঙ্খাগুলো পূরণের দাবী করছে।"

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বললেন, "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি ওদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।"

ফেরেশতারা বললেন, "হে প্রভু! ভুলক্রমে সেই জমায়েতে কিছু উদ্ধত লোকও ছিল।"

সর্বশক্তিমান আল্লাহ উত্তর দিলেন, "জমায়েতের অংশগ্রহণকারীরা সবাই ন্যায়বান এবং সত্যবাদী। অতএব যারাই তাদের সঙ্গ লাভ করবে তারা কখনোই আমাকে অমান্য করবে না।"

উপরোক্ত সংলাপ থেকে যে বার্তা আমরা পাই, তা মুসলিমদের ন্যায়বান এবং সত্যবাদী হতে উৎসাহিত করে। তাসাউফের শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতা থেকে লাভবান হওয়ার জন্য এবং অন্য নেতিবাচক দিকগুলো থেকে মনকে রক্ষা করার জন্য ন্যায়বান এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকাটা জরুরী সাব্যস্ত করা হয়। দেহের অন্যান্য অঙ্গের মত হৃদয় নয়; হৃদয় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে না। এটা সহজেই পরিবেশ এবং পরিস্থিতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। হৃদয় সহজেই চারপাশের পরিবেশের রং এবং বৈশিষ্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবেশের প্রভাব হয় ইতিবাচক নয় নেতিবাচক হয়।

যদি এই হৃদয় নামক অঙ্গটি যথাযথ শিক্ষা এবং নিজের উপর কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পারে তাহলে তা ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হয়। আধ্যাত্মিক উত্থান বা পতন নির্ভর করে নিজের মধ্যে ভালবাসা এবং ঘৃণার পরিমাণ কতখানি আছে তার উপর। আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতার পথে জরুরী হল, যা ভালবাসার যোগ্য তাকে ভালবাসা এবং যা ঘৃণার যোগ্য তাকে ঘৃনা করা।

আল্লাহর ন্যায়বান এবং সত্যবাদী বান্দাদের সাথে থাকাটা এবং তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার গুরুত্বটা অনেক। সত্যবাদীদের সংস্রবে যথেষ্ট পরিমাণে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি সাধিত হয়। যাই হোক ভালবাসার বস্তুকে ভালবাসার উপরই নির্ভর করে কতখানি লাভবান হবে সে। অন্যথায় শুধু পারস্পরিক সঙ্গলাভের ফলে কিছু লাভ হওয়া সত্ত্বেও সত্যিকারার্থে অল্প কিছুই পাওয়া যায়।

এটা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 'সাহাবী' এবং 'সুহবাত' দুইটা শব্দেরই উৎপত্তি আরবী ভাষা থেকে। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ সা.-এর সঙ্গীরা তার মজলিশ থেকে সবচে' লাভবান হওয়ার উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কেননা প্রিয় নবী সা.-এর প্রতি তাদের ছিলো ভালবাসা এবং সম্মানের প্রাচুর্য্যতা; তারা কিভাবে আধ্যাত্মিক জগতের এত উর্ধ্বে উঠল তা বুঝতে হলে আমাদের বুঝা দরকার যে, নবীজিকে তারা কী পরিমাণ শ্রদ্ধা এবং সম্মান করতেন। একজন সাহাবী উল্লেখ করেন, "আমরা এত মুগ্ধভাবে নবীজির ওয়াজ শুনতাম যে নড়াচড়া করতেও ভয় পেতাম।"

নবীজি তাঁর সঙ্গীদের তৃষিত হৃদয়ে প্রজ্ঞা এবং করুণার বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। নবীজির সঙ্গ লাভে তারা ধন্য হতেন। তাদের হৃদয়ের ভূমি থেকে যেন প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের বীজ উৎসারিত হতো। তাদের হৃদয়ে নবীজির ভালবাসা এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন হিসেবে তৈরী হত দৃষ্টান্তমূলক নতুন ব্যক্তিত্বের। জাহিলিয়াতের (ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার বা অন্ধকার যুগ) পুরোনো ব্যক্তিত্বগুলো যারা কন্যা সন্তানদের পর্যন্ত জীবন্ত কবর দিত এবং এ ধরনের আরো অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করতো, এমন লোকগুলোর মন থেকে সকল পঙ্কিলতা বিলুপ্ত

করে দেয়ার কারণে একই শরীর এবং মনে স্থান করে নিয়েছিল নম্র, নিরহংকারী এবং সংবেদনশীল সত্তার।

যেখানেই যায় তারা, সঙ্গে বয়ে বেড়ায় নবী মুহাম্মাদ সা.-এর দৃষ্টান্তমূলক জীবনাচরণ। তাদের নৈতিকতার উৎকর্ষ জীবন চরিত মানব জাতিকে চিরদিনের জন্য সরল পথ প্রদর্শন করবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ নবীজির সাহাবীদের নিম্নলিখিত আয়াতের মাধ্যমে প্রশংসা করেছেন,

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"ইসলামের পুরোগামী দল প্রথম। যারা আল্লাহর রাহে গৃহত্যাগী এবং তারা, যারা এদেরকে সহায়তা করছেন। তারাও এ কাতারে শামিল হবে যারা তাদের ভাল কাজগুলো অনুসরণ করেছেন। তাদের প্রতি আল্লাহ খুব সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি খুশি। সেই সব পুরোগামী দলের জন্য আল্লাহ বেহেশতী বাগান এবং স্রোতসিনি নদী তৈরী করেছেন। যাতে করে তারা চিরকাল সেখানে বসবাস করতে পারে। আর এটাই সর্বোচ্চ বিজয়।" (সূরা তাওবাহ, ৯:১০০)

বিশ্বাসীদের ধর্মীয় হিতোপদেশ এবং মজলিশের সৌন্দর্য্য, নবীজির মজলিশের সৌন্দর্য থেকে পাওয়া। পণ্ডিত এবং আল্লাহর বন্ধুদের কথার মধ্যে নবীজির আলোই প্রতিফলিত হয়। মুসলিমদের ঐ মজলিশগুলোর অর্থবহতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। কেননা তারা যেন জান্নাতের বাগানের মত যেখানে আল্লাহর প্রেমে চক্ষু এবং হৃদয় অনবরত কাঁদে। আমাদের অবশ্যই এ ধরনের মজলিশে অংশগ্রহণ এবং সেইসব ধার্মিক এবং সত্যবাদী বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকা উচিত। আর এভাবেই আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ এবং মনকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করা সম্ভব।

যদি কোন বিশ্বাসী নেতিবাচক প্রভাব থেকে তার আধ্যাত্মিক উন্নতিকে রক্ষা করতে চায় তাহলে তাকে পাপী এবং উদ্ধত ব্যক্তিদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকতে হবে। সেই সব পাপীরা যেন অনেকটা খারাপ বাতাসের মত যা গলিত শবের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে অথবা

স্তুপীকৃত আবর্জনা যা চারিদিকে দূর্গন্ধ ছড়ায়। এই বাস্তবতার নিরিখে শাইখ উবায়েত তাঁর অনুসারীদের সাবধান করেছেন, "পাপীদের সাহচর্য্য স্নায়ুবিক উত্তেজনা, বিচ্ছিন্নতা এবং মনোযোগ বিনষ্ট করে।"

একদিন আবু ইয়াজিদ আল বিসতামীর খুব বিষন্ন বোধ করলেন। তিনি কিছুতেই মনোযোগী হতে পারছিলেন না এবং তাঁর মজলিশের বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলেন: "আমাদের মধ্যে কি কোন আগন্তুক (পাপী) আছে?" বন্ধুরা চারিদিকে খোঁজ নিলো। কিন্তু এমন কাউকে দেখতে পেল না যাকে তারা চেনে না। আবু ইয়াজিদ আবার বললেন, "ভালভাবে খোঁজো! যেখানে সবার ছড়িগুলো আছে সেখানে খুঁজে দেখো। সেখানে পাপীর উপস্থিতির চিহ্ন নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। অন্যথায় আমি এত অস্বস্তি বা বিষন্ন বোধ করতাম না।"

তারা আরও একবার অনুসন্ধান করল এবং একজন পাপীর ছড়ি দেখতে পেল। তারা সেটা বাইরে ফেলে দিল। আবু ইয়াজিদের মনের শান্তি এবং আধ্যাত্মিক মগ্নতা পুনরায় ফিরে এলো।

আর একটি ছোট্ট সত্য কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যায়। উবাইদুল্লাহ আহরার তাঁর এক ঘনিষ্ট সঙ্গীকে বলেছিলেন, "আমি তোমার মধ্যে কিছু গলদ অনুভব করছি। আমার মনে হয় তুমি কোন পাপীর পরিচ্ছদ পরিধান করেছ।" তার সঙ্গী আশ্চর্যান্বিত হয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তাই। তারপর সে তার পোশাক পাল্টিয়ে পুনরায় যোগ দিল।"

এই সূত্র ধরে আর একটি উদাহরণ ইউসুফ আ. এবং তাঁর বাবা ইয়াকুব আ.-এর গল্প থেকে পাওয়া যায়। ইয়াকুব আ. তাঁর এই পুত্রকে সবচে' বেশি ভালবাসতেন। কেননা ইউসুফের মধ্যে তিনি নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করেছিলেন। পুত্রের জন্য তাঁর ভালবাসা এতটাই তীব্র ছিল যে, ইউসুফের গায়ের শার্ট যখন তাঁর কাছে পাঠানো হল তখন তিনিই সেটা সনাক্ত করেছিলেন যে, এটা ইউসুফের শার্ট; অন্য কেউ নয়। শার্টে তিনি পুত্রের গায়ের গন্ধটা থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন।

যদি আল্লাহর বন্ধুদের আধ্যাত্মিক স্তর যে কোন বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারে, তাহলে নিঃশঙ্কচিত্তে হৃদয়ের চাহিদা পূরণ করাটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা সন্দেহাতীতভাবেই হৃদয় বস্তুর চাইতে বেশী সংবেদনশীল। তাসাউফের বিজ্ঞ আলেমগণ বলেন, এমনকি জড় বস্তুর উপরও মানুষের কাজ এবং নৈতিকতার প্রভাব পড়ে। যেখানে ভাল কাজ সম্পাদন হয় সে জায়গায় প্রার্থনা করা এবং যে জায়গায় খারাপ কাজ সম্পাদন হয় সে জায়গায় প্রার্থনা করা - দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। এ কারণেই কাবা শরীফে প্রার্থনা করলে যে পুরস্কার পাওয়া যায় তা অন্য কোন জায়গায় করলে পাওয়া যায় না।

রাসুল সা.এর জীবনী থেকে আমরা আর একটা উদাহরণ পেতে পারি। একদিন তিনি মুহাস্সির উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। মুহাস্সির উপত্যকা আরাফাত এবং মুখদালিফ এর মাঝখানে অবস্থিত। সঙ্গীরা বিস্মিত হলেন, " হে আল্লাহর দূত, হঠাৎ আপনি এত তাড়াহুড়ো করে এগোচ্ছেন কেন?"

মুহাম্মদ সা. বললেন, *"সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্বৈরাচারী আবরাহা এবং তার সৈন্যদের এই জায়গায়ই ধ্বংস করেছিলেন।"*

আর একটি ঘটনা এরকম যে, রাসুল সা. তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। সাহাবিরা খুব ক্লান্ত ছিলেন। অতএব তারা একটু বিশ্রাম করতে চাইলেন। একদা সামুদ জাতিরা যে এলাকায় বাস করতো, সেখানে তারা থামলেন। নবীজী বললেন, "আলাহ্ এই জায়গায় সামুদ জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন। এখান থেকে পানি আহরণ করো না। যাতে করে তাদের দুঃখ তোমাদের প্রভাবিত করতে না পারে। তারা বললেন, *"হে আল্লাহর দূত! আমরা ইতোমধ্যেই আটার খামিরা তৈরী করেছি এই পানি দিয়ে। আমাদের থলেতেও এই পানি ভরে ফেলেছি।"* একথার পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল সা. তাদেরকে আদেশ করলেন, *"সেই আটা তাদের উটগুলোকে খাওয়াতে এবং পানিগুলো ফেলে দিতে।"* (বুখারি, আনবিয়া, ১৭)

এইগুলোর সবি একই ধরনের হাদীস। যেগুলোর বক্তব্য হল, অচেতন বস্তুও তাদের চারিদিকে সংঘটিত খারাপ অথবা ভাল ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ঠিক যেমন আল্লাহর বন্ধুরা মজলিসে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাদের আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ, তাদের ভালবাসা এবং হর্ষ ছড়িয়ে দেন। তাদের হৃদয়ের আলো অন্যদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, পার্থিব বস্তুসমূহ একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে। একিভাবে আধ্যাত্মিক পরিস্থিতি এবং বস্তুসমূহ পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রতিফলন এবং রূপান্তরের বিস্তৃতি দ্বারা হৃদয় প্রজ্ঞা এবং সত্যের আলোকে পূর্ণ হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন ভোরের বাতাস যেখানেই বহে সেখানেই গোলাপ, মৃগ নাভীর মিষ্টি সুগন্ধ এবং অন্যান্য সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয়। অতএব আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতা এবং ন্যায় এবং সত্যের শুভ দিকটা থেকে লাভবান হতে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং যারা সত্যবাদী তাদের সঙ্গে থাকো।" (সূরা তওবা, ৯:১১৯)

কারো বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য প্রয়োজন যারা কাজে কর্মে সৎ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসায় বিশ্বস্ত, এমন মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করা। আল্লাহর এ ধরনের

বন্ধুদের ভালবাসতে পারলে তারা যেই আধ্যাত্মিক মঞ্জিলে পৌঁছেছেন সেখানে আমরাও সহজই প্রবেশ করতে পারবো।

একদিন একলোক আবু ইয়াজিদকে জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে এমন একটি ভাল কাজ করার পরামর্শ দিন যা আমাকে আল্লাহর বন্ধুদের নৈকট্যলাভে সাহায্য করবে।" আবু ইয়াজিদ বললেন, "আল্লাহর বন্ধুদের ভালবাসো এবং তখন তারাও তোমাকে ভালবাসবে। তাদের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়ার চেষ্টা কর। কেননা আল্লাহ তাদের হৃদয়ের গভীরে দিনে তিনশো ষাট বার প্রবেশ করেন। যদি তিনি তাদের কোন একজনের হৃদয়ে তোমাকে চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে তাঁর ক্ষমা তুমি পাবে।"

সে কারণেই তাসাউফের চর্চায় রাবিতা অর্থাৎ যোগাযোগ, সরল পথের পথ প্রদর্শক এবং তার শিষ্যদের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করে। যখন আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শিষ্যরা এই সংযোগ স্থাপন করে তখন হৃদয়ে আল্লাহর বন্ধুদের পরামর্শ অনুযায়ী আল্লাহর প্রতি ভালবাসা এবং আনুগত্য মনে ধারণ করে। কেননা সে বন্ধুদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। 'রাবিতার মাধ্যমে অনুসারী তার পথ প্রদর্শকের সাথে নিখুঁত সাজুয্য অর্জন এবং সে সব ধরনের আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ লাভ করতে পারে।

ভালবাসার তীব্রতায় 'রাবিতা' হৃদয়ে উচ্চতর আধ্যাত্মিক সংবেদনশীলতা জায়গায়। এই সংবেদনশীলতার মাধ্যমে অনুসারী পথ প্রদর্শকের সাথে একাত্মতার পথে যাত্রা শুরু করে। ভালবাসা এবং আধ্যাত্মিক সংশ্লিষ্টতার মধ্য দিয়ে আশেক তার মাশুলের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়।

জালালুদ্দীন রুমী এই পর্যায়টাকে নিম্নলিখিত ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, "যখন নদী সাগরে মেশে, তখন তা সাগরই হয়ে ওঠে, আর নদী থাকে না। যে রুটি আমরা খাই, তা পাকস্থলীতেই পরিপাক হয়ে আমাদের দেহেরই অংশ হয়ে ওঠে। একইভাবে তার ভালবাসায় গভীরতায়, আশেক তার মাশুকের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

এই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর্যায়টাকে রুমী এভাবে ব্যাখ্যা করেন, "আমার শরীরের শিরা উপশিরা এবং ত্বক ভালবাসা দ্বারা পূর্ণ। এটা আমাকে আমার সত্ত্বা ভুলিয়ে দেয়। আমার অস্তিত্বকে মমতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়। আমার বন্ধু যখন আমার শরীরের সব অংশগুলোকে আবৃত করে, তখন আমার নাম শুধু রয়ে যায় বাকী শুধু তিনি।

আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী বাণীতে এই পর্যায়কে বলা হয় ফানা ফিল্লাহ এবং বাকা বিল্লাহ। অর্থাৎ যথাক্রমে আল্লাহর তবে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং তাঁর সাথে চিরকালের জন্য একাত্ম হওয়া। যাই হোক, প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক অনুশীলন ছাড়া আল্লাহর ভালবাসা সরাসরি

লাভ করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। হৃদয়কে এই গুরুভার বহন করার জন্য তৈরী করতে হয়।

আবু বকর রা. নবীজিকে ভীষণ ভালবাসতেন। এমনকি তাঁর উপস্থিতিতেও নবীজির জন্য তার ভালবাসা এবং তাঁকে পাওয়ার আকুল আকাঙ্খা কমতে থাকার পরিবর্তে বাড়তে থাকে। যখন আবু বকর রা. তার সব সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়েছিলেন তখন মুহাম্মাদ সা. তাঁর খুব প্রশংসা করেছিলেন। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর নবী! আমার জীবন, আমার ধন-সম্পদ, আমার সর্বস্ব আপনাকে পাওয়ার মুক্তিপণ।"

রুমী এই ধারণাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "যদি সোনা, জীবন, মনি-মুক্তা এবং মনি মানিক্য মাশুকের জন্য ব্যয় করতে না পারা যায় তাহলে সেগুলো অর্থহীন।"

কথিত আছে, আবু বকর রা. মজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, নগ্ন হয়ে গোসল করার সময়ও তিনি আল্লাহকে লজ্জা পেতেন। আল্লাহকে এত অধিক ভালবাসার কারণে নবীজি মৃত্যু শয্যায় বলেছিলেন, "আবু বকরের দরজা ছাড়া বাকী সব দরজা বন্ধ হয়ে যাক।" (সেই সময়ে কিছু লোক মসজিদে প্রবেশের জন্য ব্যক্তিগত দরজা ব্যবহার করতেন, নবীজি সেই সব দরজা বন্ধ করে দিতে চাইলেন। শুধুমাত্র আবু বকরের দরজা ছাড়া। এ ছিলো তাঁকে সম্মান স্বরূপ।)

শাইখ সা'দী সিরাজী রাহ. এই পারস্পরিক প্রভাবটাকে নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, "গুহায় সঙ্গ দেয়া কুকুরদেরও তাদের সাথে থাকার জন্য সম্মান দেয়া হয়েছে। এমনকি এটা কুরআনেও উল্লেখ আছে এবং ইতিহাসের এটা অংশ হয়ে গিয়েছে। অথচ লুত আ.-এর পত্নী পাপী এবং বিশ্বাসঘাতকদের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।"

ন্যায়বান এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকার ফলে "সাজুয্যতা এবং অদ্বিতীয়তার" যে অর্জন, তা রূপকভাবে তিনি নিম্নলিখিত গল্পে বিবৃত করেছেন,

"একজন লোক ফ্রেশরুমে গেল। তার এক বন্ধু তাকে সুগন্ধি মাটি দিয়েছিল গায়ে মাখার জন্য। সেই মাটির চমৎকার সুগন্ধ ওয়াশরুমের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকটা সেই মাটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সুগন্ধটা আমার খুব ভাল লেগেছে; বলোতো, তুমি মৃগনাভী না অম্বর মনি?

মাটি উত্তর দিল. "আমি মৃগনাভীও নই, অম্বর মনিও নই, সামান্য মাটি মাত্র। আসলে আমি একটি গোলাপ ঝাড়ের নিচে ছিলাম এবং সেই গাছের পানি দ্বারা সিক্ত হতাম। আমার সুগন্ধ সেই গোলাপ থেকেই এসেছে।"

এই উদাহরণগুলো পরিস্কারভাবে দেখায়, আমাদের উচিত আল্লাহর বন্ধুদের কাছে নিজেদের আন্তরিকভাবে সমর্পণ করা। এভাবে তাঁদের হৃদয়ে থাকা ঐশ্বরিক আলোর প্রতিফলন আমরা নিজেদের মধ্যে ঘটাতে পারি। যেমন চাঁদ সূর্যের আলোর প্রতিফলন নিজের মধ্যে ঘটায়।

হে প্রভু! তোমার প্রেমে মশগুল এবং বিশ্বাসী সেইসব সত্যবাদী মানুষের সাথে আমাদের হাশরের ময়দানে পুনরুত্থান কর। নবীজী এবং তার সাহাবীদের মজলিশের সূত্রে আমাদেরকে সেই পূণ্য প্রদান কর।

আমীন!

আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা

যখন কোন বান্দা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় নিজ হৃদয়ে বৈষয়িক চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, বান্দার এমন কাজকেই একাগ্রতা বা ইখলাস বলা হয়।

এই একাগ্রতার ফলকে বলা হয় ইহ্সান তথা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন সে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে এবং সেই সচেতনতা নিয়ে বেঁচে থাকা যেন সব সময় আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি কর্মের দিকে নজর রাখছেন। ইমাম কুশায়রি নিম্নলিখিত সংলাপটি বিবৃত করেছেন,

"খুরাসানে আমর ইবনু লাইস নামক একজন সেনাধক্ষ্য ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর একজন ধার্মিক মানুষ তাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি সেনাধক্ষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহ আপনার সাথে কি রকম ব্যবহার করেছেন?

"আল্লাহ আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

"কেন আল্লাহ আপনার সব দোষ-ত্রুটি মাফ করে দিলেন?

আমর উত্তর দিলেন, "একদিন একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলাম। নিচে আমার সৈন্যবাহিনী ছিল। তাদের দিকে তাকালাম। তাদের শক্তি এবং সংখ্যাধিক্য আমাকে খুব সন্তুষ্ট করলো। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'ইস, আমি যদি এই সুপ্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে নবীজির জেহাদে শামিল হতে পারতাম এবং নবীজির কঠিন সময়ের সাথী হতে পারতাম। এই সম্মানজনক কাজের জন্য আমি আমার জীবন দিয়ে দিতে পারবো।' আমার এই আন্তরিক অনুভূতির জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমা আমি পেয়েছি। তিনি আমাকে অনেক মহৎ জিনিষ দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন।"

এই ঘটনাটি, কিভাবে আন্তরিক অনুভূতি এবং সেই অনুসারে কাজ করাটা পুরস্কৃত হয় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও সেই সেনধক্ষ্যের অভিপ্রায় পুরস্কৃত হওয়ার জন্য ছিল না।

এই বিষয়ে প্রিয় নবী সা. বলেন যে, একজন মুমিনের অভিপ্রায় সেই অনুযায়ী কাজ করা থেকেও বেশী মূল্যবান।

কোন কাজের মূল্য নির্ধারিত হয় ঐ কাজের পিছনের অভিপ্রায় অনুসারে। যদি আপাতঃদৃষ্টিতে মনেও হয় যে কাজটি ভালই কিন্তু এর পেছনের উদ্দেশ্যটি ভাল নয় তবে

সেই কাজটি ভাল কাজ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন, "যে কোন কাজ তার পেছনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিচার্য্য।"

"যে কোন কাজের পুরস্কার নির্ভর করে সেই কাজের পিছনের অভিপ্রায়ের উপর। প্রত্যেকে নিয়ত অনুসারেই তাদের পুরস্কার পায়। সুতরাং যে আল্লাহ এবং তাঁর নবীদের জন্য দেশান্তরী হয়েছে তার দেশান্তরী হওয়ার অর্থ সে আল্লাহ এবং তাঁর নবীদের জন্যই তা করেছে। আর যে, বৈষয়িক লাভের জন্য অথবা তার প্রেমিকাকে বিয়ে করার জন্য দেশান্তরী হয়েছে তার দেশান্তরী হওয়ার পিছনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তার কাজটি মূল্যায়িত হবে।"

অতএব যখনই আমরা কোন কাজ করবো, অবশ্যই তার পিছনের অভিপ্রায়টা নিজের কাছে পরিস্কার রাখতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। এই গুণটিই ইসলামিক পরিভাষায় ইখলাস, আন্তরিকতা বা একাগ্রতা। কাজ যেন শরীর এবং অভিপ্রায় যেন আত্মা। যদি আত্মা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে নিশ্চিতভাবে শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। নামাজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যে লোক আন্তরিক অভিপ্রায় নিয়ে সম্পন্ন করে না সে কখনো এর দ্বারা উপকৃত হয় না। তারা শুধু চরম পরিশ্রান্তই হয়। অন্যদিকে যদি কোন ব্যক্তির লক্ষ্য থাকে আল্লাহকে খুশী করার তবে তার সাধারণ এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজগুলোও সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হয়।

মানবজাতির মধ্যেও অনেক দিক দিয়ে অন্যান্য প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তাদের থেকে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যে আলাদা। তা হল, মানুষ নিজেকে অহং-এর স্বার্থপরতা এবং তার জৈবিক প্রবৃত্তিগুলো থেকে রক্ষা করেও কাজ করতে পারে। এমনকি সে তার হীন আকাঙ্খাসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণও অর্জন করতে পারে। আর এভাবেই আল্লাহ প্রদত্ত তার প্রকৃতির উৎকৃষ্টতা সে প্রকাশ করতে পারে। একবার মানবজাতি এই স্তরে পৌঁছাতে পারলে সব জৈবিক কাজগুলো যেমন ঘুমানো, খাওয়া, পান করা, বিয়ে করা, সন্তানাদির পিতা মাতা হওয়া- এই ধরনের আর সব কাজ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণভাবে সমর্পন করতে পারে। তখন সেগুলো মানবজাতির এমন কাজ হিসেবে বিবেচিত হয় যা ঐশ্বরিক বিচারালয়েও মূল্যবান বলে গণ্য করা হয়।

অতএব একজন বিশ্বাসীর উচিত তার মন থেকে সব স্বার্থপর অভিপ্রায়গুলো মুছে তার মনকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তৈরী করা। একাগ্রতার মাধ্যমে একজন পুরুষ বা নারী আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।

সব কাজের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা।

মহান আল্লাহ বলেন,

"বস্তুতঃপক্ষে আমিই পবিত্র কুরআন তোমাদের জন্য নাযিল করেছি এবং এটাই সত্য। অতএব আল্লাহর সেবা কর। তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত হও। আল্লাহ তা'আলার কি আন্তরিক আনুগত্য প্রাপ্য নয়?" (জুমার ৩৬:২৩)

"বল: বস্তুতঃপক্ষে, মহান আল্লাহ তা'আলাকে আন্তরিক আনুগত্যের সাথে উপাসনা করার আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে।" (যুমার, ৩৯:১১)

যখন শয়তান ঐশ্বরিক অস্তিত্ব থেকে নিক্ষিপ্ত হল তখন সে বলল, **"হে আমার প্রভু! যেহেতু আপনি আমার সাথে অবিচার করেছেন সে কারণে আমিও মানুষদের পৃথিবীতে ভুলপথে পরিচালিত করবো, আমি তাদের সবাইকে ভুল শিক্ষা দেবো। তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাদের ছাড়া।"** (হিজর, ১৫:৩৯-৪০) আয়াতটি পরিস্কারভাবে বর্ণিত হওয়ায়, শয়তান মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে একাগ্র তাদের প্রভাবিত করতে পারার কথা নয়। এছাড়া বাকী তথাকথিত বিশ্বাসীরা বিপদাপন্ন। এই বাস্তবতা নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, **"সরল পথ আমার জন্য। তোমার কোন কর্তৃত্বই চলবে না আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর। যারা বিপদগামী এবং তোমাকে অনুসরণ করে তাদের ছাড়া।"** (হিজর, ১৫:৪১-৪২)

হাদীস কুদসীতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, *"একাগ্রতা আমার একটি ঐশ্বরিক গোপনীয়তা এবং যাদেরকে আমি ভালবাসি তাদেরকেই শুধু তা প্রদান করেছি। না কোন ফেরেশতা এটা আবিস্কার করতে পেরেছে না লিপিবদ্ধ করতে পেরেছে। আবার না কোন শয়তান এটাকে বানচাল করার জন্য তা আবিস্কার করতে পেরেছে।"* (তাজ; ১, ৪৩)

এই হাদীসের মূল কথা হলো, যদি কারো হৃদয়ে আল্লাহর জন্য ভালবাসা থাকে তবে সেই মুমিনকে একাগ্রতা স্বয়ং আল্লাহ প্রদান করেন। উপরোক্ত হাদীসের বাক্যাংশ 'যে বান্দাকে আমি ভালবাসি'- এর অর্থ হল, একাগ্রতার পূর্বশর্ত হল ভালবাসা। মুমিনের অবশ্য কর্তব্য হলো, আল্লাহর প্রতি ভালবাসাকে তার হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্টিত করা। এর পরিণতিস্বরূপ ভালবাসাও একাগ্র হতে বাধ্য। যদি ভালবাসা একাগ্র বা আন্তরিক না হয় তবে তা আশেকের ধ্বংস ডেকে আনবে। হযরত নাখশাবির নিম্নলিখিত গল্পে যা বিবৃত হয়েছে,

একদিন একজন যুবক রাজার মেয়ের দরজায় কড়া নাড়ল এবং তাকে বলল, সে তাকে ভালবাসে। মেয়েটি তাকে হাজার দিরহাম দিল এবং তাকে বিরক্ত না করে চলে যেতে বলল। যুবকটি হাল ছেড়ে দিল এবং মেয়েটির কাছে আসা অব্যাহত রাখল। আবার মেয়েটি তাকে দুই হাজার দিরহাম দিল। এভাবে ছেলেটি দশ হাজার দিরহামে তার ভালবাসার দাবী ত্যাগ করল।

আসলে রাজকুমারীর সত্যিকার অভিপ্রায় ছিল ছেলেটির ভালবাসায় আন্তরিকতা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার ভালবাসা কিরকম যে তা টাকা দিয়ে কেনা যায়? তুমি কি জানো আমার থেকে বেশী কোন কিছুকে অগ্রাধিকার দিলে

কি শাস্তি হয়? তারপর সে সৈন্যদের আদেশ করল যুবকটিকে হত্যা করার জন্য। কেননা সে ভালবাসার ব্যাপারে আন্তরিক নয়।"

নাখশাবীর একজন অনুসারী গভীরভাবে আধ্যাত্মিক ছিলেন। এই গল্প শোনার পর তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি আশপাশের বন্ধুদের বললেন, "হে আমার বন্ধুগণ! এই পৃথিবীতে মিথ্যা ভালবাসার শাস্তি কেমন হয় সেটাই দেখ। যারা আল্ল-াহকে ভালবাসার দাবী করে এবং পরে দেখা যায় যে তুচ্ছ ব্যাপারগুলোকে তাঁর চাইতে বেশী অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তাদের শাস্তির কথা চিন্তা করো যায়!

এভাবে তিনি আমাদের একাগ্রতার অর্থবহতা সম্পর্কে একটা ভাল শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যারা একাগ্র বা আন্তরিক তারাই দূর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পাবে, **"এরা নিশ্চিত যে, তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ পাবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর মনোনীত বান্দাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নির্ধারিত করেন; তারা সম্মান এবং মর্যাদা উপভোগ করবে।"** (সাফ্ফাত, ৩৭ঃ৩৮-৪২)

"হে আমার বিশ্বাসীগণ! নিজের আত্মাকে পাহারা দাও। সঠিক দিক-নির্দেশনা অনুসরণ কর। তাহলে বিপথগামীদের দ্বারা কোন আঘাত তোমার দিকে আসবে না। প্রতিদানে তোমরা আল্লাহকে পাবে। আল্লাহই তোমাকে জানাবে কি করতে হবে।" (মাইদাহ, ৫ঃ১০৫)

যারা একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে মওলানা রুমী বলেন, "শুধু সিজদা করলে আর সালাম করলেই প্রভুর মহত্ব অনুধাবন করা যায় না। নিজের হৃদয় বা মস্তিস্ক দিয়ে নয়, সিজদা কর।" (শাতনাওয়ি, ১৪০৯)

রুমীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল, হৃদয়ে পূর্ণ একাগ্রতা নিয়ে আল্লাহকে সিজদা করা উচিত। প্রার্থনা বা নামাজের কোন মূল্যই থাকবে না যদি তা আধ্যাত্মিক অসুস্থ্যতা দ্বারা দূষিত হয়। যেমন, ভন্ডামী। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ ধরনের উপাসনাকে অভিযুক্ত করেছেন, **"ধিক, সেইসব প্রার্থনাকারীদের যারা তাদের প্রার্থনা অবহেলা ভরে করে।"** (মাউন, ১০৭ঃ৪-৫)

একাগ্রতা হল, কোন কাজের সময় আল্লাহর কোন শরীক না করা নিজের প্রার্থনায় একাগ্র হওয়া এবং আল্লাহর জন্য কিছু করার সময় বৈষয়িক কোন অভিপ্রায় নিজের মধ্যে না রাখা। অতএব, আমরা আপন আপন কাজগুলোকে আন্তরিক কাজ বলতে পারি। আন্তরিক কাজগুলো খারাপ অভিপ্রায় থেকে মুক্ত থাকে। কারণ দুধ রক্ত এবং মল থেকে বিশুদ্ধ থাকে। **"এবং বস্তুতঃপক্ষে গবাদিপশুর মধ্যেও তুমি নির্দেশনামূলক চিহ্ন দেখতে পাবে। তাদের শরীরে কি হচ্ছে তা থেকে। যেমন রক্ত এবং দেহ থেকে নিঃসৃত মল, ঘাম ইত্যাদি। আমরা তোমাদের পান করাবার জন্য তাদের সেগুলো থেকে খাঁটি দুধ এবং যারা পান করে তাদের জন্য আনন্দদায়ক খাবার উৎপন্ন করি।"** (নাহল, ১৬ঃ৬৬)

উপরিউক্ত আয়াতটি অনুধাবনের জন্য পবিত্র কুরআনের তাফসিরকারীরা বলেন যে, পার্থিব বিষয়মুক্ত অভিপ্রায়ের পবিত্রকরণ বা পরিশোধনই হল একাগ্রতা। ঠিক যেমন দুগ্ধ খাঁটি। এবং রক্ত, দেহ নিঃসৃত মল, ঘাম ইত্যাদি থেকে দুধ মুক্ত থাকে।

জুনায়েদ বাগদাদী রাহ. বর্ণনা করেছেন, "একাগ্রতা হল লৌকিকতার মিশ্রণ থেকে কাজের পরিশোধন বা পবিত্রকরণ। প্রকৃতপক্ষে তাসাউফের দর্শণে নিজেকে একাগ্র বলে দাবী করাটা ভাল আচরণের মধ্যে পড়ে না। আল্লাহর এক বন্ধু একবার বলেছিলেন, "নিজেকে একাগ্র বলে দাবী করাটাই অনান্তরিক একটা আচরণ।"

আল্লাহর আদেশে মূসা নবী তার গোত্র থেকে সত্তরজন ঈমানদারকে নির্বাচিত করেন। তিনি যখন তাঁর মনোনীত বিশ্বাসীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি আন্তরিক তখন নিজেদের সবচে' ধার্মিক এবং আন্তরিক মানুষ হিসাবে বিবেচনা করে তিনজন এগিয়ে আসল। এর উপর প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত আয়াতটি আল্লাহ নাযিল করেন, "হে মূসা! এই তিনজন লোকের অবস্থান আমার সৃষ্টিগুলোর মধ্যে সবচে' দূরবর্তী। কেননা, তারা নিজেদের ধার্মিক এবং একাগ্র বলে দাবী করেছে।"

একবার আন্তরিক কাজের সংজ্ঞা ঈসা আ. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আলাহর জন্য কাজ করা এবং পার্থিক কোন পুরস্কার আশা না করা।"

একাগ্রতা বা আন্তরিকতার সবচে' বড় শত্রু কী? আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ভান করে জাগতিক লাভ হাসিলের জন্য ভন্ডামী এবং আত্মজাহিরের মাধ্যমে কাজ করা ইখলাসের সবচে' বড় শত্রু। কারণ এবস্থায় যদি আল্লাহর জন্য কাজগুলো না করা হয় তবে তার পিছনে লুক্কায়িত থাকে আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করা। নিম্নলিখিত হাদীসটি ভন্ডামী এবং আত্মজাহির করার নেতিবাচক পরিণামের ব্যাখ্যার জন্য খুবি গুরুত্বপূর্ণ। সুলায়ামন ইবনু ইয়াসার কর্তৃক বর্ণনা করা হয়েছে, "আবু হুরায়রাকে ঘিরে অনেকে দাঁড়ানো ছিলো। নাতিল নামক একজন তাকে বলল, "হে শাইখ, এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর দূতের কাছ থেকে শোনা কোন হাদীস আমাদের বলেন।'

তিনি উত্তর দিলেন, হ্যা, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি,

"হাশরের দিনে প্রথমে শহীদদের পুনরুত্থান করা হবে। তাদের বিচারাসনে বসিয়ে আল্লাহ তাদেরকে প্রদত্ত তাঁর আশীর্বাদ সমূহের বিবরণ জানতে চাইবেন। তখন শহীদেরা সেগুলোর বর্ণনা দেবে এবং তারা দুনিয়াতে যে সেসব উপভোগ করেছে তা স্বীকার করবে। তারপর আলাহ বলবেন, 'প্রতিদানে তোমরা আমাকে কি দিয়েছ?' তারা বলবে, 'আমৃত্যু আমরা আপনার জন্য যুদ্ধ করেছি।' আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা আমাকে মিথ্যা বলছো। তোমরা যুদ্ধ করেছ যাতে করে তোমাদের সাহসী যোদ্ধা খেতাব দেয়া হয়। এবং সেই

খেতাব তোমরা পেয়েছ।' তারপর তাদের খেলাপ আদেশ দেয়া হবে। তাদের মুখ নিচের দিকে নামিয়ে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

তারপর বিচারালয়ে এমন একজনকে আনা হবে যে খুব জ্ঞানার্জন করেছে। তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিয়েছে। এবং কুরআন তেলাওয়াত করেছে। তাকে আনা হলে আল্লাহ তাকে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোর বিবরণ দিতে বলবেন। সে তা বলবে এবং তার জীবদ্দশায় সেগুলো উপভোগও করেছে বলে স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, 'প্রতিদানে তুমি কি দিয়েছ?' সে বলবে, 'আমি জ্ঞান অর্জন করেছি, তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছি।' আল্ল-াহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি জ্ঞানার্জন করেছ একারণে যে, যাতে তোমাকে সবাই পণ্ডিত বলে। তুমি কুরআন তেলাওয়াত করতে যাতে তোমাকে লোকে বলে, সে একজন ক্বারী এবং তা বলেওছে।' তারপর তার বিরুদ্ধে আদেশ দেয়া হবে। তার মুখ নিচু করা অবস্থায় তাকে টেনে-হিঁচড়ে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর ধনাট্য এক ব্যক্তিকে বিচারালয়ে আনা হবে। আল্লাহ তার কাছেও তাঁর প্রদত্ত আর্শীর্বাদ সমূহের বিবরণ জানতে চাইবেন। সে বিবরণ দেবে এবং জীবদ্দশায় সেগুলো উপভগে করেছে বলে স্বীকার করবে। আল্লাহ তখন বলবেন, *'প্রতিদানে তুমি আমাকে কি দিয়েছো?' সে বলবে, আপনার পছন্দনীয় যেসব পথে টাকা ব্যয় করা দরকার তাই করেছি।'* আল্লাহ বলবেন, *"তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এজন্য করেছ যাতে লোকে বলে, সে একজন দয়ালু লোক। এবং তাই তারা বলেছে।"* তারপর আল্লাহর আদেশে তাকে মুখ নিচু অবস্থায় টেনে নিয়ে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম)

ইসলাম ধর্মে কিছু কিছু কাজ খুব মূল্যবান এবং উচ্চ প্রশংসার দাবীদার। আল্লাহর প্রেরিত ধর্মের জন্য যুদ্ধ করা, ইসলামিক নিয়ম-নীতি শেখা এবং শেখানো, গরীবদের দান-খয়রাত করা- এই ধরনের কিছু কাজ। উপর্যুক্ত হাদীসটা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, একাগ্রতা বা আন্তরিকতা ছাড়া ঐশ্বরিক অস্তিত্বে কোন কাজই গ্রহণযোগ্য নয় এমনকি যদি সেগুলো বাহ্যিকভাবে মূল্যবান কাজ বলে মনেও হয়, তবুও।

বিশ্বাস শুধু একা কথা বা শব্দ নয়, বরং তা বিশ্বাসী আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। একজন বিশ্বাসী নারী অথবা পুরুষ আল্লাহর নির্দেশগুলো পুরো হৃদয় দিয়ে মান্য করে এবং নিষিদ্ধ জিনিষগুলো থেকে কোন রকম অনুযোগ ছাড়াই নিজেদের বিরত রাখে। তারা সবকিছুর উপরে আল্লাহ তা'আলাকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা আল্লাহর চাইতে জাগতিক লাভকে অগ্রাধিকার দেয়, তারা ভণ্ড। তারা ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের অন্যায় ঢাকতে এবং অন্য বিশ্বাসীদের সাথে প্রতারণার উদ্দেশ্যে। এ ধরণের লোকেরা মানুষের অহংকেই বন্দনা করে। এদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **"তোমরা কি তাকে দেখ নাই যে**

নিজেদের আত্মাভিমানী আকাঙ্খার জন্য আল্লাহকে ব্যবহার করে? এটা বুঝতে পেরে আল্লাহ তাকে বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করেন না। এবং তার কান ও হৃদয় অকেজো এবং তার দৃষ্টি শক্তির উপর পর্দা টেনে দিয়েছেন। আল্লাহ যদি তার পথপ্রদর্শক না হন তাহলে কে তাকে দিক-নির্দেশনা দেবে? তুমি কি এখনও সতর্কবাণীটা পাচ্ছ না?" (জাসিয়াহ, ৪৫:২৩)

এই আয়াতটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সেবা করে তখন আগে তার আত্মাভিমানী মোহগুলো নির্মূল করা প্রয়োজন।

আল্লাহর বন্ধুদের জন্য একাগ্রতার একটা গভীর অর্থ আছে। এর অর্থ, সব কিছুর উপরে আল্লাহকে অগ্রাধিকার দেয়া। একবার হযরত বায়েজিদ বোস্তামি কুরআনের এই আয়াতটি শুনতে পানঃ **"তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা এই জাগতিক পৃথিবীর জন্য লালায়িত এবং কিছু লোক পরকালের জন্য।"** (আল ইমরান, ৩:১৫২) তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "এই শব্দগুলো আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য আক্ষেপ। তিনি বলেন, কিছু মানুষ পরকাল এবং কিছু মানুষ ইহকালের পিছনে ছুঁটে, কিন্তু কোথায় সেই মানুষ যে আমাকে এবং আমাকে খুশী করাটাকে প্রথম অগ্রাধিকার দেবে?"

একাগ্রতা এবং ভাল অভিপ্রায়ের অভাব সম্পন্ন অনেক কাজ ও কম প্রার্থনা; আন্তরিকতার সাথে করা কাজের চাইতে খারাপ। প্রিয় নবী সা. বলেন, "তোমার কাজগুলো আন্তরিকতার সাথে কর। এভাবে করলে, এমনকি অল্প সংখ্যক কাজও যথেষ্ট।" তিনি আরও বলেন আল্লাহ তোমার শরীর বা ধন সম্পদ চান না। তিনি তোমার আন্তরিক সমর্পন এবং কাজ গ্রাহ্য করেন। নিম্নলিখিত কুরআনের আয়াতে আল্লাহ বলেন, **"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার কাজের গুণ পরীক্ষা করার জন্য মৃত্যু এবং জীবনকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনি তোমার পরীক্ষাও নিতে পারেন এবং দেখতে পারেন তোমাদের মধ্যে কার আচরণ শ্রেষ্ঠ এবং তোমাকে উপলব্ধি করতে পারেন যে, একমাত্র তিনিই সর্বশক্তিমান, সত্যিকারার্থে ক্ষমাশীল।"** (মুল্‌ক-৬৭:২)

ইলাহী কাজের সবচে' উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল একাগ্রতা বা আন্তরিকতার গুণটি। যা দ্বারা সেটি সম্পাদিত হয়। মানুষের আন্তরিকতা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর বিশেষ পন্থা রয়েছে। কখনো কখনো বিশ্বাসীদের তাদের বিশ্বাস এবং আদর্শের জন্য যন্ত্রনাভোগ এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। যদি তারা তারপরও লক্ষ্যচ্যুত না হয় এবং তাদের বিশ্বাস ধরে রাখতে পারে, তাহলে তারা আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিকতা এবং আনুগত্য প্রমাণ করতে পারে।

"মানুষ কি মনে করে যে তারা শুধু আমরা বিশ্বাস করি বললেই হবে এবং তাদের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না? আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করি। এবং আল্লাহ নিশ্চিতভাবে জানেন কারা খাঁটি এবং কারা অসৎ।" (আনকাবুত ২৯:১-৩)

মোটকথা আমাদের অবশ্যই একাগ্রতা বা আন্তরিকতার প্রকৃতিকে ভুল বোঝা উচিত নয়। বিশেষত ভান বা ভন্ডামী করে ফেলার ভীতির কারণে ভাল কাজ থেকে বিরত থাকা ঠিক নয়। কখনো কখনো শয়তান মানুষকে ভালকাজ না করার জন্য প্ররোচিত করে। কারণ সে আন্তরিক নয় এই ভাবিয়ে মূল কাজটি থেকেই বিরত রাখতে চায়। এভাবে সে মানুষকে ভাল কাজ করা থেকে দূরে রাখে। আমরা হয়তো মাঝে মাঝে আমাদের কাজে ভান এবং আন্তরিক না থাকার অনুভূতি অনুভব করি। এসব ভাল কাজ থেকে বিরত থাকার চাইতে আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ নিয়তকে সংশোধন করা। একাগ্রতার পথ খুব একটা সহজ পথ নয়। অনেক বাধা রয়েছে সে পথে।

তাই দরকার অহং-এর এবং এর হীন আকাংখাগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা। এভাবে আমরা আসতে আসতে একগ্রতার শীর্ষে পৌছাতে পারবো। আমাদের ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার এবং সেই জায়গায় পৌঁছাবার জন্য ঐশ্বরিক সাহায্যের প্রার্থনা এই দু'টিই প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জনে নিম্নলিখিত দিকগুলো অনুসরণ করা দরকার।

১. আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর নাম বার বার উচ্চারণ করে সবসময় আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুভব করার করা। যখন আমরা কোন কাজ করি, আমাদের অবশ্যই আল্লাহর নজরদারীর ব্যাপারে সজাগ থাকা উচিত। **২.** আমাদের অবশ্যই নবী মুহাম্মাদ সা.-এর সাথে এবং অন্যান্য সৎ মানুষদের সাথে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ রাখা উচিত। এই আধ্যাত্মিক যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হবে। সূফী পরিভাষায় যাকে 'ফায়েদ' বলে- তা অর্জন করা সম্ভব। **৩.** আমাদের অবশ্যই উচিৎ ইসলামিক হিতোপদেশ এবং ওয়াজে অংশগ্রহণ করা। এরকম মজলিশ থেকে আমরা ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের মিষ্ঠতা উপভোগ করার চেষ্টা করতে পারি। আমাদের অবশ্যই শেখা উচিত কিভাবে আমাদের ভাই এবং বোনদের জন্য আত্মবিসর্জন দেবো। **৪.** আমাদের পুরো মানবতার সেবা করা এবং আল্লাহর জন্য সব মানুষকে ভালবাসা উচিত। **৫.** আমাদের শুধুমাত্র তাই খাওয়া উচিত যা হালাল, ইসলাম সম্মত উপায়ে অর্জিত। যখন খাওয়া হারাম অবৈধ উপায়ে আসে তখন মন আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে না।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়ে ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা এবং আমাদের কাজেকর্মে আন্তরিকতার বাস্তবতাকে অর্জন করা। আজকাল আন্তরিক বা খাঁটি মানুষ খুব একটা দেখা যায় না। মানুষ অধিকাংশ সময়ই জাগতিক মোহের পিছনে ছোঁটে। এই মোহের জালে আটকা পড়ে তারা মানুষদের শুধুমাত্র বস্তু হিসেবেই দেখে। আল্লাহ যেন আমাদের তাঁর প্রতি সততা, আন্তরিক অনুভূতি অর্জনের পথে সাহায্য করেন, কেননা তিনিই সর্বশক্তিমান।

একই সাথে ভীতি এবং আশাবাদ

"আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মূর্খদের কাজের জন্য আপনি আমাদের ধ্বংশ করে দেবেন?" (আ'রাফ, ৭:১৫৫)

একজন ব্যক্তির জীবনের গতি প্রবাহ একই সাথে ভীতি এবং আশাবাদের মধ্যে দিয়ে। একজন ঈমানদারের পুরো জীবন এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে কাটানোটা প্রয়োজনীয়। ভীতির চূড়ান্ত পর্যায় হল হতাশা আর আশাবাদের চূড়ান্ত পর্যায় হল অতি আত্মবিশ্বাস এবং নিশ্চয়তা। এ কারণেই আল্লাহর ক্ষমাশীলতার নিশ্চিত হওয়া অথবা তাঁর বদান্যতার আশা পরিত্যাগ করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। খাঁটি মুমিন সেই যে এই দুই অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্য রেখে বলতে পারে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, **"যখন তারা আপন প্রভুর আহবান শুনতে চায় তখন তারা আশাবাদ এবং ভীতি নিয়ে ঘুম জলাঞ্জলি দিয়ে বিছানা পরিত্যাগ করে; এবং তারা ঐ রিজিক থেকে দান-খয়রাত করে যা আমরা তাদের প্রদান করেছি।"** (সাজ্দা, ৩২:১৬)

চূড়ান্ত হতাশা অথবা আল্লাহর দয়ার আশা পরিত্যাগ করার অর্থ তার করুণাকে অস্বীকার করা এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি হল আল্লাহর বদান্যতা, অসীম শক্তি এবং চমৎকারিত্বকে অস্বীকার করা। এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী হল আল্লাহর বদান্যতার উপর চূড়ান্ত বিশ্বাস। যার পরিণতি আল্লাহর দমনকারী রূপ এবং তাঁর আশীর্বাদের প্রতিদান দিতে অস্বীকার করা।

সংক্ষেপে, একজন ব্যক্তির অবশ্যই উচিত আল্লাহকে অতিরিক্ত ভয় করে হতাশার পর্যায়ে না পৌঁছানো। আবার তার বদান্যতায় বেশী আশাবাদী হয়ে তাঁর প্রতি কর্তব্যে অবহেলার পর্যায়েও না পৌঁছানো। অসাধারণ ঘটনাবলী, যেমন সম্প্রতি তুরস্কের সংঘটিত ভূমিকম্প (১৯৯৯ সালের ভূমিকম্পে হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছে)। এই সময়ে এই ধরনের ভারসাম্য রাখা কঠিন হয়ে যায়।

একজন মুমিন মনে মনে এমন একটা পর্যায়ে থাকে যে, যখনই তাকে বলা হয় 'শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে' তখনই সেই ব্যক্তি নিজেকে প্রশ্ন করে, 'সেই জন কি আমি?'। অথবা যখনই তাকে বলা হয় 'শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নরকে প্রবেশ করবে।' সে তখন বিস্মিত হয়ে ভাবে, 'আমিই কি সেই জন?'

সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষদের সাবধান করেন এবং তাদের শেখান মহাকাশ বা পৃথিবীর বিপর্যয়ের মাধ্যমে। যাতে করে তাদের হৃদয়ে ঐশ্বরিক সচেতনতা প্রোথিত করা যায় এবং তাদের নিজস্ব পার্থিব মোহ অনুসরণ করে জীবন কাটানো থেকে রক্ষা করা যায়। এটা বিশ্বাস করা বোকামী মাত্র যে, এই বিপর্যয়গুলো নিছক দুর্ঘটনা। অথবা এলোপাতাড়ি ঘটনামাত্র। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিণামে নি:স্ব এবং উদ্বাস্ত হওয়াটা উদ্দেশ্যহীন বা অর্থহীন নয়। যদি তাই হত তাহলে জীবন মৃত্যু এবং ঐশ্বরিক ঘটনা যৌক্তিক দিকগুলো বোঝা এবং সেগুলো আপাত: যুক্তি সঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করাটাও অসম্ভব হোতা। এই দুর্ঘটনাগুলো ঐশ্বরিক বিশালত্বের এবং স্রষ্টার অসীম শক্তির প্রকাশ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা রুমী বলেছেন,

"যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তা সীমাবদ্ধ এবং নশ্বর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্বাশ্বত এবং অসীম জগত আখেরাতের জগত। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা কর। তুমি যাতে তোমার হৃদয়কে এই নশ্বর পৃথিবীর মলিন ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি, পচনশীল আকার এবং লুপ্ত হয়ে যাওয়া ফ্যাশনের দ্বারা শ্বাশ্বত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন না কর। যদিও এই পৃথিবী তোমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমার চোখে বিশাল মনে হবে। চিন্তা কর যে, সেই ঐশ্বরিক শক্তির তুলনায় এই নশ্বর পৃথিবী সামান্য কিছুও নয়। সাবধান এবং চারিদিকে তাকিয়ে দেখো। কিভাবে ভূমিকম্প, সাইক্লোন অথবা বন্যা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে দেয়।"

আমরা পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছি যে, কিভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে কিছুদিন পর পর ভূমিকম্প এবং বন্যা হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। আমাদের নবীজি গণমৃত্যুকে কেয়ামতের আলামত বলে উল্লেখ করেছেন। এই সব ঘটনাপ্রবাহ থেকে অসংখ্য শিক্ষা আমরা পাই। সুতরাং এই দুর্ঘটনার (১৯৯৯ সালের তুরস্কে সংঘটিত ভুমিকম্পে হাজার হজার লোক নিহত) পেছনে পুরোপুরি বাহ্যিক কারণ আরোপ না করে অধিবিদ্যাগত প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করাটা জরুরী। ইসলামিক মানদণ্ডে বিচার করার পরিবর্তে বস্তুগত দর্শন দ্বারা এইসব দুর্ঘটনাকে বিচার করে ভুল করাটা উচিত হবে না। আমাদের এই সব প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাগুলোর পেছনে ঐশ্বরিক ইচ্ছা পাঠ করার চেষ্টা করা উচিত।

বিশ্বজগত আনুবিক্ষণিক থেকে বিশ্ব নিখিল এবং শ্বাস্বত জগৎ ছাড়িয়ে ঐশ্বরিক শৃংখলায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাজানো। মহাকাশে সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের গতি থেকে শুরু করে পরমানুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো এবং রহস্যময় অদৃশ্য রশ্মিসমূহ- সবকিছুর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে আমাদের উপলব্ধি এবং করুণার বাইরে। সবকিছুই ইলাহী কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। এমনকি একজন অবিশ্বাসী কাফেরও কল্পনা করতে পারে না যে, সুর্যের গতি কখন দ্রুত হয় বা কখন ধীর হয়। অথবা পৃথিবীর একটি দিনের স্থায়িত্ব চব্বিশ ঘন্টার বেশী না কম। তাদের হৃদয় গোপনে এই ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তির চূড়ান্ত ক্ষমতাকে স্বীকার এবং চিহ্নত

করে নেয়। তাদের ইন্দ্রিগ্রাহ্য আকাঙ্খার মোহে পড়ে তারা এই ইলাহী শৃঙ্খলার মৌলিক নিয়মকে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' হিসেবে ব্যাখ্যা কর। অথচ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করার এই নিয়ম এবং সূত্রগুলো হল ইলাহী নিয়মনীতি এবং অনুশীলন।

এই পৃথিবী হল কার্যকারণের পৃথিবী। সব কারণের নিমিত্ত আল্লাহ। তিনি সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট কারণে যুথবদ্ধ করেছেন। যদি ইলাহী ইচ্ছা নিজেকে কোন কারণ ছাড়া প্রকাশ করে তাহলে কেউই এই প্রকাশের আধ্যাত্মিক ভার সহ্য করতে পারবে না। যদি এই কার্যকারণিক সূত্রটি শ্রদ্ধার্ঘ্য না হত তবে মানবজাতির কাজগুলো পরীক্ষা করার কোন যৌক্তিকতাও থাকতো না। অতএব ইলাহী জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কার্যকারণের স্রষ্টার উপর নির্ভর করে এবং শুধুমাত্র কারণেই থেমে থাকে না। যাদের এই ঐশ্বরিক অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা নেই; তারা সাধারণ কারণের পিছনে ঘুরে বেড়ায়। ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে ভূ-গঠনিক স্খলনকে দায়ী করার মত নির্ভেজাল বস্তু জাগতিক ব্যাখ্যার দরজায় অলসভাবে কড়া নাড়তে থাকে।

অবিশ্বাসী কাফের এবং অবিবেচকদের ঐশ্বরিক শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলা 'প্রাকৃতিক' ঘটনাগুলোকে বস্তুগত এবং নৈতিক যন্ত্রনায় রূপান্তরিক করেছেন। প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন আগুন, পানি এবং বাতাসকে বিধ্বংসী শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। প্রকৃতিতে সংঘটিত ঘটনাগুলোর ভিত্তি হিসেবে ইলাহী ইচ্ছাকে না ভাবতে পারা অনেকটা আধ্যাত্মিক অজ্ঞানতা হিসেবে ধরা যায়। মওলানা রুমী সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন,

"ভুলে যেও না, এই পৃথিবীর ইলাহী মুক্তির তুলনায় একখন্ড শুকনো খড়-কুটো মাত্র। ইলাহী ইচ্ছাশক্তি কখনো এটাকে উন্নীত করে আবার কখনো অন্যদের কাছে নিচে নামিয়ে দেয়া। হয় এটাকে শক্তিশালী করেন কিংবা এটাকে ভেঙ্গে দেন। কখনো যুক্তি বা কখনো আবেগের মূখাপেক্ষী করে তোলে। এটা কখনো একটি গোলাপের বাগান আবার কখনো বা একটি ঝোঁপ নির্দেশ করে।"

আল্লাহ এই পৃথিবীকে একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর রাজকীয় ক্ষমতার পাশাপাশি তাঁর সৌন্দর্যকে পরস্পর পরিপূরক হিসেবে দেখান। আন্তরিক প্রার্থনা, দান খয়রাত এবং সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর দয়া এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু নিষিদ্ধ কাজের চর্চা এবং অন্যকে শোষণ করলে আল্লাহর ক্রোধের প্রকাশ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই কারণগুলো ছাড়াও মানুষের ধৈর্য্য এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পনের পরীক্ষার জন্যও এগুলো ঘটানো হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কুরআনে উল্লেখ আছে, **"নিশ্চিত থাকো, আমরা ভয় এবং ক্ষুধা, জান এবং মালের ক্ষতি এবং তোমাদের কঠোর পরিশ্রমের ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা**

করবো, কিন্তু তাদের জন্য আনন্দদায়ক বার্তা আছে যারা ধৈর্য্য ধরে, তা সহ্য করতে পারে।" (বাকারা, ২: ১৫৫)।

যুগে যুগে নবীরা তাদের নি:স্কলুষতা সত্ত্বেও কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন এবং বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। নবী আইয়ুব আ.-এর পরীক্ষা ছিল বেশ কঠিন। আল্লাহ এই নবীকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। প্রথমে তাঁর সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে; তাঁর ভেড়াগুলোকে বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর শস্য শক্তিশালী বাতাস দ্বারা নষ্ট করেছেন। তারপর তাঁর সন্তানদের ভূমিকম্পে নিহত করেছেন। এসব পরীক্ষার পর আল্লাহ আইয়ুবব আ.-কে একটা কঠিন অসুখে ফেললেন। কিন্তু তবু তিনি শান্ত এবং স্থির চিত্তে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখলেন। তিনি অসুখের ব্যাপারে কোন অনুযোগ করলেনই না বরং নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করলেন।

তাঁর অসীম ধৈর্য্য এবং সমর্পনের ফলস্বরূপ আল্লাহ তাঁর সব অসুখ এবং বিড়ম্বনাগুলো দূর করে দিলেন এবং তাঁর পরিবারকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এবং এমন একটা সুন্দর জীবন দিলেন যা আগের চাইতে উত্তম।

এই উদাহরণ এটাই নির্দেশ করে যে, কিছু কিছু বিপর্যয়ে নিষ্পাপ শিশুরা মারা যেতে পারে। নিবেদিত মানুষ মারা যেতে পারে। কিন্তু এই বিপর্যয়গুলোর মধ্যে দিয়ে তাদের পাপগুলো তিনি ক্ষমা করে দেন। এই সূত্রে নবী মুহাম্মাদ সা. বলেছিলেন, *"যখন আল্লাহ তাঁর দৃষ্টি গ্রাহ্যতার মধ্যে কোন বান্দার জন্য তার কাজ অনুযায়ী একটা পদমর্যাদা স্থির করেন এবং যদি সেই বান্দা নিজস্ব কাজ দ্বারা সেই পদ মর্যাদায় পৌছাতে না পারে তখন আল্লাহ তার জন্য কিছু পরীক্ষা দেন এবং তাকে দু:খ-কষ্টে পতিত করেন। তারপর তিনি তাঁর বান্দাকে ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা দেন যাতে করে সে ঐ পদমর্যাদা অর্জন করতে পারে। "আল্লাহর মতে তাঁর স্থিরকৃত পদ মর্যাদা, একজন বান্দা শুধুমাত্র প্রার্থনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে না। যতক্ষণ না সে এই অবস্থানে পৌঁছাতে পারে। আল্লাহ তার বান্দাকে এমন কিছু পাঠান (দুর্যোগ এবং সমস্যা) যা তার আকাঙ্খার বাইরে থাকে।"* (মুসনাদু আবু ইয়ালা, সহী ইবনে হিব্বান)

সিনাই পাহাড়ে যাওয়ার পথে মূসা আ.-এর একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হল। লোকটি মূসা নবীকে বলল, "হে কালিমুল্লাহ (যে আলাহর সাথে কথা-বার্তা বলে)! আমার একটা অনুরোধ আছে। দয়া করে সিনাই পাহাড়ে গিয়ে আমার জন্য দোয়া করবেন।"

মূসা আ. জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ইচ্ছে কী আমাকে বল। যাতে করে আমি তা আল্লাহর কাছে তোমার জন্য চাইতে পারি।"

"হে আল্লাহর বার্তাবাহক! এটা আল্লাহর এবং আমার মধ্যেকার গোপন একটা ব্যাপার।"

তারপর মূসা আ. সিনাই পর্বতে পৌঁছালেন। তিনি আল্লাহর সাথে কথা বললেন, এবং সেই লোকের আর্জি পূরণ করার জন্য মিনতি করলেন। আল্লাহ তখন বললেন, আমি তার প্রার্থনার জবাব ইতিমধ্যেই দিয়ে ফেলেছি। ফেরার পথে মূসা আ. একথা তাকে জানাবার জন্য যে জায়গায় সেই লোকের সাথে দেখা হয়েছিল সেখানে থামলেন। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন বন্য জন্তুরা তাকে মেরে ফেলেছে। এতে তিনি কিছুটা সংশয়পন্ন হলেন এবং বললেন,

"হে আল্লাহ! এটা কি ধরনের গোপনীয়তা? তাহলে কিভাবে আপনি তার অনুরোধ গ্রহণ করেছেন?"

আল্লাহ তাকে বললেন, "হে মূসা! এই বান্দা আমার কাছে একটি আধ্যাত্মিক পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য প্রার্থনা করেছিল। যে পর্যায়ে সে তার নিজের প্রচেষ্টা এবং কাজ দ্বারা পৌঁছাতে পারেনি। সে কারণে আমি তাকে এই শাস্তি দিয়েছি। এভাবেই আমি তাকে উন্নীত করেছি সেই পদমর্যাদায় যা সে আমার কাছে প্রার্থনা করেছিল।"

একবার মুহাম্মাদ সা. বলেছিলেন, *"যখনই আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে বিপদগ্রস্ত করেন তার অর্থ হয় তিনি তার পাপ মার্জনা করার জন্য বা তাকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তা করেছেন।"* (মুসনাদু আহমাদ)

সুতরাং আল্লাহর বিশাল শক্তির প্রকাশকে একটা হতাশার বোধের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। ঠিক তেমনি আল্লাহর দয়াকে নিজের ভালত্বের কারণে চরম আত্মবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যাওয়াও ঠিক নয়।

ইলাহী প্রাকৃতিক নিয়ম এবং বিপর্যয়গুলো যেমন- ভূমিকম্প, আগুন, যুদ্ধ, পেগ, খরা এবং অন্যদিকে আল্লাহর করুণা এবং আশীর্বাদসমূহ সংঘটিত হয় বান্দার আধ্যাত্মিক স্তর অনুযায়ী। যদি অধিকাংশ বান্দা সঠিক পথে থাকে তবে বৃষ্টি করুণাধারা এবং একটি আশীর্বাদ হয়ে আসে। এবং সেই পথ ধরে সুখ সমৃদ্ধি আসে। বেশীর ভাগ সম্প্রদায়ই তাদের জাগতিক আকাঙ্খাগুলোর ব্যাপারে মোহাচ্ছন্ন থাকে। তখন বন্যা, খরা বা ভূমিকম্প অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই দুঃখজনক বিপর্যয়গুলো মানুষ দ্বারা সংঘটিত পাপ কাজ বা আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণে ঘটে থাকে। অন্যকথায়, দুর্নীতিগ্রস্ত মনের কারণেই আধ্যাত্মিক কম্পন সংঘটিত হয় বলে প্রাকৃতিক বিপর্যগুলো ঘটে থাকে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, **"বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহ কখনোই মানুষদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না যদি তারা তাদের প্রকৃতির নেতিবাচক দিকগুলোর উপর নিয়ন্ত্রন না আনতে পারে।"** (রা'দ, ১৩:১১)

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো শোষক নন। এটা সত্য যে, এই বিপর্যয়গুলো মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং অন্যকে শোষণের কারণেই ঘটে থাকে। এটা অবশ্যম্ভাবী যে, যারা ঐশ্বরিক বিধান এবং পবিত্র নিয়মনীতিগুলোকে বিরোধিতা করে তাদের কারণেই এই আসমানী প্রতিশোধগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। আল্লাহ কুরআনে বিবৃত করেছেন যে, **"... তার অজ্ঞাতসারে গাছের একটি পাতাও মাটিতে পড়ে না। আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটি শস্যকণাও পৃথিবীর অন্ধকারে অথবা গভীরে না আছে কোন শুকনো বা তাজা (বিবর্ণ বা সবুজ) কিছু এবং তাই কুরআনে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ আছে।"** (আন'আম, ৬:৫৯)

এটা আপাতঃ যুক্তিগ্রাহ্যভাবেও গ্রহণযোগ্য নয় যে, পুরো দেশ নিজে নিজে কেঁপে উঠছে। অথচ বাস্তবতা হল, গাছের একটি পাতাও আল্লাহর হুকুম ছাড়া মাটিতে পড়ে না।

এটা যেমন অস্বীকার করা যায় না যে, বিপর্যয় ঘটতে পারে কাজের নড়বড়ে ভিত স্থাপনের জন্য অথবা উদ্ধার কাজ অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে। ঠিক একইভাবে এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষের আধ্যাত্মিক স্তর এবং তাদের কাজসমূহ ভাল বা মন্দ ভূমিকম্প রহিত করে। মুদ্রার শুধু এক দিক দেখাটা ঠিক নয়। দূর্ভাগ্যবশত এই বিপর্যয় কিছু কিছু মানুষ আল্লাহকে দোষ দেয় যা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। অথচ তারা বিপর্যয়ের সময় তাদের ভুলগুলোর জন্য মোটেও অনুশোচনা বোধ করে না। এই ধরনের মানুষ সম্পর্কে রুমী বলেছেন, "তাদের জন্য দুঃখবোধ হয় যারা তাদের সমস্যার প্রতিকার হিসেবে এই সব ঐশ্বরিক সতর্কবাণীগুলো থেকে লাভবান না হয়ে এই সমস্যাগুলোকে তাদের নিমেষের জন্য বিষতুল্য ভাবে। আর এই কারণেই আল্লাহর ক্রোধ তাদের দৃষ্টির অজ্ঞানতাকে বাড়াতে থাকে। তারা দেখতে পায় না যে, জাহান্নাম তাদের ধ্বংস করার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের জন্য দুর্দশাই প্রাপ্য।"

ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য বিপর্যয়গুলো থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অবশ্যই তৈরী এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া উচিত। তারপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পর মানুষদের আল্লাহর কাছে নিজেদের সমর্পন করা উচিত। একবার ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে এমন একটি দেয়ালের পাশ দিয়ে দ্রুত যাচ্ছিলেন হযরত উমর রা. তখন তাঁর বন্ধুরা বলেছিল, "হে মুসলমানদের সেনাধ্যক্ষ! আপনি কি কৌশলে তাই এড়াতে চাচ্ছেন যা আল্লাহ আদেশ করেছেন?" উমর প্রত্যুত্তরে বললেন, "আমি শুধু আল্লাহর নির্দিষ্ট একটি নিয়তি থেকে আল্লাহ প্রদত্ত অন্য একটা নিয়তিতে আশ্রয় নিয়েছি।"

বস্তুবাদী মানুষেরা এ ধরনের বাস্তব পদক্ষেপগুলোর শক্তি নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করে। তারা ভাবে যে, যদি ভবনসমূহ যথেষ্ট দৃঢ় হত ভূমিকম্পে হয়তো এত মানুষ নিহত হত না। কিন্তু ব্যাপারটা যখন ইলাহী ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল তখন সত্যিকারের কারণ চিহ্নিত করতে না পারলে সব ধরণের সাবধানতা ব্যর্থ হবে এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছাই যেকোন মূল্যে নিজকে

এভাবে প্রকাশ করবে। উদাহরণস্বরূপ পরিমাপ করে বলা হল রিখটার স্কেলে ৭.৪ মাত্রার না হয়ে ১১.৪ মাত্রার ভূ-কম্পন হবে। হসিলি কোবেতে সংঘটিত ভূমিকম্প এর একটি ভাল উদাহরণ। মানুষের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী তাদের বাড়ীঘর ভূমিকম্প সহ্য করতে পারে এমন শক্ত ভাবে নির্মাণ করা হল। তথাপি দূর্ভাগ্য বশতঃ ভূমিকম্পের সময় গ্যাস পাইপ ফেটে গেল এবং অকস্মাৎ আগুনের উদ্‌গীরন শুরু হল। দেখা গেল, সেই আগুনে ছয় হাজার মানুষ মারা গেছে। মাত্র বিশ সেকেন্ডের ভূমিকম্পে সব মানুষের বিশাল সম্পদ ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। যে সম্পদ সঞ্চয় করতে বছরের পর বছর লেগে গেছে।

যেহেতু আমরা আল্লাহর ভৃত্য, আমরা ভবিষ্যৎ বিপর্যয়গুলোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে বাধিত হবো। কিন্তু এটাও জেনে রাখা দরকার যে, এ ধরণের পদক্ষেপগুলো আমাদের নিয়তির বিপক্ষের নিবস্বতা নয়। পদক্ষেপগুলো তখনই ইতিবাচক ফল দেয় যখন সেগুলো ইলাহী নিয়তির সমান্তরাল থাকে। এর বিপরীতধর্মী আচরণ সেই ধরনের আচরণ যা সামুদ গোত্র ও আদ গোত্রের মানুষদের প্রতি করেছে।

'আদ' সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ, আল্লাহর ক্রোধ নয় বরং অন্য কিছু। এই অসতর্ক মূল্যায়ন সাসুদ সম্প্রদায় করেছিল। এর পেছনের কারণ সামুদ সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তারা বলেছিল, "আদ গোত্র ধ্বংসের কারণ, তারা শক্ত ইমারত নির্মাণ করার পরিবর্তে নরম মাটির উপরে তাদের ঘরবাড়ী নির্মাণ করেছে। আমরা আমাদের বাড়ীগুলো শক্ত পাথরের উপর তৈরী করেছি। অতএব আমরা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবো না।" প্রকৃতপক্ষেই, উঁচু জায়গায় পাথর কেটে কেটে তারা মজবুত ইমারত তৈরী করেছিল।

এতদসত্বেও সামুদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ তারা বিপথগামী হয়ে পড়েছিল। মাটির নীচে থেকে উত্থিত ভয়ংকর শব্দে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ নিম্নলিখিত আয়াতে তা বর্ননা করেছেন এভাবে, **"শক্তিশালী ঝড় বিপথগামীদের উপর চড়াও হয় এবং সকাল হওয়ার আগেই তারা তাদের বাড়ীতে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। যেন তারা কখনো জীবিত ছিল না, কখনো সমৃদ্ধি লাভ করেনি। মনে রেখ! সামুদরা তাদের প্রভু এবং প্রতি পালককে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সামুদদের থেকে দূরে থাকো"** (হুদ, ১১:৬৭-৮৮)

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মজবুত ইমারত গড়লেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এই যুক্তি যথেষ্ট নয়। যে সমস্ত আচরণ যেমন- কুটতর্ক, অকৃতজ্ঞতা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং পাপ আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে তোলে সেগুলোই আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের শাস্ড়ি দিতে প্ররোচিত করে। জলে এবং স্থলে যখন নৈতিক শৃঙ্খলা লংঘিত হয় তখনই একের পর এক বিপর্যয় দেখা দেয়। এই বাস্তবতা কুরআনে বর্নিত হয়েছে, **"জলে এবং স্থলে**

অনিষ্ট দেখা দেয় মানুষের যথেচ্ছার কারণে। আল্লাহ তাদের কাজের জন্য পরীক্ষা নেন, যাতে করে তারা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে।" (রূম, ৩০:৪১)

পূর্বোল্লিখিত আয়াতে যে শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা আংশিক। এর নিহিতার্থ হল, প্রধান শাস্তি অপেক্ষা করছে পরকালে। আরও বলা হয়েছে, এই শাস্তি একটা সাবধানবাণী মাত্র। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত আগের চাইতে বেশী করে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। কেননা আল্লাহ বলেন, **"যতক্ষণ তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সঙ্গে থাকবে তিনি তাদের জন্য শাস্তি পাঠাবেন না। এমনকি তারা ক্ষমা ভিক্ষা করলেও তিনি আর তাদের শাস্তি দিবেন না।"** (আনফাল ৮:৩৩)

ক্ষমা চাওয়া ছাড়াও দুই রাকাত নামাজ পড়ে আমরা আল্লাহর করুণা ভিক্ষা এবং দয়ার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। যেমন আল্লাহ বলেছেন, **"হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য্য, অধ্যাবসায় এবং নামাজের মাধ্যমে তোমরা আমার সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ তাদের সঙ্গেই থাকেন যারা ধৈর্য্যশীল এবং অধ্যবসায়ী।"** (বাকারা, ২:১৫)

একবার নবীজি সা. বলেছিলেন, "যদি বিপর্যয়ের শিকার কোন মানুষকে কেউ সাহায্য এবং সান্তনা দেয় তবে আল্লাহ তাকে তারও দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন।" আমাদের মনে রাখা উচিত তাদের পরিবর্তে আমরাও ঐ অবস্থার শিকার হতে পারতাম এবং তারা আমাদের অবস্থায়ও থাকতে পারতো। সুতরাং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমরা তাদের জন্য পরহিতকর হতে পারি। আমরা নিঃস্ব, আহত এবং দুঃখী মানুষদের যারা দূর্গত এলাকায় বাস করছে তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। এবং যত দ্রুত সম্ভব তাদের ব্যথা বেদনা প্রশমিত করতে পারি।

আমাদের ভাল কাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সুযোগ নেয়া উচিত। যেমন রুমী বলেছেন, "এ ধরনের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি কর। আল্লাহর কাছে কাঁদো এবং তাঁর প্রশংসা কর। তোমরা বেশী করে ভাল কাজ কর।"

এক অর্থে আমরা এমন একটা জীবন যাপন করি যা আমাদের পরিয়ে দেয়া হয় উপহার হিসেবে। একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ের পর পরই হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। আমরা সৌভাগ্যবান মানুষ যারা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে নতুন জীবন লাভ করি। এবং সেই আমরা তখন ভাল কাজ করার জন্য আরও অতিরিক্ত সময় দিতে পারি। সে কারণে এই যুক্তি দেখানো আর খাটে না যে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও যাতে করে আমরা আপনার উপাসনায় নিজেদের জীবন নিবেদিত করতে পারি।" এ ধরনের ভয়ংকর ঘটনা আমাদের বোধোদয় ঘটায়। এই সুযোগের সুবিধা নিয়ে আমাদের উচিত মৃত্যুর কথা না ভুলে গিয়ে নিজেদের জীবনকে পুনর্গঠিত করা এবং এই চেতনা নিয়ে বলা,

"মৃত্যু তোমার কাছে আসার আগেই মৃত্যুকে স্মরণ কর।" আমাদের মনকে ধৈর্য্য, সমর্পন, অধ্যবসায় এবং প্রার্থনা দিয়ে প্রশিক্ষিত করা উচিত। যাতে করে আমরা আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করে নির্মল প্রশান্তি অনুভব করার স্তরে পৌঁছাতে পারি।

নিম্নলিখিত কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে, সিনাই পর্বত যখন ভূমিকম্পে নড়বড় করে উঠেছিল। তখন মুসা (আঃ) আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন, যা আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ন শিক্ষা।

"এবং মূসা সত্তরজনকে মনোনীত করনে। যখন তারা ভয়ানক কম্পন দ্বারা আক্রান্ত হলো তখন তিনি প্রার্থনা করলেন, **"হে আমার রব! যদি এই কম্পন আপনার ইচ্ছার হয়ে থাকে, আপনি তো অনেক আগেই ধ্বংস করতে পারতেন। আমাকে এবং তাদেরকে। আপনি কি আমাদের মধ্যে থাকা বোকাদের জন্য আমাদের ধ্বংস করতে চান? এটা আপনার পরীক্ষা ছাড়া আর কী! এর দ্বারা আপনি কাউকে কাউকে বিপদগামী এবং সঠিক পথ দেখাবেন। আপনি আমাদের রক্ষাকারী। অতএব আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমরা আপনার করুণাপ্রার্থী। কেননা যারা ক্ষমা করতে জানে তাদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ।"** (আ'রাফ, ৭"১৫৫)

অতএব আমরা দেখেছি যে, নবীরাও পরীক্ষার বাইরে থাকনে না। তাদের সমর্পণ, প্রশংসা, ভীতি এবং আল্লাহর ভালবাসা পাবার আশায় তাদের মনকে ভয়ানক সব বিপর্যয় দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। অবশেষে তারা একই সাথে ভীতি এবং আশাবাদের একটা পর্যায় রক্ষা করে চলেছেন এবং আল্লাহর অনুমোদনপ্রাপ্ত কিছু নির্বাচিত মানুষের নেতা হয়ে গিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর অনুশাসন এবং নিরাপদ ও আপদকালীন সময়ে ভীতি এবং আশাবাদের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলা উচিত।

হে আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহগকে বিপর্যয়, নিদারুণ যন্ত্রনা এবং আপনার ক্রোধ থেকে রক্ষা করুন। আমাদের সেই সব সৌভাগ্যবান মানুষের সারিতে জায়গা করে দেন, যারা আপনার ক্ষোভের ভয় এবং আপনার করুণার আশাবাদের পর্যায়ে ধৈর্য্যধারণ করে আপনার ঐশ্বরিক আনুকল্য অর্জন করেছেন। নির্মল প্রশান্তি এবং প্রসন্নতা আমাদের হৃদয়ে এনে দেন। নিদারুন যন্ত্রণা এবং সমস্যার এই অন্ধকার সময়কে আশীর্বাদপুষ্ট এবং একটি সুখী সকালে রূপান্তরিত করুন।

আমীন!

অজ্ঞানতা

একদিন এক লোক পায়ে হেঁটে বিশাল মরুভূমি অতিক্রম করছিল। সহসাই একটি হিংস্র জন্তু তার সামনে উপস্থিত হল। সে প্রাণের ভয়ে দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু তার মনে হল যত জোরেই সে দৌড় দিক না কেন বন্য জন্তুটি তাকে ঠিক ধরে ফেলবে। আর কিছু চিন্তা না করে সে একটা কুয়োর ভিতর ঝাঁপ দিল। কুয়োর গভীরে পড়তে পড়তে সে কুয়োর দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা গাছের ডাল প্রাণ ভয়ে আঁকড়ে ধরল। কুয়ার তলদেশে অনেকগুলো সাপ কিলবিল করছে তাকে গিলে ফেলার জন্য। তারপর সে সাদা এবং কালো রঙের দুইটা ঈদুর দেখতে পেল। তারা গাছের গোড়া কামড়ে কামড়ে শিকড় কেটে ফেলছে। ভয়ের চোটে তার জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল। ঠিক পরের মুহূর্তেই কুয়োর দেয়ালে একটি মৌচাকও দেখতে পেল। তা দেখতে পেয়ে সে মনে মনে ভাবল, "চাকের মধুই খাওয়া যাক, আমি হয়তো এমন সুস্বাদু, খাদ্য খাওয়ার আর সুযোগ পাবো না।"

বিপদাপন্ন লোকটি মধুতেই ডুবে গেল। ভুলে গেল তার করুণ অবস্থার কথা। সে যেন অনেকটা উট পাখীর মত যে বালিতে মুখ লুকিয়ে ভাবে যে সে নিজেকে লুকাতে পেরেছে। মধুর স্বাদে তার চোখ দুটি বুজে এল। কুয়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করার চাইতে সে মধুই বেশী উপভোগ করতে লাগল। অথচ ইতোমধ্যেই ইদুঁরগুলো ডালের গোড়াটা কেটে ফেলেছে। বেচারা কুয়োর তলদেশে নিপতিত এবং সাপদের খাদ্য হল।

এই গল্পে বিপর্যয় এবং পার্থিব জীবনের প্রতিনিধিত্ব করছে বন্য জন্তুটি। সাপগুলো তার অশুভ বৈশিষ্টের প্রতীক। মধু জাগতিক লালসার আর সাদা কালো ইদুর দুটি কেটে যাওয়া দিন এবং রাতের প্রতীক। এবং বেচারা লোকটি আমদের মত লোকদের প্রতিনিধি। গাছের ডালটি একজনের পরিসমাপ্তি। পুরো গল্পটাই নীতিগর্ভ এক রূপকথা যা এই পৃথিবীর মানুষের অবস্থাকেই বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দিয়ে। কিন্তু সে রক্ত-মাংসের অস্থায়ী আবেগ বা তাড়নার শিকার হয়ে তার দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে যায়। এটা সেই ধরণের মানুষদের প্রতীকী একটি গল্প।

মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে মুক্ত হওয়া এবং সময়কে উৎকৃষ্ট উপায়ে ব্যবহার করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের সত্যিকারের মুক্তি। এ কারণেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে ও আত্মোপলব্ধি করার জন্য সময় দেয়া হয়েছে।

নিজেদের সত্যিকার প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন যাপন করলেই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী সুখ কি তা উপলব্ধি করতে পারবে। মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট সব প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তারা নিজেদের সত্যিকারের প্রকৃতি উপলব্ধি এবং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের জীবন সাজিয়েই শুধুমাত্র সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। যে জীবন আল্লাহ্ থেকে দূরে, যে নিজেকে না জানে এবং নিজের সত্তাকে না বোঝে, সে জীবন দুর্দশাগ্রস্ত একটি জীবন।

কোন ব্যক্তি এরকম জীবন-যাপন করলে তাকে অজ্ঞ বলা হয়। অন্যকথায় মূর্খ বা গাপিল বলা যেতে পারে। নিজের প্রকৃতি তার অবস্থান এবং তার জীবন ও মৃত্যুর প্রজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে অসচেতন থাকাটা একজন মানুষের মতি বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন কোন বুদ্ধিমান মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল যে সত্যিকার প্রজ্ঞার অধিকারী অথচ অদৃশ্য একটি জগৎ ফেলে এই প্রথিবীতে আসার রহস্য এবং পরীক্ষ শেষ হওয়ার পর দুনিয়া থেকে বিদায়ের কারণ জানতে উৎসুক নয়।

মানবতা জীবন এবং মৃত্যুর সত্যিকার অর্থ বুঝতে হলে তা অজ্ঞানতা পরিহার করেই অর্জন সম্ভব। আরো বলা যায়, গভীর যুক্তিবোধ এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত হৃদয়ের মাধ্যমে এসব বুঝা সম্ভব। মানুষের সাধারণ প্রবণতা হল- অবহেলা, লালসা, ঔদ্ধ্যতা, উচ্চাকাঙ্খা, হিংসা, সীমালংঘন বা অপচয় এবং ক্রোধের মত এমন বিষয়গুলোর মাধ্যমে অজ্ঞতার বিধ্বংসীমূলক বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। এই ধরণের প্রবণতায় আসক্ত হয়ে সেগুলোর ঘূর্ণাবর্তে ডুবে যাওয়াটা সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্টতা। এই বিভ্রমের কারণেই এবং মানুষের অহংবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্যই তারা পাপ করে। সেই পাপ বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। তারা একজন মানুষের সম্মানকে বিনষ্ট করে। মননকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে এবং স্রষ্টাকে অগ্রাহ্য করে। এ ধরণের মানুষদের উদ্দেশ্যে কুরআনে বলা হয়েছে, **“ধিক তাদেরকে, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করে না!”** (জুমার, ৩৯:২২)

প্রকৃতপক্ষে কোন হৃদয়ে নৈতিকতাবোধ দূর্বল হয়ে পড়লে আধ্যাত্মিক গভীরতা এবং সত্যিকারের উপলদ্ধিও দ্রুত দূর্বল হয়ে পড়ে। এ ধরণের লোক ‘ইসতিকামাহ’ বা চারিত্রিক ঋজুতাও হারিয়ে ফেলে। সে পাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তার নিজস্ব ক্রুটিগুলোও তখন সে চিহ্নিত করতে পারে না।

অহংকারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজও মানুষ কি ক্ষতি করছে সে ব্যাপারা লক্ষ্যই করতে পারে না। কেননা তখন তারা বাস্তবতা নির্ণয়ে অন্ধ এবং বধির হয়ে যায়। যখন কারো হাতের আঙ্গুল আহত হয় সেটা নিয়ে সে খেতে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। অথচ তার সাথে একই টেবিলে বসা অন্যান্যরা তার আহত আঙ্গুল দেখে বিরক্ত বোধ করে। একইভাবে আজও লোকেরা কি ক্ষতি অন্যদের করছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকে না। একজন সৈনিক

যেমন তার ধাতব বর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে ঠিক তেমনি একজন অজ্ঞ মানুষের সব ইন্দ্রীয় অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সে বাস্তবতা সম্পর্কে এবং সকল ঐশ্বরিক ব্যাপারে বধির থাকে। এ ধরণের লোকদের আল্লাহ বলেছেন, **"বোবা, বধির এবং অন্ধ..."** (বাকারা, ২:১৮)

মওলানা রূমী একটা মজার গল্প বলেছেন একজন বধির অজ্ঞ লোকের এবং একজন অসুস্থ লোক সম্পর্কে, অজ্ঞ লোকটি তার প্রতিবেশী অসুস্থ লোকটিকে দেখতে যায়। কিন্তু নিয়ত ভাল ছিল না। লোক দেখানো ভান ছিল সেটা। অসুস্থ লোকটিও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ভুগছিল। সেও তার প্রতিবেশীর একটি ভুলের জন্য তাকে কোন রকম সন্দেহাবাদ না রেখে অভিযুক্ত করেছিল। গল্প এরকম,

"একদিন বধির লোকটির একজন বিচক্ষণ বন্ধু তাকে বলল, "তোমার প্রতিবেশী অসুস্থ্য। তুমি কি তা জান?"

একথা শুনে বধির এবং অজ্ঞ লোকটি মনে মনে হিসাব কষতে লাগল কিভাবে তার প্রতিবেশীর সাথে দেখা করবে। প্রথমে সে ভাবল, "যদি আমি সেই প্রতিবেশীর সাথে দেখা করি, তাহলে আমি আমার বধির কান নিয়ে কিভাবে তার কথা বুঝতে পারবো?"

তারপর সে ভাবল, "অসুস্থ লোকেরা কথাও বলে বেশ আস্তে। তাহলে তো আমি তার একটি কথাও বুঝতে পারবো না।"

যাইহোক, তবু সে অসুস্থ লোকটিকে দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে আবারো মনে করল, "প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে তাকে দেখতে না গিয়ে উপায় নেই। অন্যথায় সবাই আমাকে অভিযুক্ত করবে প্রতিবেশী অসুস্ততায় তার সাথে সাক্ষাৎ না করার জন্য। আর একারণে সবাই আমাকে অসম্মানও করবে।"

তারপর মনে মনে সে একটা পরিকল্পনা করল, তার সাথে সাক্ষাৎকালে আমি তার ঠোঁটের নড়াচড়া দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবো সে কি বলছে। আমি তাকে বুঝতে দেবো না যে আমি কানে শুনতে পাই না। সে তার শারিরীক অসুস্থ্যতার কারণেই বুঝতে পারবে না যে, আমি বধির।"

প্রথমে আমি বলব,"কেমন আছেন?"

হয়তো সে উত্তর দেবে, "ভাল আছি।"

তারপর আমি বলবো, "সকল প্রশংসা আল্লাহর।"

তারপর আমি জিজ্ঞেস করবো, "আজ আপনি কি খেয়েছেন?"

সে সম্ভবত বলবে, "আমি স্যুপ ও ফলের রস খেয়েছি।"

তারপর আমি বলবো, "আশা করি ওগুলো আপনি উপভোগ করেছেন।" তারপর জিজ্ঞেস করবো: "কোন ডাক্তার আপনার চিকিৎসা করছেন?'

সে হয়তো বলবে: "অমুক ... অমুক'

তারপর হয়তো আমি তার নৈতিক মনোবল চাঙ্গা করার জন্য ভাল ভাল কথা বলবো, "আপনি খুব সৌভাগ্যবান। খুব ভাল করেছেন ঐ ডাক্তারকে ডেকে। উনি থাকলে আর কোন চিন্তা নেই।"

অতঃপর বেচারা বধির পরিকল্পিত পুরো সংলাপটি প্রশ্ন এবং উত্তর আকারে মনে মনে সাজিয়ে প্রতিবেশীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। পথমে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সে জিজ্ঞেস করলল, "কেমন আছেন?'

খুব ব্যথায় কাতর প্রতিবেশীটি গোঙাতে গোঙাতে বলল, "আমার অবস্থা খুব খারাপ। মনে হচ্ছে আমি মারা যাবো।" কিন্তু উত্তরটা বধির লোকটি শুনতে পেল না; না বুঝেই সে সাথে সাথে বলে উঠল: 'পরম করুণাময়ের হাজার শুকরিয়া!" অসুস্থ্য লোকটি এই উত্তর শুনে খুব আহত হল এবং খুব বিরক্তও হল। সে প্রতিবেশীর মনোভঙ্গীটা ঠিক বুঝতে পারল না। সে মনে মনে ভাবল: "আমার প্রতিবেশী আমার মৃত্যু চায়!"

বধির লোকটি তার দ্বিতীয় প্রশ্নটি অসতর্কভাবেই করল, "আপনি কি খেয়েছেন আজ?"

বিরক্ত প্রতিবেশী রাগে উত্তর দিল, "বিষ!"

তখন বধির লোকটি বলল: "আশা করি আপনি তা উপভোগ করেছেন!"

অসুস্থ্য লোকটি আরো রেগে গেল। আসলে সে খুব ধৈর্য্যশীল মানুষ ছিল না। তারপর বধির লোকটি আবার বলল, "কোন ডাক্তারকে দেখাবেন বলে ঠিক করেছেন?" অসুস্থ্য লোকটি ভীষণ রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠল: "কাকে দিয়ে চিকিৎসা করাবো বলে আপনি মনে করেন? নিশ্চয়ই মৃত্যুর ফেরেশতাকে দিয়ে? কিন্তু স্বভাবত:ই বধির লোকটি তার প্রতিবেশীর কথা শুনতে পেল না এবং তার মনোভাব বোঝার পরিবর্তে সে উত্তর দিল: "আপনি খুবই সৌভাগ্যবান। এই ডাক্তার যার চিকিৎসাই করেন সেই সুস্থ হয়ে ওঠে। আপনার খুশী হওয়া উচিত, যদি তিনি আসেন।"

কর্তব্যটা শেষ হওয়ায় বেশ সন্তুষ্টি নিয়ে বধির প্রতিবেশীর বাসা ত্যাগ করল। সে বাসা থেকে চলে যেতে যেতে মনে মনে ভাবল, "আমার ভাগ্য ভাল যে, আমি প্রতিবেশীর সাথে দেখা করতে পেরেছি। আমার সম্পর্কে সবার ধারণাকে ও আমার সুনামকে সুরক্ষিত করতে পেরেছি। একই সাথে সেই দূর্ভাগ্যকে কিছুক্ষণের জন্য সুখী করতে পেরেছি।"

যদিও এই গর্দভ লোকটির সাক্ষাৎটি ক্ষতিকারক ছিল তথাপি সে ভুলক্রমে ভাবল যে, এটা খুব লাভজনক হয়েছে। অসুস্থ লোকটি তার প্রতিবেশী সম্পর্কে কর্কশ সব শব্দ উচ্চারঃণ করতে লাগল, "এখন আমি বুঝেছি, আমাদের তথাকথিত প্রতিবেশী আসলে আমাদের প্রকৃত শত্রু! কি দূর্ভাগ্য যে আমি তা আগে জানতে পারিনি!" প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিতে দিতে সে বলল, "মানুষ অসুস্থ মানষকে আল্লাহর ওয়াস্তেই তাকে সমবেদনা জানাতে দেখতে আসে। অথচ এই লোকটি আল্লাহর ওয়াস্তে নয় বরং মানুষকে তার নিজের সম্পর্কে ভাল ধারণা দেবার জন্যই এসেছিল। আমার ভাল-মন্দ খোঁজ নেবার জন্য তো নয়ই, যেন আমার প্রতিপক্ষ হয়ে আমাকে আক্রমণাত্মক কথা বলে একজন অসুস্থ মানুষের থেকে প্রতিশোধ নিতে এসেছিল। তার শত্রুকে এমন দরিদ্র এবং দুর্বল অবস্থায় দেখে সে যেন তার মন্দ হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতেই চেয়েছে। কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয় হল, সুস্থ অবস্থায় আমি কখনো তাকে কোন রকম আঘাতই করিনি।"

মওলানা রূমী এভাবে গল্পটির ব্যাখ্যা করেছেন,

"বধির লোকটি কাউকে খুশী করার অভিপ্রায়ে তাকে আঘাত করেছে। কল্পিত শব্দাবলী দিয়ে তার প্রতিবেশীর হৃদয়ে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার প্রতিবেশী অসুস্থ বন্ধুকে লৌকিকতার আশ্রয় নিয়ে সাক্ষাত করার কারণে সে এমন একটা পাপ কাজ করেছে। কারণ তার কথাবার্তায় তাদের প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে অসুস্থ লোকটি তার ক্রোধের কারণে ধৈর্য্য না দেখাতে পারার জন্য পরাজিত হয়েছে। এরকম আচরণের জন্য সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সে বধির প্রতিবেশীর নিয়তটা বোঝার চেষ্টা করেনি। পক্ষান্তরে বধির লোকটিও তার প্রতি কোন সদিচ্ছা প্রদর্শন করেনি।"

এই রকম পরিস্থিতির শিকার হয় বহু লোক। তারা প্রার্থনা করে কিন্তু আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় না। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী আচরণ করে। আল্লাহর উপাসনা করে তারা শুধু স্বর্গই লাভ করতে চায়। কেননা সেই উপাসনা অহংকার মিশ্রিত থাকে। তাদের উপাসনা দ্বারা শুধু তাদের পাপকেই ঢাকতে চায় এবং অন্যকে আল-লাহর সাথে শরীক করে। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করা একটা গুরুতর পাপ। তাদের প্রার্থনা ভণ্ডামীতে পূর্ণ থাকে; যদিও বাইরে থেকে খাঁটি মনে হয়। আর এই ভণ্ডামীতে হৃদয়ে ময়লা জমে যায়। এই পর্যায়ে এই ময়লা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করার দিকে নিয়ে যায়।

এক ফোঁটা নোংরা পানি যেমন পুরো পানির মিষ্টি স্বাদকে নষ্ট করে ফেলে ঠিক তেমনি একজন অসুস্থ, অজ্ঞ হৃদয়ের প্রার্থনার ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।"

অসুস্থ প্রতিবেশীর আচরণ সম্পর্কে বধির লোকটির ব্যাখ্যা এবং তার অজ্ঞ উপলব্ধি থেকে নিসৃত কথা-বার্তা আমাদের আজকালকার মানুষের বধিরত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজকালকার বধিরদের আচরণ মাদ্রাসাগুলো এবং কুরআন শিক্ষা বন্ধ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এছাড়া আপাতঃ যুক্তিগ্রাহ্য অন্য কোন কারণ নেই। ইদানীংকালে বিভিন্ন দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারীভাবে বন্ধ ঘোষণা এবং নতুন বিধিমালার কারণে কুরআন শিক্ষা করা খুবি কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। অজ্ঞ প্রশাসকের আচরণ, যারা এই নতুন বিধিমালার বিপক্ষে প্রতিবাদ করেছিল তাদের প্রতিবাদগুলো অগ্রাহ্য করার বধিরতা অজ্ঞানতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যারা অসচেতনভাবে এই পৃথিবীর সুবিধাদি দ্বারা লাভবান হয় তারা আসলে সাময়িক সুখী হবার চেষ্টা করে। তারা এই পৃথিবীটাকেই জান্নাত মনে করে। কিন্তু এটা চরম একটা সত্যি কথা যে, যারা এই ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্যকে লুটে-পুটে খায় তাদের পরকালে এর জন্য কঠোর মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

পার্থিব বিষয়াবলী এবং এর অফুরন্ত উদারতার প্রতি মানব প্রকৃতির অন্ধ লোভ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে রূমী নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন, "যখন তুমি এই পৃথিবীর সুস্বাদু সব খাবার খাও এবং পান কর তা যেন অনেকটা স্বপ্নের ঘোরে খাওয়া এবং পান করার মত মনে হয়। যখন এ ঘুম ভাঙ্গবে তুমি আবার ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হবে তখন তোমার এই বোধ আসবে। স্বপ্নে যে খাবার তুমি আত্মসাৎ করেছ তা কোন কাজে আসবে না। পৃথিবীটা আসলে অলীক বা মায়া। পৃথিবী এবং এর আনুকুল্য অনেকটা যেন স্বপ্নে কোন কিছু চাওয়ার মত। স্বপ্নেই তা মঞ্জুর হওয়ার মত। যখন তার ঘুম ভাঙ্গে, স্বপ্নে পাওয়া কোন আনুকুল্যের চিহ্নই তখন আর থাকে না। এই পৃথিবী অনেকটা স্বপ্নে পাওয়া আনন্দ লাভের মত।"

আল্লাহ কুরআনে বিবৃত করেছেন, **"তোমরা কি দেখতে পাওনি এ ধরণের মানুষ তার নিজস্ব অসার আকাঙ্খাকেই ঈশ্বর বলে মান্য করে?"** (জাসিয়া, ৪৫:২৩)

একবার ইউনুস আ. জিবরাইল আ.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি কি এমন কোন মানুষের কথা আমাকে বলতে পারেন যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর প্রার্থনা করে?"

জিবরাইল আ. তাঁকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত একজন লোককে দেখালেন। সে তার হাত-পা এবং চোখ দুটো এই রোগে হারিয়েছে। লোকটি বলছে, "হে আল্লাহ! এই হাত এবং পা দুটির মাধ্যমে যা পাওয়া গেছে সেটা আপনি ছাড়া আর কেউ দেয় নি। যা যা থেকে রক্ষা পেয়েছি তা আপনিই করেছেন। হে আমার রব! আপনি শুধু একটি আকাঙ্খাই আমার মনে রেখে দিয়েছেন। সেটি ছিলো, আপনার কাছে পৌঁছানো।"

একবার আল্লাহর জন্য হৃৎস্পন্দন হলে নিয়ত এবং আচরণ আগের চাইতে পাল্টে যায়। সুতরাং অজ্ঞানতা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের হৃদয়কে পবিত্র করা এবং অহংকারকে

নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার। আমাদের হৃদয় উজার করে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং এই বিশ্ব জগতের প্রজ্ঞা এবং মাধুর্য্যের প্রকাশ কে লক্ষ্য করা উচিত। অন্যথায় আমরা অজ্ঞানতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবো না। আমাদের অবশ্যই আমাদের স্রষ্টা এবং নিজেদের সত্যিকার প্রকৃতি সম্পর্কে যতখানি সম্ভব সচেতন হতে হবে। কুরআন এবং সুন্নাহর দিকে মন ফেরাতে হবে। এতেকরে হৃদয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি এবং প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হবে।

মানুষের উচিত তাদের স্রষ্টার সাথে ঘনিষ্টতা অর্জন করা। আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকা। কারণ তিনি তাদের জীবনকালে সবরকমের দয়া দেখিয়েছেন। তাদের পাপ মার্জনা করেছেন। সব গোপন কথা তার সামনে হাজির। নামাজ এবং প্রার্থনা অল্প সময়ের মধ্যে সীমিত। কিন্তু বিশ্বাস এবং সেবা জীবনভর করা যায়।

আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর বন্ধুদের কাতারে আসন দেন। যারা সঠিক পথে চলছেন এবং যদের হৃদয় সত্যের আলোয় পরিপূর্ণ তাঁদের মধ্যে আমাদেরও শামিল করেন।

আমীন!

মৃত্যুর প্রর্থনা

মৃত্যুকে মহিমান্বিত তখনই করা যায় যখন একজন ব্যক্তি মানসিক পরিপক্কতার এমন একটা স্তরে পৌঁছায় যে, তখন সে তার অহংকারের সব নেতিবাচক এবং অনাকাঙ্খিত দিকগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। যা একজন সাধারণ মানুষকে একজন পূর্ণাঙ্গ বা খাঁটি মানুষে উন্নীত করে। যেমন ঐশ্বরিক বিধানে আছে "মৃত্যু হওয়ার আগেই মৃত্যুকে মেনে নাও।"

এই স্তরে পৌঁছালে একজন ব্যক্তি স্রষ্টার খুব কাছে চলে আসে এবং সমস্ত ইন্দ্রয়াসক্ত আকাঙ্খার তাড়নায় পথ হারিয়ে ফেলে। এ ধরণের ব্যক্তি প্রার্থনাকালীন সুখ উপভোগ করে। মানুষের প্রতি দয়াশীল থাকে এবং তার ব্যবহার মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তখন সেই ব্যক্তির আত্মা তার প্রভুর কাছাকাছি আসতে পারার আনন্দকেও উপভোগ করতে পারে। এ কারণেই মওলানা রূমী, আল্লাহর সাথে গনিষ্ঠ হওয়ার আগের সময়কে বলেছেন, "আমি মানসিকভাবে অপরিপক্ক ছিলাম"। যখন তিনি আল্লাহ প্রদত্ত আনন্দ লাভ করলেন তখন তার ভাষ্য ছিল, আমি পরিপক্ক হলাম এবং যখন বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের রহস্যগুলো বইয়ের পাতার মতো একে একে তার কাছে উন্মোচিত হলো। সে সময়টাকে তিনি বলেছেন, "আমি প্রজ্বলিত হয়েছিলাম।"

এই অভিব্যক্তিগুলো আল্লাহর পথে চলার প্রচেষ্টার একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যদিও সেই পথ যা আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে সেগুলো সংখ্যায় সব প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার সংখ্যা যত ততটা। এর মধ্যে সবচে' কার্যকরী পথ হচ্ছে, অহংকারেরর অপসারণ এবং স্বর্গীয় প্রেমের ফলস্বরূপ সমস্ত হৃদয় এবং আত্মা দিয়ে স্বীকার করা যে, 'সবার উপরে আল্লাহ'।

আর এরই পথ ধরে আসে মৃত্যুকে মেনে নেয়ার পর্যায়। মৃত্যু হলো আল্লাহর সাথে শ্বাস্বত মিলন। যেমন উপরের আয়াতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহতেই বিলন সাধন। এই সিদ্ধিলাভ অর্জন করা একমাত্র সম্ভব যদি একজন ব্যক্তি নিম্নলিখিত শর্তগুলো পালন করে, যা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

ক. তওবাহ (ক্ষমা প্রার্থনা)

অজ্ঞতা, যৌন আকাঙ্খা, ঔদ্ধত্য, ক্রোধ, ঘৃণা, অন্ধ উচ্চাকাঙ্খা, হিংসা এবং অপচয় মানুষের এই সব নেতিবাচক ঝোঁক তাকে পাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে। এই সব

প্রবণাতা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে বাধা দেয়। যদি মানুষ নিজের আত্মবিশ্লেষণ করতো তাহলে পাপের এই বিশাল ভার তার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতো। তার হৃদয়ে মূল্যবোধের অনুভূতি জাগ্রত হত এবং অনুতাপ ও দুঃখের অশ্রু বিসর্জন দিয়ে সে আল্লাহর মধ্যেই শান্তি খুঁজত। এই অনুতাপ এবং দুঃখই হল, তওবাহ। যার আক্ষরিক অর্থ হল, অনৈচ্ছিক মৃত্যু আসার আগেই স্বেচ্ছায় মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা। অন্যকথায় তওবাহ অর্থ হল, পরিতাপের অনুভূতি নিয়ে আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যেকার বাধা দূর করা।

আল্লাহর কাছে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল তওবাহ। কেননা পাপ হল এক ধরণের প্রতিবন্ধকতা যা হৃদয়ের সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে। এই পর্যায়টা অনেকটা একটি মলিন আয়নায় মেঘাচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবির মত। এই মলিন আয়নায় নিজের প্রতিফলন দেখতে হলে একটি পরিচ্ছন্ন কাপড় দিয়ে তা পরিস্কার করা দরকার। ঠিক একইভাবে পুনরায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য তওবাহ করার মাধ্যমে পাপ ধুয়ে যায়। কেননা পাপ হৃদয়ের ময়লা আচ্ছাদন। যা সত্যকে উপলব্ধি করতে দেয় না। সে কারণে আল্লাহকে কাছে পাওয়ার জন্য যে সমস্ত পথ আছে তার মধ্যে প্রথম এবং অন্যতম হল আল্লাহর কাছে ক্ষমা বা ইসতিগফার করা। এটা অনেকটা একত্ববাদের ঘোষণার "লা" এর মত একটি নিগূঢ় স্তবক। কালেমায়ে তওহীদে আছে "লা ইলাহা ইলাল্লাহ"। যার অর্থ, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই।" অন্যকথায় প্রথম যা দরকার তা হল সমস্ত নেতিবাচক প্রবণতার অপসারণ এবং সত্যিকারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটা উপযোগী ভিত্তি তৈরী করা।

অতএব প্রার্থনায় একাগ্রতা আনার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা একটি প্রথম শর্ত। রুমী বলেন, "ভেজা মাটিতে যেমন ফুল ফোঁটে তেমনি অনুতপ্ত হৃদয় এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা মঞ্জুর হয়।"

খ) যুদ (দুনিয়া বিমুখতা)

জাগতিক বিলাসিতা, ভোগ, সম্পত্তি এবং পদমর্যাদার মুঠো থেকে হৃদয়কে মুক্ত রাখার অর্থই হল 'যুদ'। আসলে মৃত্যু মুহূর্তের মধ্যেই এসব কিছু মুছে দেয়। 'যুদ'-এর সারকথা হল, অনৈচ্ছিক মৃত্যু আসার আগেই স্বেচ্ছায় জীবন এবং সম্পদের মায়া ত্যাগ করা। জন্ম এবং মৃত্যুর মত দুইটি গুরুত্বই বাস্তবতার মধ্যে মানুষ অলীক পৃথিবী থেকে পালাতে পারে না। আবার বাস্তবতার জগতেও সে পৌঁছাতে পারে না যদি না ইহকাল এবং পরকাল সম্পর্কে সত্যিকারের উপলব্ধি তার মনে না আসে। আর এটা সম্ভব নিজের আচরণ অনুযায়ী পরিবর্তিত করে। একজন প্রজ্ঞাবান এই পৃথিবীকে আল্লাহর গোপন রহস্য জানার পাঠশালা

মনে করেন। অন্যদিকে একজন মূর্খ দুনিয়াটাকে শুধু খাওয়া এবং প্রগাঢ় আবেগের সীমার মধ্যে রাখতে পারে। তবে ফলাফল হতাশা, যার পরিণাম ধ্বংস।

গ) তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর আস্থা)

তাওয়াক্কুল এর অর্থ হচ্ছে, মৃত্যু আসার আগেই একজন বান্দা মহান প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পন করবে। আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ এবং তাতে পূর্ণ বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, সে কার্যকারণ জানার চেষ্টা করবে না। বরং এর অর্থ হলো, অবশ্যই তাকে উপলব্ধি করা জরুরী যে, যদি কার্যকারণ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কায়িত না হয় তবে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কার্য কারণ এবং ভাগ্যের মধ্যেকার সে বিষয়টি বুঝার জন্য মৃত্যুই হল সত্যিকার উপলব্ধি। আল্লাহ বলেন, **"যদি কেউ আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা বা বিশ্বাস রাখতে পারে তাই-ই আল্লাহর জন্য যথেষ্ট পাওয়া।"** (তালাক, ৬৫ঃ৩)

অন্যকথায় তাওয়াক্কুলের মানে হল, আল্লাহর জন্য হৃদয়ে পরিপূর্ণ প্রেম লালন করা। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর কাছে পূর্ণ সমর্পন হওয়া। আল্লাহ মূসা নবীর লাঠি সম্পর্কে বলেছেন, "ওটা ছুঁড়ে ফেলে দাও।" কেননা এই ছড়ির কারণে তার আত্মবিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা আল্লাহর উপর সত্যিকারের বিশ্বাস আনার পক্ষে বাঁধা হতে পারতো। আবার আল্লাহ বলেন, **"আল্লার উপর বিশ্বাস রাখো যদি তোমাদের ঈমান থাকে।"** (মাইদাহ, ৫ঃ২৩)

সাবধানতা এবং প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যে অজ্ঞতা তা 'তাওয়াক্কুল' নয়; পক্ষান্তরে এই ধরণের পদক্ষেপগুলো নেয়ার পরই শুধু আল্লাহর শক্তির কাছে সমর্পন সম্ভব হয়।

ইব্রাহিম আ.-এর তাওয়াক্কুলের ফলাফল হল, আগুন ও তাকে পোড়াতে পারেনি। যখন তিনি সত্যিকারের তাওয়াক্কুলের শক্তি দেখালেন তখন আলাহ আগুনকে নির্দেশ দিলেন, "প্রশমিত হও এবং তাকে নিরাপদে রাখো।" রুমী সাধারণ তাওয়াক্কুল এবং সমর্পনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলেন, "ইব্রাহিম আ.-এর গুণাবলী তোমার মধ্যে আছে নাকি নিজের মধ্যে খুঁজে দেখ। আগুনে তারা পুড়বে না যারা ইব্রাহিম আ.-এর মত যথাযথভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করতে পারবে।"

ঘ) কানা'আত (পরিতৃপ্তি)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আকাঙ্খা না থাটাই কানা'আত। মৃত্যুই বাধ্যতামূলক পরিতৃপ্তি নিয়ে আসে। হিংসা এবং অন্ধ উচ্চাকাঙ্খা চরিত্রের সবচে' বিপদজনক প্রবণতা। যা দূর

করার একমাত্র ঔষধ হল পরিতৃপ্তির মানসিকতা অর্জন করা। আর স্বর্গীয় রত্নভাণ্ডারই হৃদয়ে এমন পরিতৃপ্তি এনে দেয় যার কোন শেষ নেই। একটি হাদীসে নবীজির এই বাণীটি উল্লেখ করা হয়েছে, "পরিতৃপ্তি এমন একটি রত্ন ভাণ্ডার যা কখনো নিঃশেষিত হয় না।"

সুতরাং যে ব্যক্তি তার জন্য আল্লাহ যতটুকু বরাদ্দ করেছেন ততটুকু নিয়েই পরিতৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট থাকবে সেই সত্যিকার ধনী বলে বিবেচিত হবে। কানাআত আরেকটি অর্থ হল, অন্য যদি বেশী পায় তা নিয়ে হিংসাবোধ না করা। সমৃদ্ধ হৃদয় হওয়ার আনন্দকে উপভোগ করতে হলে তাকে পরিতৃপ্তির পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হতে হবে।

ইলাহী বণ্টন দ্বারা রিজিক পূর্ব নির্ধারিত হয় এটাই বিশ্বাসের সূত্র। এই সূত্রটি বিবেচনায় রাখলে স্বভাবতই অন্ধ উচ্চাকাঙ্খা এবং লোভ-লালসা শুধু যে কুৎসি তাই নয়, অযৌক্তিকই মনে হবে। তথাপি কিছু কিছু মানুষ ধনী হওয়ার অন্ধ উচ্চাকাঙ্খা ছাড়তে পারে না; যদিও তারা জানে যে, যারা মুনাফা করে এবং যারা ভোক্তা তারা সাধারণত আলাদা আলাদা মানুষ। এ ধরনের মুনাফালোভীরা চরম অহংকারে আক্রান্ত। তাদের কাছে, ধন-সম্পদ মানে তাদের নিজেদের এবং একই সাথে অন্যদের ক্ষমতায়ন। বেশীর ভাগ সময় তারা হিংসুক মানুষদের কাছ থেকে যে মুগ্ধতা এবং মনোযোগ পায় তাতে তারা খুব খুশী হয়।

পরিতৃপ্তি একমাত্র ঐশ্বরিক ঔষধ যা এই সব অসুস্থ্যতা সারিয়ে তুলতে পারে। বিশাল সম্পদের অধিকারীরা যেসব বিপর্যয়ের শিকার হয় তা থেকে রক্ষা পাওয়ার একটাই সম্ভাব্য উপায় রয়েছে যে, তাকে পরিতৃপ্তির শক্তি অর্জন করতে হবে। পরিতৃপ্তি শুধু ধন সম্পদের সাথে সম্পর্কায়িত নয়; ধন সম্পদের থেকে পাওয়া মুক্তির কারণে উদ্ভূত মনোযোগ এবং মুগ্ধতাও একধরণের পরিতৃপ্তি।

একজন ব্যক্তির এটা উপলব্ধি করা জরুরী যে, ধন সম্পদের মালিক আল্লাহ। মানুষ এর রক্ষক মাত্র। খলিফা আলী রা. এমন লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "বেশীর ভাগ মানুষই ধন সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। এতে করে তাদের উত্তরাধিকারীরা সেই সম্পদের ভাগ নিয়ে মারামারি করে।"

ঙ) বিচ্ছিন্নতা বা নির্জনতা

তাসাউফ চর্চায় আধ্যাত্মিকতার সবচে' উচ্চ স্তরে পৌঁছানোর জন্য নির্জনতা প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে নির্জনতা মানে সব সামাজিক উঠাবসা বাদ দেয়া নয়। সাধারণ মানুষের জন্য ভীড়ের মধ্যে থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারার মাধ্যমেই নির্জনতা অর্জন করা সম্ভব। অর্থাৎ জাগতিক বিষয়াবলী থেকে নিজের মনকে বিচ্ছিন্নতা করা, যা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে।

তথাপি কিছু কিছু লোক সত্যিকারার্থেই বিচ্ছিন্নতা পূর্ণভাবে চর্চা করে থাকেন। তারা সংখ্যায় অল্প হওয়ায় সামাজিক জীবনে কোন বিঘ্ন ঘটেনা। সাধারণ অর্থে, ধর্মীয় চর্চায় নির্জনতা মানে হল, সামাজিক জীবন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করা নয়; মানুষের মধ্যে থেকেও নিজেকে আল্লাহর জন্য বিচ্ছিন্ন করতে পারাই হল প্রকৃত নির্জনতা। অন্যকথায়, জনাকীর্ণতার মধ্যেও একা হয়ে আল্লাহর সাথে থাকা। জাগতিক বিষয়গুলোকে পেছনে ফেলে কবরের মধ্যে শায়িত হওয়ার আগে ঐশ্বরিক বহিঃপ্রকাশের মধ্যে আল্লাহর সাথে থাকা। স্বেচ্ছায় আল্লাহর সাথে বাস করা; অন্যদিকে মৃত্যু হল নিজের ইচ্ছাধীন নয় এমন একটি বিচ্ছিন্নতা।

চ) জিকির

মাহাব্বতই হলো, ইলাহী ভাবোচ্ছাস বহিঃপ্রকাশের ভিত্তি। হৃদয় এবং মস্তিস্ক দ্বারা যত বেশি জিকির করা যাবে ততবেশী মাহাব্বত অর্জন করা সম্ভব। শুধুমাত্র প্রেমাস্পদকে স্মরণ করার মাধ্যমেই হৃদয় এবং মস্তিস্কে প্রেমের শিকড় গভীরে প্রোথিত হয়। যত বেশি করে আমরা আল্লাহকে ডাকবো তত বেশি তাঁকে আমরা ভালবাসতে পারবো।

ইলাহী ভাবোচ্ছাস অর্জনের উৎস হিসেবে আল্লাহর নাম, আল্লাহর সবগুলো গুণবাচক নামের মধ্যে আল্লাহ সবচে' কার্যকরী শক্তি বহন করে। এর শক্তি এত বেশী যে, ইসতিগফারের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ নামটি বার বার জপ করার জন্য আল্লাহপ্রেমীদের পরামর্শ দেয়া হয়। আল্লাহর যে কোন একটি নামের সংখ্যা এবং তার গুণের শক্তির উপর নির্ভর করে সেই নামে তাঁকে স্মরণ করতে পারলে তা আল্লাহর প্রেমে আরও গভীরভাবে মশগুল হতে সহায়ক হবে। অন্যকথায়, যত বেশি জিকির করা যাবে তত বেশি তা একাগ্র হবে এবং তত বেশি ইলাহী বহিঃপ্রকাশকে উপলব্ধি করা যাবে।

জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ যতই হৃদয়ে পৌঁছাবে ততই উম্মত হিসেবে বিশ্বাসীর প্রকাশ পূর্ণাঙ্গতার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, **"আল্লাহকে স্মরণের মাধ্যমে হৃদয় তুষ্টি লাভ করে।"** (রা'দ, ১৩:২৮)

যদি হৃদয় লাফজা-ই জালাল আত্মস্থ করতে না পারে তবে মানুষ বস্তুগত ধন-সম্পদ এবং কামাসক্ত আকাঙ্খার মধ্যে বন্দী হয়ে যায়। কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে, **"তুমি কি এমন কাউকে দেখোনি যে আল্লাহকে চায় তার নিজস্ব প্রগাঢ় আবেগের জন্য? তুমি কি তাঁর জন্য সমস্ত ইহজাগতিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পার?"** (ফুরকান, ২৫:৪৩)

নৈতিকতা, ভাল কাজ এবং আধ্যাত্মিক আচরণসমূহ, যেগুলো হৃদয়ে পুথিত হয় সেগুলোই আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। মানুষ সবচে' সুন্দর প্রাণী হওয়ার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

অন্যদিকে কুফরী শির্ক মন্দ কাজ যদি মনে জায়গা করে নেয় তবে আমরা পুরোপুরি ইন্দ্রিয়াসক্তির কবলে নিপতিত হবো। এই নিতিকবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। তখন সৃষ্টির লক্ষ্য উম্মোচন করতে হৃদয় অক্ষম হয়ে পড়ে। এমনকি মাঝে মাঝে এসব বৈশিষ্ট্যের ধারক অন্য প্রজাতি থেকেও অধঃস্তন হয়ে পড়ে।

যারা অহংকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের পরিণাম সম্পর্কে কবি নিজামী বলেন, "ইহজাগতিক আনন্দলাভ অনেকটা হাতের তালু চুলকানোর মত সুখকর। প্রথম প্রথম চুলকাতে খুব ভাল লাগে কিন্তু এই চুলকানির ইতি ঘটে তালুতে ক্ষতের সৃষ্টি করে।" আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে জুনায়েত বাগদাদী রাহ. বলেন, "এটা হল, মৃত্যুকে মহিমান্বিত করা এবং সেই আদেশ মৃত্যুর আগেই মৃত্যুকে মনে মনে ধারণ করা। কেননা, আল্লাহ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তোমাকে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে আবার তাঁর সাথে পুনরুত্থান করবেন।"

ছ) তাওয়াজ্জুহ (প্রবণতা)

আল্লাহর ডাক ছাড়া আর সমস্ত আকর্ষণীয় ইহজাগতিক ডাককে অগ্রাহ্য করাই হল তাওয়াজ্জুহ। এই স্তরের উপলব্ধিই হল মৃত্যু। একজন ধার্মিক ব্যক্তির বাস্তবতা হল, তার কোন ইহজাগতিক আকাঙ্খা ও বন্ধু থাকে না। এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভ ছাড়া আর কোন লক্ষ্য থাকে না। এমনকি স্বল্প সময়ের জন্যও সে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অসচেতন থাকতে পারবে না। যখন মৃত্যু আসবে তখন খুব অনিচ্ছার সাথে আল্লাহ ছাড়া তার যাবতীয় জাগতিক সম্পর্কগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। সত্যিকারের সুখ হল, জীবিতাবস্থায়ই আল্লাহর কাছে সমর্পণ এবং আল্লাহর দিকে ফেরা এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলা।

জ) সবর (ধৈর্য্য)

সবর হল বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে ভারসাম্য পরিবর্তন না করে অনাকাঙ্খিত এবং কষ্টকর ঘটনাবলীর ধৈর্য্যের সাথে মোকাবিলা করে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করা। মৃত্যু মানুষ্যকে সমস্ত জাগতিক মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে; আর কবর হল তার বাধ্যতামূলক জায়গা। ধৈর্য্যের দরকার হয় এমন বিপর্যয়ের সময় কবর। কিছু নৈতিক গুণাবলী ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন- ক্ষমাশীলতা, নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয়, শুদ্ধতা, সন্তুষ্টি, সমবেদনা, করুণা, দয়া এবং সহ্যশক্তি। যে সমস্ত জিনিষ আল্লাহর বিধান থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে সেসব ব্যাপারে আমাদের ধের্য্যশীল থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন

আমাদের নির্দেশ দেয়, **"এবং আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন সিদ্ধান্ত দেন ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্যশীল এবং স্থির থাকো; কারণ সিদ্ধান্তকারী হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ।"** (ইউনুস, ১০:১০৯)

বিপদকে মোকাবিলা করার জন্য ধৈর্য্য একটি বিশাল বর্ম। মৃত্যু হল কামাসক্ত অন্ধ আকাঙ্খাগুলোর পরিসমাপ্তি এবং কবর হল হাশরের ময়দানে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে রাখার একটি বাধ্যতামূলক স্থান।

ঝ) মুরকাবা (ধ্যান)

মুরকাবার অর্থ হল, নিজের ক্ষমতা এবং শক্তির দম্ভ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। এই পর্যায়ের সম্পূর্ণ উপলব্ধিই হল মৃত্যুকে মেনে নেয়া। আরও নির্দিষ্টভাবে মুরকাবা হল, সব সময় আমি ঐশ্বরিক পর্যবেক্ষণের অধীন। এই অনুভূতি যা মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে। সৃষ্টির সব কিছুই তাঁর অধীন।

মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কব্জা থেকে কেউ রেহাই পাবে না। অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বহীনতা, মৃত্যু এবং জীবন, নশ্বরতা এবং অবিনশ্বরতা- এ সব কিছুই একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রতি মুহূর্তে মানব দেহে হাজার হাজার কোষের মৃত্যু হচ্ছে আবার হাজার হাজার কোষের জন্মও হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে হাজার হজার শিশুর জন্ম হচ্ছে এবং হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটছে। প্রতি মুহুর্তে যখন অসংখ্য অজ্ঞ মানুষ ইহজাগতিক মোহে পড়ে পরমানন্দিত হচ্ছে। একই সময়, অসংখ্য ধার্মিক মানুষ সানুনয় প্রার্থনা এবং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছে। সবার জন্য পৃথিবীর শেষ বিরতি কবর অপেক্ষা করছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শুধু তাঁরই সক্রিয়তা সার্বভৌমত্ব এবং ঐশ্বরিক আয়োজন। নিজের মধ্যে আল্লাহর দাসত্বের গুণাবলী ত্বরান্বিত করার জন্য মৃত্যুর পূর্বে এই ঐশ্বরিক পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে সচেতন থাকাটা জরুরী। কল্পনা এবং চিন্তার আশ্রয় নিয়ে মানুষ নিজেকে আল্লাহর পথে পচািলিত করতে পারে। একটা বিচক্ষণ উক্তিতে বলা হয়েছে, "যে নিজেকে জানে সে আল্লাহকেও জানে।"

ঞ) রিযা (সন্তুষ্টি)

রিযা মানে, যে কোন ব্যাপারে নিজস্ব সিদ্ধান্ত এক পাশে সরিয়ে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ে বাস করা। এই স্তরের উপলব্ধি অর্থই হল মৃত্যু। অন্যকথায় রিযা হল, হৃদয় এবং নিজস্ব সত্ত্বার পরিশোধন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পরিপক্কতার উপলব্ধি। ক্ষণস্থায়ী এবং অলীক বস্তুর কব্জা থেকে পালিয়ে মানুষ আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করে। অফুরান আধ্যাত্মিক সুখ নিয়ে একজন ব্যক্তি যে উজ্জ্বলতাকে উপলব্ধি করে নিজের মধ্যে তা-ই নীচের কয়েকটি লাইনে বিবৃত হয়েছে,

"হে প্রভু। যাই তোমার কাছ থেকে আসে তা-ই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। সেটা গোলাপের কুঁড়ি বা কাঁটাই হোক অথবা সম্মানের পরিচ্ছদ বা কাফনের কাপড়ই হোক। তোমার মাধুর্য্য এবং তোমার ক্রোধ; উভয়ই গ্রহণযোগ্য।"

ট) তাফাক্কুর-ই মউত (মৃত্যুর ধ্যান)

পৃথিবী একবট ঈমান বা বিশ্বাসের পাঠশালা। এই বাস্তবতাকে গ্রহণ করলে মুত্যকে একটি বাধ্যতামূলক ক্রান্তিকালের সূত্র হিসেবে মনে করা যায়। মওলানা রুমী বলেন, "পুনরুত্থিত হওয়ার জন্যই মরতে হয়।" যখন কেউ তার ইন্দ্রিয়সক্তি ত্যাগ করতে পারে তখনই তার বিপথগামী হৃদয়ের পুনরূদ্ধার সম্ভব। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, *"মনে রেখ, আনন্দের ধ্বংসীকারক সবসময়ই মৃত্যু।"* (নাসা'ই, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ্)

অনাকাঙ্খিত মৃত্যু তোমার কাছে আসার আগে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে স্মরণ করাই হল তাফাক্কুর-ই মউত। অতএব, ইন্দ্রিয়াসক্তিকে পরিত্রাগ করার মাধ্যমে আল্লাহর উপস্থিতিকে স্বাগত জানানোর এটাই প্রস্তুতি। এটা ঈমানের উপর ভিত্তি করে একধরণের ধ্যান এবং আত্মোপলব্ধি।

জাগতিক মোহ, ক্ষণস্থায়ী আশা এবং স্বান্তনা যেন অনেকটা কবরের উপরে গাছের পাতা পড়ার মত। প্রতিটি সমাধিফলক যেন একটি অগ্নিগর্ভ পরামর্শদাতা যা গভীর নিঃশব্দতার সাথে মৃত্যুর জয়গান করছে। শহরের ভেতরে, রাস্তার পাশে এবং মসজিদের প্রাঙ্গণে কবরস্থান তৈরী করার উদ্দেশ্য হল, মৃত্যুর ধ্যানকে সবার মধ্যে সঞ্চালিত করা।

মৃত্যুর ভয়াবহ ভাবকে শব্দাবলী দিয়ে পুরোপুরি জয় করা যায় না। মৃত্যুর সাথে সাথেই একজন ব্যক্তির সমস্ত ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর পর শুধুমাত্র যে প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে আসে তা হল, কান্না এবং অসহায় বিষন্নতা।

যদি মানুষ স্বেচ্ছায় তার ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রবণতাগুলো ত্যাগ করতে পারে। তবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লহ তাঁর মাধুর্য্য এবং দয়াশীলতা দিয়ে আবার তাকে গড়ে তুলবেন। বস্তুতঃপক্ষে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ বলেন, **"মৃত মানুষ, যাকে আমি অন্যান্য জীবিত মানুষের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য জীবন এবং আলো দিয়েছিলাম সে কি তার মত হবে যে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। যেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না? অথচ যারা ঈমানদার নয়, তারা তাদের কাজগুলো ভাব দেখায় যেন বেশ খুশি হয়েই করছে।"** (আ'নাম, ৬:১২২)

একজন খাঁটি ভক্ত তাদের কাতারে শামিল হয় যাদের হৃদয় পুনরায় গড়ে তুলেছেন মহান আল্লাহ তা'আলা। কেননা সে, সমস্ত পার্থিব আনন্দ ত্যাগ করতে পেরেছে। নবীজি

সা. বলেছেন, *"ঈমানদারদের অন্তরদৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ থেকো। কেননা সে আল্লাহর নূর বা আলোর দ্বারা অবলোকন করে।"* (তিরমিযী)

উপরে উল্লেখিত সব অভিব্যক্তি একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের অনুশীলনের শর্ত। যাতে করে মৃত্যু হওয়ার আগেই মৃত্যুকে মেনে নেয়ার পরামর্শ মোতাবেক চলতে পারে। যে সকল বিশ্বাসীরা এইসব নির্দেশ অনুসরণ করে এই পথে চলার জন্য তাদের প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের গুরুত্বের বিস্তৃতির সাথে তাদের অগ্রগতি সাধিত হয়। ঐশ্বরিক অবলম্বনের সাহায্য নিয়ে একটি আন্তরিক প্রচেষ্টায় সুখবোধ জাগ্রত হয়।

পার্থিব জীবন একটি প্রতারণামূলক মরিচীকা। আর পরকাল হল চিরস্থায়ী আবাস। মৃত্যু হল একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিচারের দিন। মৃত্যুর আগেই সজাগ হলে আমাদের আর অনুতপ্ত হতে হবে না। এটা একটা অনিবার্য্য বাস্তবতা যে, সব স্বল্প মেয়াদী প্রাণীর সাথে একটা অনুদঘাটিত সময় এবং জায়গায় মৃত্যুর ফেরেশতার সাথে দেখা বা সাক্ষাৎ ঘটবে। মৃত্যু থেকে পালিয়ে এমন কোন জায়গাই নেই যেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। মানবজাতিকে আল্লাহর সহমর্মিতা এবং করুণার কোলে আশ্রয় নেয়ায় মৃত্যুকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই; এই আয়াতটির অর্থোদ্ধার করে তা থেকে আল্লাহর পথনির্দেশ পাওয়া যেতে পারে, **"সুতরাং সমস্ত ভ্রান্তি এবং মন্দ থেকে পালিয়ে আল্লাহর আশ্রয়ে আসো।"** (যারিইয়াত, ৫১:৫০)

যে মানুষ যৌনাসক্ত মনের অধীনে থেকে শুধুমাত্র এই পৃথিবীতেই বিশ্বাস স্থাপন করবে কবর তার কাছে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডোরতুল্য হবে। মৃত্যুর বিভীষিকা তাকে এমন বেদনার্থ করবে যে, সে এটাকে আর কোন কিছুর সাথে তুলনা করতে পারে না। তথাপি যদি সে উপরে উল্লেখিত পরামর্শগুলো প্রয়োগ করে তার পার্থিব সত্ত্বাকে ছাড়িয়ে তার ভিতরের লুকায়িত দেবদূতসম গুণাবলীর চর্চা করে তখন মৃত্যুকে তার মনে হবে আল্লাহর সাথে মিলনের একটি পূর্বশর্ত। ফলে মৃত্যু অধিকাংশ মানুষের মধ্যে কাঁপুনি জাগায়। তখন "শ্রেষ্ঠ বন্ধু" (আর রাফিক আল আ'লা) আল্লাহর সাথে মিলনের আগ্রহে রূপান্তরিত হবে। মহান সূফী রুমী এই ধরণের মৃত্যুকে শব-ই-আরূস অর্থাৎ বাসর রাতের সাথে তুলনা করেছেন। মৃত্যু একটি ভয়ঙ্কর বাস্তবতা থেকে সুন্দর বা আরাধ্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়। "মৃত্যুকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করার একটা পথ হল আমাদের বর্ণিত শর্তগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী হওয়া। নীচের আয়াতে সবচে' শ্রেষ্ঠ উপায়টি বিবৃত হয়েছে, **"এবং তোমার প্রভুর সেবা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই নিশ্চিন্ততার সময় তোমার কাছে আসে।"** (হিজর, ১৫:৯৯) অর্থাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁর প্রকৃত দাস থাকো। তারা কতই না সুখী যারা মৃত্যুর আগেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

হে আমাদের প্রভু, "মৃত্যু হওয়ার আগেই মৃত্যুর প্রার্থনা কর"। এই বাক্যটির নির্যাস নিয়ে পরকাল সম্পর্কে আমাদের সজাগ কর এবং আত্মোপলব্ধির সাথে বিশ্বজগতকে পর্যবেক্ষণ করার তৌফিক দান কর।

রজিক (বাঁচার জন্য অন্ন)

আবু হাযিম রাহ. বলেছিলেন, “দু'টো জিনিষ দিয়েই আমি পুরো পৃথিবীটা বিচার করিঃ প্রথমটি হল, আমার বাঁচার জন্য অন্ন এবং দ্বিতীয়টি হল, অপরের বাঁচার জন্য অন্ন। এমনকি যদি আমি বাতাসে ভর করে কোথাও উড়ে চলেও যাই, আমার রিজিক সেখানেও পৌঁছে যাবে। যদি আমি অপরের অন্নের পেছনে বাতাসের গতিতে ছুটেও যাই তবু আমি কখনোই তা হস্তগত করতে পারবো না।”

বঞ্চনা দারিদ্র এবং জীবিকা খুঁজে না পাওয়ার অক্ষমতার ভয় মানুষের মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে যা প্রায়শই তাদের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়। একজন ব্যক্তির ভাগ্যের বিভিন্ন দিকের কেন্দ্র বিন্দুতে থাকে রিজিক। মাতৃ গর্ভে থাকা অবস্থায় এটা শুরু হয় এবং ব্যক্তির নিয়তি অনুযায়ী আমৃত্যু তা চলতে থাকে। এক অর্থে মৃত্যুর সময় বাঁচার জন্য অন্ন সংগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমস্ত প্রাণীরই রিজিক পূর্বনির্ধারিত। যা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা থেকে এটা বাড়েও না কমেও না। যদি আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত থাকে তবেই বেঁচে থাকার অন্ন জোগাড়ের জন্য জীবিকার উপায়ের পেছনে লেগে থাকলে তা ফলদায়ক হয়। নিম্নলিখিত আয়াতটিতে এটা খুব স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে,

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“পৃথিবীতে এমন কোন চলৎশক্তিসম্পন্ন প্রাণী নেই যার রিজিক আল্লাহর উপর নির্ভর করে না”। (হুদ, ১১:৬)

আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি প্রাণীর রিজিক নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সে কারণে আল্লাহর বন্ধুরা তাঁর এই আশীর্বাদের জন্য এমনকি সুগন্ধি কাঠের বৃক্ষে গায়ক পক্ষীদে গানেও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ শুনতে পান। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কিভাবে অসুস্থ্য, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং যারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না তাদের রিজিকও নিশ্চিত করেছেন- তা নীচের আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে, **“প্রাণীদের মধ্যে যত সংখ্যক নিজেদের অন্ন যোগাড় করতে পারে না আল্লাহই তাদের এবং তোমাদের খাদ্যের যোগান দেন। কেননা, তিনি সব কিছু শুনতে পান এবং সর্বজ্ঞ।”** (আনকাবুত, ২৯:৬০)

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাণীর জন্য বণ্টনের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরী। এই বৈচিত্র্য সমাজে বিভেদ এবং সংঘাত সৃষ্টির চাইতে শৃঙ্খলা এবং সমন্বয় বয়ে নিয়ে আসে। কুরআনে বলা আছে, যে সমস্ত ইহজাগতিক সম্পদ আল্লাহরই সম্পদ এবং সেগুলো ঐশ্বরিক জ্ঞানের সাথে সংগতি রেখে বণ্টন করা হয়েছে। কাদা এবং কাদার।

বিশ্বাসীদের বিশ্বাস করা উচিত যে, রিজিক বণ্টনে বৈচিত্র্যতা তাদের অনুকুলেই করা হয়েছে। বেশির ভাগ মানুষেরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি তাদের আকাঙ্খা, উচ্চাকাঙ্খা এবং সীমাবদ্ধতা দ্বারা কলুষিত। সে কারণে যদি জীবনের শৃঙ্খলা মানুষের দূর্বল কৌশলের হাতে ছেড়ে দেয়া হয় তবে তা বিশ্বজগতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করবে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"তারা কি তোমাদের প্রভুর করুণাধারার প্রকাশগুলোকে বণ্টন করে? না, আমরাই তাদের জীবতকালে জীবিকাগুলো তাদের মধ্যে বণ্টন করে থাকি। এবং তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে উচ্চ পদমর্যাদায় আসীন করি। এতে করে কেউ কেউ অন্যদের কাজের আদেশ দিতে পারে। কিন্তু তোমাদের প্রভুর করুণা তাদের পুঞ্জিভূত সম্পদের চাইতে উত্তম।" (যাখরুফ, ৪৩:৩২)

এই বিশ্বজগতের প্রাণীদের মধ্যে তাদের রিজিকের বণ্টন, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং ক্ষমতার অন্যতম একটি চিহ্ন। দিনের যে কোন সময় আকাশে উড়ন্ত ডাঙ্গায় হেঁটে বেড়ানো অথবা সমুদ্রে সাঁতার কাটা প্রাণীদের জন্য খাবার টেবিল ভালভাবে তৈরী থাকে। উপর্যুপরি সাধারণত একটি প্রাণী অন্য প্রাণীর খাদ্যই তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ এবং চাহিদার উপর নির্ভর করে ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। রিজিকের এই বিভাজন- বিশ্বব্রহ্মান্ডের অগণিত প্রাণীর মত অগণিত প্রত্যেককে এক এক করে আলাদা আলাদাভাবে খাওয়ানো হয়। আর এসবই প্রজ্ঞা, ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। একইভাবে কুরআনের অন্য একটি আয়াতে বর্ণিত আছে,

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"তারা কি জানে না, আল্লাহর যখন খুশী তখনই তিনি সুযোগের পরিধি বিস্তৃত অথবা খর্ব করতে পারেন? বস্তুতঃপক্ষে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য এটা বিশেষ অর্থবহ।" (যুমার, ৩৯:৫২)

আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, যখনই তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের চেয়ে উপরে যারা আছে তাদের দিকে তাকায় তখনি সাথে সাথে তারা যেন তাদের অবস্থানের চেয়ে নিচে যারা আছে তাদের দিকেও তাকায়। এটা এজন্য দরকার, যাতে করে তোমরা আল্লাহর আনুকুল্যকে তুচ্ছ জ্ঞান না কর।" (বুখারি, মুসলিম, তিরমিযী)

সুতরাং, আমাদের জীবনের সুখ এবং আনন্দ নির্ভর করে এই বিশ্বাসের উপর যে, যেটুকু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন তাই আমাদের জন্য উত্তম। এমন অনেক ঘটনা আমাদের সামনে এসে পড়ে যা প্রথম দৃষ্টিতে দূর্ভাগ্য হিসেবে মনে হয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, সেগুলোর ফলাফল আমাদের জন্য সত্যিকারার্থেই সৌভাগ্যসূচক। ঠিক যেমন দারিদ্রতা জান্নাতে যাওয়ার পথ পরিস্কার করে। ঠিক একইভাবে এমন অনেক ঘটনা আছে যা প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় সৌভাগ্য বয়ে আনবে, কিন্তু পরক্ষণেই তা পরিণত হয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হতাশায়। যেমন, দান-খয়রাতে সম্পদ ব্যয় করার পরিবর্তে সস্তা আকাঙ্খায় তা ব্যয় করা। আল্লাহ বলেন, **"তোমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা আমরা বরাদ্দ করেছি তার ভাল অংশটুকুই খাও। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নয়। পাছে আমার ক্রোধ যেন তোমাদের উপর পড়ে। এবং যাদের উপর আমার ক্রোধের আসর হয়; জেনো, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে নিশ্চিত!"** (তা-হা, ২০:৮১)

এসকল সত্যের আলোকে, আল্লাহর রিজিকের বণ্টনে পূর্ণ সমর্পন বিশ্বাসীর শ্বাস্বত সুখ অর্জনের একটি পন্থা। যেহেতু মানুষ সৃষ্টির আগেই স্রষ্টা তাদের রিজিক বণ্টন করে দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের উচিত আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সমর্পণ করা। আর এতে করে সে তার জন্য পূর্বনির্ধারিত রিজিক উপভোগ এবং তাকদীরে বিশ্বাস করার স্বাদ অনুভব করতে পারবে। কুদসী হাদিসে বর্ণিত আছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ রিজিক বণ্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন, *"তুমি যদি আমার এমন কোন বান্দার খোঁজ পাও যে সত্য ও সরল পথে থেকেই আমার বরাদ্দ করা রিজিকের অপেক্ষা করে, তার সাথে ভাল ব্যবহার কর এবং তার পথ সহজ করে দাও"*। (নাওয়াদির আল-উসুল)

এই হাদীসটি খোলাখুলিভাবে বলে যে, যখন কোন বান্দা তার আকাঙ্খা এবং অভিপ্রায়গুলো শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করে তাঁর অনুশাসনগুলো মান্য করে, তাঁর কারণেই তাঁর উপাসনা করে এবং একজন একাগ্র ও অনুরক্ত বিশ্বাসী হয়ে ওঠে তার জন্য জান্নাত লাভের সুসংবাদ নিশ্চিত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের রিজিকের বণ্টনের

পিছনের কারণ সদাশয়তার সাথে সৃষ্টি করেছেন। এই সত্যটা নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ

"এবং তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় কর। সেসব বান্দাদের জন্য আল্লাহ সবসময় মুশকিল আসান করে দেন, এবং এমন সব উৎস থেকে তার রিজিক তিনি প্রদান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।" (তালাক, ৬৫:২-৩)

সেই সাথে নবীজী বলেন, "যদি তুমি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন কর তাহলে তিনি পাখীদের যেভাবে অন্নের যোগান দেন ঠিক সেই ভাবেই তিনি তোমার অন্নেরও যোগান দেবেন। পাখীরা ভোর বেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে নীড়ে ফিরে আসে। (তিরমিযী, যুহদ,৩৩, ইবনে মাজাহ, যুহদ, ১৪)

পিপীলিকা খুব দুর্লভ। এর মত অরো কিছু প্রাণী আছে যারা গ্রীস্মকালে শীতকালের জন্য খাবার সংগ্রহ করে রাখে। এটা একটি জানা সত্য যে, অন্যান্য জীবেরা যদিও তারা পিপীলিকার মত শীতকালের জন্য খাবার সঞ্চয় করে রাখে না। কিন্তু কঠোর শীতেও তারা টিকে থাকতে পারে এবং নিরাপদেই বসন্ত উপভোগ করতে পারে। এই পূর্ণাঙ্গ ঐশ্বরিক শৃঙ্খলা যা তার স্বর্গীয়তা এবং সার্বভৌমত্বের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সেখানে স্রষ্টা কিভাবে তার সৃষ্ট জীবদের রিজিকের কথা ভুলে যাবেন? মোটকথা এই পৃথিবীতে আমাদের পূর্বনির্ধারিত রিজিকের জন্য অলসতা, কৃপণতা, হিংসা, সন্তানের আকাঙ্খা না করা ইত্যাদি ভুল এবং নিন্দনীয় আচরণ।

অনুচ্ছেদগুলো থেকে বলা যায়। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেকের রিজিকের অংশ পূর্ব নির্ধারিত। আর সেই অংশটি কারো জীবতকালের যে কোন সময়ে একই রকম থাকে। আল্লাহ, যিনি অস্তিত্বশীল সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি প্রতিটি প্রাণীর জন্য একটি নির্দিষ্ট আয়ুস্কাল অনুমোদন এবং সেই সময়টুকুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রিজিক নির্ধারণ করেছেন। একজন মানুষের জীবন, প্রতিটি শ্বাস এবং তার প্রতিটি গ্রাস- সবই পুরোপুরি তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট। এবং আদম আ.-এর উত্তরসূরীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় রিজিকের বরাদ্দ কাজ করে অর্জনের নির্দেশ মুমিনদের দেয়া হয়েছে। সুতরাং ঐশ্বরিক নির্দেশ মান্য করা এবং রিজিকের জন্য কাজ করা আমাদের বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে অন্যতম। অন্যকথায়, আমাদের শ্রম হলো পূর্বনির্ধারিত রিজিক বণ্টনের অন্যতম শর্ত। একটি প্রসিদ্ধ তুর্কী প্রবাদ আছে, "প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নাও, তখন পূর্ব নির্ধারিত নিয়তিকে ভ্রান্তভাবে দোষ দিতে পারবে না। " সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের ইচ্ছাশক্তি,

উদ্যোগ, দায়িত্ব, দাবী, ত্যাগ এবং উপলব্ধির মত কিছু স্বর্গীয় গুণাবলী দান করেছেন। এই গুণগুলোকে উপেক্ষা করার মানে আল্লাহর বিরুদ্ধে এক ধরণের বিদ্রোহ ঘোষণা করা।

নিজেদের বিপদ থেকে রক্ষা করা আমাদের একটি সহজাত প্রবণতা। যেমন, আমরা অসুস্থ হলে ডাক্তারের পরামর্শ এবং সে অনুযায়ী ঔষধ সেবন করি। অথবা ভয়াবহ আগুন বা ভূমিকম্পের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালানোর চেষ্টা করি। বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য রিজিক অর্জনের চেষ্টা করাটা একটি ঐশ্বরিক নির্দেশ। এটা পূর্বনির্ধারিত নিয়তির উপর বিশ্বাসের সাথে অসংগতিপূর্ণ নয়। কার্যকারণের সূত্রগুলো অগ্রাহ্য করার অর্থ হলো, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর া। যা পাপ হিসেবে বিবেচিত।

কুরআনে বর্ণিত অছে,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"মানুষ শুধুমাত্র চেষ্টার দ্বারাই কিছু অর্জন করতে পারে।" (নাযিম, ৫৩:৩৯)

নবীজি সা. বলেছেন,

"কোন লোকের জন্য দড়ি নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করা অন্য লোকের কাছে হাত পাতার চাইতে উত্তম, তা যতই তার চাহিদা অন্য লোকেরা পুরণ করুক অথবা না করুক।" (বুখারি, যাকাত,৫০)

ইবনুল ফিরাসির ভাষ্য অনুযায়ী, একদিন তার বাবা নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার যা প্রয়োজন তা মিটাতে কি অন্য লোকের কাছে চাইবো?" নবীজি বললেন, *"কারো কাছে চেয়ো না। আর যদি একান্তই না পার তবে ন্যায়বান মানুষের কাছে চাইবে।"* (আবু দাউদ, যাকাত, ২৮)

আমরা যা উল্লেখ করলাম তা ছাড়াও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার সৃষ্ট জীবদের রিজিক অর্জনের জন্য উপায় হিসেবে অন্যের উপর নির্ভশীল করেছেন। দরিদ্র মানুষদের দেখা শোনা, তাদের চাহিদাগুলো পূরণ করা এবং আল্লাহ আমাদের যেটুকু দিয়েছেন তার কিছু অংশ তাদের দেয়া- এ ধরনের মহান মূল্যবোধ দয়া হিসেবে বিবেচিত। এই প্রেক্ষিতে জিবরাইল আ. বলেছেন, "আমি যদি এই পৃথিবীর কোন সম্প্রদায়ের মানুষ হতাম তাহলে আমি তিনটি জিনিষকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসতাম: যারা পথ হারিয়েছে তাদের দিক-নির্দেশনা দিতাম, দরিদ্রতার মধ্যে যারা প্রার্থনা করে তাদের ভালবাসতাম এবং অধিক সংখ্যক দরিদ্র জনক-জননীদের সাহায্য করতাম।

হালাল খাদ্য

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বৈধ উপায়ে হালাল খাদ্য যোগাড় করা। যা পূর্ণাঙ্গতা অর্জনের পথে একটি বড় অনুষঙ্গ।

একবার সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারি এক লোকের কাছে একটা ভেড়া বিক্রি করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে লোকটি তুসতারির কাছে ভেড়াটি নিয়ে ফিরে এলো এবং বলল, "আপনার ভেড়া আপনার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি, কারণ সে ঘাস খায় না।"

তুসতারি উত্তর দিলেন, "তুমি তা কি করে জানলে?

"আমি ঘাস খাওয়ার জন্য তাকে একটি মাঠে নিয়ে গিয়েছিলাম, সে ঘাসের একটি পাতাও খায়নি।"

তুসতারি উত্তর দিলেন, "হে আমার বন্ধু! তুমি নিশ্চয়ই ভুল করেছ। আমাদের প্রাণীর অভ্যাস হলো, অন্য কারো কিছু না খাওয়া। যাও এবং তোমার নিজস্ব সম্পদ থেকে তাকে খাবার দাও।"

তার কথা অনুযায়ী লোকটি নিজের মালিকাধীন কিছু একটা এনে দিলে ভেড়াটি খেতে শুরু করল।

হালাল খাদ্য সংগ্রহের মুসলিম স্পর্শকাতরতা তাদের পোষা জীব-জন্তুদের উপরও প্রভাব ফেলে। হালাল জীবিকাকে যে অগ্রাধিকার দেয় সে জীবনের আলো, হৃদয়ের আনন্দ এবং উপাসনার নির্যাসকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে। একটি সুস্থ্য মনের অধিকারী হতে চাইলে এই অনুসঙ্গটি অনুসরণ করা অন্যতম। হারাম বা অনৈতিক পথে উপার্জিত জীবিকা বিষের মত। যা জীবন ধ্বংস করে এবং যা চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে এবং হতাশার জন্ম দেয়। ইহকাল এবং পরকালে হীনমণ্যতা, অসম্মান এবং বিপর্যয়- এসব কিছুই অবৈধ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করার ভয়ঙ্কর পরিণাম।

আল্লাহকে পাওয়ার উপায় হলো, হালাল সম্পদ এবং হালাল খাদ্য। অন্যদিকে অনৈতিকভাবে যারা সম্পদ এবং খাদ্য উপার্জন করে তারা ভয়ানক অনুতাপ এবং হতাশায় ভোগে। যখন হৃদয় আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার পরিবর্তে সন্তান সন্ততি এবং সম্পত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তখন তার পরিণতি হয় বিষন্নতা এবং হতাশা। মওলানা রুমী এই বিষয়টাকে নিম্নলিখিত উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন, "জাহাজের ভিতরে পানি ঢুকলে তা জাহাজটির ডুবে যাওয়ার কারণ হয়। কিন্তু এই একই পানি জাহাজের নিচে থাকলে তা সেটাকে ভাসিয়ে রাখে। হযরত সুলাইমান আ. তার মন থেকে পার্থিব সম্পদের জন্য মোহকে দূর করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বলেছেন, "আমি দরিদ্র, এবং একজন দরিদ্র

লোকের উচিত দরিদ্র লোকজনের সাথে থাকা।" এতে করে তিনি একটি মহিমান্বিত অবস্থায় পৌঁছেছিলেন।"

আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, **"হে আদম সন্তান! তোমাদেরই আল্লাহকে প্রয়োজন। কেননা তিনিই এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহর কোন চাহিদা নেই। এবং তিনি সকল প্রশংসার দাবীদার।"** (ফাতির, ৩৫:১৫)

একারণেই পার্থিব সকল সম্পদ সম্পর্কে নবীজি বলেছেন, শুধুমাত্র ধর্ম এবং আল্লাহর জন্যই এসবের স্বত্ত্বাধিকারী হও। যে সম্পদ ভাল কাজে ব্যয় করা হয় তা সত্যিই চমৎকার সম্পদ। (আহমাদ, মুসনাদ, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৭, ২০২)

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি করতেন, "হে আল্লাহ! দয়ালু লোকদের পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী করুন। আশা করা যায় যে, যারা গরীব তাদেরকে তারা সাহায্য করবে।"

অন্যদিকে যে সম্পদ হালাল নয় তা থেকে দেয়া যাকাত বা সদকাহ ও যথাক্রমে বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছায় দান করাও একটি অনৈতিক লাভ। ইহকাল এবং পরকালের জন্য অনৈতিক লাভ একটি সম্মানহানিকর বিষয়। একটি হালাল গ্রাস দেহের ভিতরে প্রজ্ঞা, শিক্ষা এবং মারেফা বা জ্ঞানের জ্বালানী হিসেবে কাজ করে এবং আল্লাহর জন্য ভালবাসা জাগ্রত করে এবং সেই সাথে মনে উষ্ণ আবেগের সঞ্চার করে। ঠিক যেমন জমিতে গমের বীজ বপন করে সেখান থেকে বার্লি পাওয়া অসম্ভব, ঠিক তেমনি যে শরীরে অবৈধ খাদ্য প্রবেশ করে সেখান থেকে আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করা সম্ভব নয়। যদি শরীর হালাল খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট না হয় (যা মানুষকে আল্লাহকে জানার শক্তি যোগায়) তাহলে হৃদয়ের আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতা এবং উপাসনার সময় বিনীত প্রার্থনা অর্জিত হবে না।

নিচের কুদসী হাদিসটি অনুধাবনের চেষ্টা করুন, "যারা নিজেদের হারাম খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। তাদের কাছে কোনরকম কৈফিয়ত চাইতেও আমি লজ্জা বোধ করি।" (বুখারি, ইমান ৩৯; মুসলিম, মুসাকাত, ১০৭)

সুতরাং এই দুনিয়ায় বৈধভাবে জীবিকা নির্বাহ করা জরুরী। একমাত্র হালাল খাদ্যের মধ্যেই সরল পথে চলার আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার অধিকারী, হওয়ার এবং পার্থিব জীবনের কারাগার থেকে আল্লাহর নূরের দিকে পরিচালিত করার শক্তি রয়েছে।

এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৈধ এবং অবৈধ কাজের মধ্যেখানে রয়েছে ন্যায় অন্যায়ের ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকার একটা জায়গা। ঐ জায়গাটা সতর্কভাবে পরিহার করা উচিত। অনেকটা অবৈধ কাজ থেকে দূরে থাকার মত। সন্দেহজনক বিষয় আল্লাহর

ব্যক্তিগত তৃণভূমির মত এবং যে-ই সেই তৃণভূমিতে প্রবেশ করবে তার ধ্বংস অনিবার্য। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন,

"বৈধ এবং অবৈধ কাজ, উভয়ই স্বত:সিদ্ধ কিন্তু তাদের মাঝখানে অনিশ্চিত একটা জায়গা আছে যার সম্বন্ধে অদিকাংশ মানুষেরই কোন ধারণা নেই। যে নিজেকে ঐ অনিশ্চিত জায়গা থেকে রক্ষা করতে পারবে, সেই তার ধর্ম এবং সম্মান রক্ষা করতে পারবে। এবং যে ঐ সব সন্দেহজনক, অনিশ্চিত বিষয়াদিতে রত হবে, সে অবৈধ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়বে। এধরণের ব্যক্তিরা একজন মেষ পালকের মত। যে নিজের মেষের পালকে অন্যের ব্যক্তিগত তৃণভূমিতে চড়ায় এবং যে কোন মুহূর্তে অনধিকার প্রবেশের জন্য তারা আইনত অভিযুক্ত হয়। সাবধান! প্রতিটি রাজারই ব্যক্তিগত তৃণভূমি আছে এবং এই দুনিয়ায় আল্লাহর ব্যক্তিগত তৃণভূমি হলো, যে জায়গাটিকে তিনি নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।"

মওলানা রুমী এই বাস্তবতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, বৈধ খাদ্য মানুষকে আধ্যাত্মিকতা এবং স্বর্গীয় আলোয় পূর্ণ করে, বেহেশতি নূরের থেকে উত্তম কোন খাদ্য মানুষের জন্য নেই। অন্য কোন উপায়ে মানুষের সত্ত্বা পরিপুষ্ট হয় না।

একটু একটু করে নিজেকে এই দুনিয়ার খাদ্য এবং পানীয় থেকে বিরত রাখো। এগুলো মানুষের সত্যিকার পুষ্টি যোগায় না। আখেরাতের পুষ্টি অর্জনের জন্য সঠিক যোগ্যতা লাভ করার চেষ্টা কর। নিজেকে স্বর্গীয় দ্যুতির গ্রাসের জন্য তৈরী কর। কুরআনের এই অনুশাসন বা নির্দেশ মান্য কর, **"আল্লাহর অকৃপণ দানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও!"** (জুমু'আ, ৬২:১০)

সাবধান! আল্লাহর জন্য যদি শরীর না ঝুঁকে এবং সমর্পন না করে; শরীর যতক্ষণ না সত্যি সত্যিই ক্ষুধার্ত হয় তার আগ পর্যন্ত সত্যের বিরুদ্ধে অনমনীয় হয়ো না। পেট না ভরা পর্যন্ত একে দমন করার চেষ্টা কর। যেমন ঠাণ্ডা লোহাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নির্দিষ্ট আকৃতি দান করা হয়।

অহংকারের সাথে ফিরাউনের সাদৃশ্য রয়েছে। ফিরাউন মূসা আ.-এর কাছে দুর্ভিক্ষের সময় ভিক্ষা চেয়েছিল। তুমি যদি এই ধরণের আধ্যাত্মিক খাদ্য টনের পর টনও খেতে থাকো তবওু তুমি পালকের মত হালকা অনুভূতি নিয়ে হাঁটতে পারবে। এমনকি যদি তুমি এক সমুদ্র পানির পরিমাণে এই আধ্যাত্মিক খাদ্য খাও তবুও তুমি একটি জাহাজের মত ভেসে থাকতে পারবে। পাকস্থলীর ক্ষুধা মানুষকে খড়ের গাদার দিকে পরিচালিত করে কিন্তু মনের ক্ষুধা মানুষকে মিষ্টি পুদিন ক্ষেতের দিকে নিয়ে যায়।

যে সমস্ত প্রাণী খড় এবং বার্লি খেয়ে পরিপুষ্ট হয় তাদের নিয়তি হল বিসর্জন; যারা সত্যের আলো দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তারা জীবন্ত কুরআনে পরিণত হয়। পেটের চিন্তা ছেড়ে

দাও এবং মনের ক্ষুধা মেটাও যাতে করে আল্লাহর নৈকট্যের শান্তি তোমার মধ্যে পেতে পার।

এই আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, রিজিকের বিভাজন ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত এবং বুদ্ধিমান মানুষের মন থেকে উচ্চাকাঙ্খা এবং লোভের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আয়াতটি আরো বলে যে, আল্লাহই রিজিকের বন্টনকারী। যদি আমরা এর সাথে একের পর এক আমাদের নতুন নতুন ইচ্ছা এবং উদীয়মান আকাঙ্খাগুলো যোগ করতে থাকি তাহলে আকাঙ্খার এই যোগফলকে আমরা পার্থিব উচ্চাকাঙ্খা বলতে পারি। এটা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শুধু স্থায়ী হবে। তাদের পরিণাম হল হতাশা এবং কঠোর অনুতাপ। পার্থিব উচ্চাকাঙ্খাগুলো সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মিলিয়ে যাওয়া ছায়ার মত অগণিত আকাঙ্খা দিয়ে গঠিত।

পাপ হৃদয়কে কালিমাময় করে এবং বাস্তবতা সম্পর্কে বধির করে। এই পাপ হৃদয়ের ঐশ্বরিক সত্য জানার জন্য যে সংবেদনশীলতার দরকার হয় তা নষ্ট করে দেয়। এই প্রেক্ষিতে অনৈতিক খাদ্য আহার করাই হৃদয়ের এই পচনের কারণ। বর্ণিত আছে যে, এ ধরনের মানুষদের প্রার্থনার জবাব চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এর কারণ হলো, শরীরের পুষ্টির সঞ্চালন প্রক্রিয়া চল্লিশ দিনে সম্পন্ন হয়। উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদ থেকে আমরা এই চিত্র পাই যে, হৃদয়ের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের উপর অনৈতিক বা হারাম খাদ্যের অসুস্থ্য প্রভাব পড়ে।

অতএব অনৈতিক উপায়ে লব্ধ খাদ্য থেকে যে পুষ্টি আসে তা শরীরের জন্য বিষ। এই পর্যায়ে পৌঁছালে প্রার্থনার সুস্বাদ অনুভব করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

জেনো, সকল প্রতিকারের ভিত্তি হল ক্ষুধা। দৃঢ় সংকল্পের সাথে ক্ষুধাকে আত্মীভূত কর। একে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কর না। এই পৃথিবীতে আমাদের এবং আমাদের পরিবারের জীবন ধারণের জন্য কত কী ব্যয় করে থাকি। আমাদের অমিতব্যয়িতা পরিহার করে চলা উচিত। এই দুনিয়ায় সম্পদ এবং সুযোগ সীমিত। সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে তার কৈফিয়ত আমাদের পরকালে দিতে হবে। বর্তমানের পুঁজিবাদী সমাজের মত অর্থ সম্পদ যথেচ্ছভাবে এবং অবিচক্ষণতার সাথে খরচ করলে আমাদের ভবিষৎ প্রজন্মরা বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে। সব প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষই সহজে সন্তুষ্ট হয় না। একটি বন্যজন্তু এক পাল ভেড়াকে তার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই আক্রমণ করে থাকে। তার ক্ষুধা মোচন হলে সে আর আক্রমণ অব্যাহত রাখে না। কেননা তার মাথায় এই চিন্তাই থাকে না যে, পরের দিনের জন্য আরও কয়েকটা শিকার করে রাখি। এরপর সত্যিকারার্থে সে পালের অন্যান্যদের সাথে মিতালী গড়ে তুলতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষের রয়েছে সীমাহীন আকাঙ্খা। একজন ব্যক্তিকে তার সীমাহীন আকাঙ্খা থেকে রক্ষা

করার প্রথম শর্ত হচ্ছে তার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা যে, রিজিক বাড়ে না কমেও না। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

"অনিঃশেষিত উৎস এবং কোষ ভণ্ডার ছাড়া আর কোন বস্তু আমাদের নেই; কিন্তু সেগুলো আমরা দুনিয়ায় প্রয়োজন মাফিক এবং যা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই পরিমাপে পাঠাই।" (হিজর, ১৫:২১)

কোথায় আমরা আমাদের আর্থিক এবং মানসিক পুঁজি ব্যয় করবো সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের স্বল্প আয়ুর সীমিত শ্বাস প্রশ্বাস এই পৃথিবীর উৎকর্ষতা সাধনে বিনিয়োগ করাটাকে আমাদের অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। আমাদের মূল্যবোধ এবং সত্যের পরিব্রাজক হওয়া দরকার। যে সসীম কিছু ছেড়ে অসীমকে বরণ করে, সে সঠিক পথে চলাটাকে অগ্রাধিকার দেবে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে খাঁটি এবং অনৈতিক রিজিক প্রদান কর এবং আমাদের ভাল কাজ করার মাধ্যমে জয়ী বা সফল কর।

আমীন!

আলো এবং অন্ধকার

সর্বশক্তিশান আল্লাহ মানুষকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন যাতে করে সে প্রতিতুলনার মাধ্যমে বাস্তবতাকে বুঝতে পারে। আমরা শুভকে অশুভের সাথে, সৌন্দর্যকে কদর্য্যতার সাথে, শুদ্ধকে ভুলের সাথে এবং আলোকে অন্ধকারের সাথে প্রতিতুলনা করে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারি। অতএব প্রতিতুলনার উপর ভিত্তি করে মানুষ বস্তু এবং ধারণাকে চিহ্নিত করে আর এভাবেই তার উপলব্ধি করার ক্ষমতা কাজ করে থাকে। আমরা অবিশ্বাসের কদর্যতার সাথে প্রতিতুলনা করে সৌন্দর্য্য এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করার গুরুত্ব হৃদয়াঙ্গম করতে পারি।

কুরআন মানবজাতিকে বিশ্বাসের আলোর দিকে এবং অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে দূরে পরিচালিত করে। আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেছেন দুইভাবে: এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁর একটি প্রকাশ এবং কুরআন তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশ। এই দুই বহি:প্রকাশ একে অন্যের পরিপূরক। যে বিশ্বজগতে আমরা বাস করি তা শব্দবিহীন একটি কুরআন এবং কুরআন হলো বিশ্বব্রাহ্মান্ডের একটি বাচনিক প্রকাশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আল্লাহর বিশালতার স্বর্গীয় রহস্য এবং তাঁর কর্মের বহি:প্রকাশ দ্বারা পূর্ণ। মানুষ এই দুইটি বহি:প্রকাশের নির্যাস। অতএব সর্বশক্তিমান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষের এই উচ্চতম আসনের কথা পরিস্কারভাবে নিম্নলিখিত হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ করেছেন,

"হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। এবং আমি সমগ্র বিশ্বজগতকে তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি। তোমার উপর আমার দাবী হলো যে, তোমার জন্য আমি যা সৃষ্টি করেছি তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো না। কারণ তাহলে তুমি আমার ব্যাপারে অসচেতন হয়ে পড়বে। কেননা, তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। ইহজাগতিক ব্যাপারে মেতে ওঠার জন্য নয়।"

একারণেই সূফীরা মানবজাতিকে একটি অনুবিশ্ব এবং বিশ্বব্রহ্মান্ডের নির্যাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার প্রকৃতির কারণে মানুষ শুভ এবং অশুভ- এই দুই প্রবণতার দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তার মধ্যে আলো এবং অন্ধকার উভয়ই খেলা করে। এটা নিশ্চিত করা তার দায়িত্ব। যেন অবিশ্বাসের অন্ধকার বিশ্বাসের আলোকে আবৃত না করতে পারে। কুরআন বিশ্বাসীদের নির্দেশ দেয় যেন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়; সামাজিক পর্যায়েও অন্ধকারের উপর আলোকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করতে পারে। এতে করে সমাজ ধ্বংসের হাত থেকে

রক্ষা পাবে। কুরআন বলে, **"তারা কি ডাঙ্গায় পরিভ্রমণ করে না, এতে করে তাদের মন এবং মস্তিষ্ক প্রজ্ঞা এবং তাদের কান শুনতে ও শিখতে পারে? সত্যিকারার্থে মানুষের বোধ নয় বক্ষে অবস্থিত হৃদপিণ্ডই অন্ধ থাকে।"** (হজ্ব, ২২:৪৬)

অবজ্ঞাকারী হৃদয়েদের উদ্দেশ্যে কুরআন আরও বলে,

"তারা কি একাগ্রচিত্তে কুরআনকে বুঝার চেষ্টা করে না; অথবা তাদের হৃদয়ের দরজা কি তালাবদ্ধ?" (মুহাম্মদ, ৪৭:২৪)

যারা কুরআনের আয়াতগুলো পড়তে ও বুঝতে এবং একি সাথে বিশ্ব জগতের অপর রহস্যগুলোও বুঝতে পারে তারা আপন আত্মার পবিত্রতা বা শুদ্ধতার সাথে তাল রেখে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ জগতে আল্লাহর শক্তির বহি:প্রকাশগুলোকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। দূর্ভাগ্যবশত: মাঝে মাঝে মানুষ খুব অবজ্ঞা ভরে আচরণ করে এবং তাদের অজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে পড়ে যাওয়ার কারণে ঐশ্বরিক বাস্তবতাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। অর্থ সম্পদ এবং ইহজাগতিক অবস্থানের মত বস্তুগত লাভকে মানুষ দেবতাজ্ঞানে পুজা করতে শুরু করে। তখন তারা ঐশ্বরিক দিক নির্দেশনার আলোকে অবজ্ঞা করে এবং তাদের অহংকারের অন্ধকারে তলিয়ে যায়। কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন যে, **"আল্লাহ আসমান ও জমিনের আলো।"** (নূর, ২৪:৩৫)

সে অনুযাযী যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথকে প্রত্যাখ্যান করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং কুরআনের আলোকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা অন্ধ।

তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আল্লাহ এমন একটা জীবন যাপন আমাদের করতে বলেন। প্রাত্যহিক প্রতিটি খুটিনাটি ব্যাপারে আমরা যেন ঐশ্বরিক আলোকে অনুসরণ করে চলি। এই প্রাত্যহিক ব্যাপারগুলো সামাজিক বা ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক বা দয়া দাক্ষিণ্য, বস্তুগত অথবা আধ্যাত্মিক, যাই হোক না কেন। আমরা যদি ক্ষমতাধারী শাসক হই অথবা যদি আমরা সরকারের কোন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হই তখন আমাদের আল্লাহর পথে পরিচালিত সেই ঐশ্বরিক আলো অনুযায়ী আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। মনুষ্য খুঁতগুলো যেমন অজ্ঞতা, অলসতা, স্বৈরাচার এবং অবিশ্বাস- এসব কিছুই মানুষের আত্মাকে কালিমাযুক্ত করে। এই কালিমার কিছু কিছু মানুষের ব্যক্তিগত এবং কিছু সামাজিক জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে থাকে। এই প্রবণতাগুলোর উল্টোধারা কুরআনে উল্লেখিত আছে। যেমন জ্ঞানার্জন, কঠোর পরিশ্রম, সুবিচার করা এবং স্বর্গীয় উদ্ভাসনের আলোকে পরকালে বিশ্বাস করা। মুহাম্মাদ সা. মানবজাতিকে অন্ধকারের আসল প্রকৃতি এবং একই সাথে ঐশ্বরিক আলো অনুযায়ী সঠিক আচরণের সংকেত, যা অবশেষে আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করে, তা শিখিয়েছেন।

সবসময় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষকে সবচে' শ্রেষ্ঠ যে আলোকবর্তিকা দেয়া হয়েছে তা হলো, কুরআন এবং নবীজির দিক নির্দেশক আলো। ইতিহাস সাক্ষী, নবী মুহাম্মাদ সা.-এর আলোকবর্তিকা জাহিলিয়াতের তথা ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার যুগের অন্ধকার দূর করে দিয়েছিল। অতএব, আমরা যেন আবারো সেই অজ্ঞতার অন্ধকার যুগে প্রত্যাবর্তন না করি সেকারণে আমাদের অবশ্যই কুরআন এবং নবীজির নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে, **"সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত নবীর এবং সে আলোকবর্তিকা যা আমরা পৃথিবতে প্রেরণ করেছি তারপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ তোমাদের সব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভালভাবেই জ্ঞাত।"** (তাগাবুন, ৬৪:৮)

যারা কুরআন মেনে জীবন অতিবাহিত করে না তারা অন্ধকারের জীবনে পড়ে থাকে। আমাদের অবশ্যই আপন সন্তান ও পরিবারকে এই অন্ধকার থেকে রক্ষা করতে হবে। শিশুদের শিক্ষা দেয়ার প্রথম পদক্ষেপ হলো, কিভাবে কুরআনের বিধান অনুসরণ করে জীবন যাপন করতে হয়। সেই সঙ্গে আমাদের অবশ্যই তাদের ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো এবং বিশ্বাসের বিভিন্ন ধারাগুলো শেখাতে হবে। তাদেরকে ইসলামের সব ভাল আচরণগুলো শেখাতে হবে। এই শিখন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে সুসম্পন্ন হয় না। আমাদের যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাজীবি মানুষদের সাহায্যেরও প্রয়োজন। তারা হতে পারেন স্থানীয় ইমাম বা ইসলামী বিদ্যালয় এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা।

পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার জন্য এই শিখন প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা যেন অনেকটা কোন উর্বর জমিতে স্বাস্থ্যকর বীজ রোপন করা। কালক্রমে কুরআন অনুযায়ী জীবন ধারার মধ্যে তারা বিশ্বাসের ফসল প্রোথিত করে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নবীজি সা. বলেন যে, তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়স হলেই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে উৎসাহিত কর। যাতে তারা আল্লাহর ইবাদতে অভ্যস্ত হয়। এই হাদীস নির্দেশ দেয়, ধর্মীয় শিক্ষা শৈশব থেকেই শুরু করা উচিত। শিশুদের আন্তরিক উপদেশ এবং প্রশিক্ষণ যেন অনেকটা মার্বেল খোদাই করে কোন সুন্দর আকৃতির রূপ দেয়ার কাজ করে। যদি এই সব ছোট ছোট কোমল হৃদয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ভালবাসার দীপশিখা প্রজ্বলিত করা যায় তাহলে এই পরম উপকারী প্রভাব তাদের মনে আমৃত্যু অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহর এক বন্ধু আবু বকর ওররাক তার ছেলেকে কুরআন শিক্ষা দেয় এমন একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন। একদিন তাঁর ছেলে ফ্যাকাশে মুখে স্কুল থেকে ফিরল। আবু বকর রাহ. জিজ্ঞেস করলেন তার কি সমস্যা হয়েছে। সে উত্তর দিল, "ওহ্, বাবা। আজকে স্কুলে আমাদের নিম্নলিখিত আয়াতটি পড়িয়েছে।"

"তুমি যদি আল্লাহকে অবিশ্বাস কর তাহলে কেয়ামতের দিন, যেদিন শিশুদের সব চুল সাদা হয়ে যাবে। সেদিনের মুখোমুখি তুমি কি করে হবে?" (মুজাম্মিল, ৭৩:১৭) যখন আমি এই আয়াতটির অর্থ এবং সতর্কবাণী অনুধাবন করলাম, তখন নিজের ভেতরে এক গভীর সম্ভ্রম জেগে উঠল এবং আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

এর অনতিকাল পরেই তাঁর শিশুপুত্রটি মারা গেল। আবু বকর রাহ. প্রায়ই তার কবর জিয়ারত করতে যেতেন এবং মনে মনে বিলাপ করতেন এই ভেবে যে, "কতদিন ধরে আমি আল্লাহর কালাম পড়ছি, কিন্তু, হায়! আমি কি দূর্ভাগা যে আমি আমার পুত্রের মত করে এই আয়াতটির সারকথা অনুধাবন করতে পারিনি।"

সত্যিকারার্থে, কুরআন এমন একটি শক্তিশালী সমুদ্রের মত যারা তা পাঠ করে তাদের শিশুর মত সরল হৃদয়কে এই পবিত্র গ্রন্থ গ্রাস করে। কুরআন আল্লাহর নাযিল করা শেষ কিতাব। এটি পাঠ করা মানে সর্বোকৃষ্ট পন্থায় আল্লাহর প্রার্থনা বা ইবাদত করতে পারা। নামাযের সময় কুরআন পাঠ করাটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি নামাযের সময় এর কিছু অংশ পাঠ না করা হয় তবে প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে পৌঁছায় না। অর্থ্যাৎ নামাযে কুরআন পড়া ফরজ। নামাযের অন্যান্য দরকারী অংশ যেমন সোজা হয়ে দাঁড়ানো কিংবা সিজদা দেয়া খুব কঠিন সময়ে বাদ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কিছুতেই কুরআন পাঠ বাদ দেয়া যাবে না।

একজন মুসলিম কুরআন পাঠ করলে কখনোই সেটাকে হালকাভাবে নেয়া যাবে না। তার উচিত নিম্নলিখিত আয়াতটি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করা- **"এবং কুরআন, ধীর, পরিমিত, ছন্দেবদ্ধ সুরেলা কণ্ঠস্বরে তেলাওয়াত কর।"** (মুযাম্মিল, ৭৩:৪)

কুরআন আরও উপদেশ দেয় যে, আল্লাহর বাণীগুলো যত্ন সহকারে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। যেমন- **"যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তা যেন গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা হয় এবং তোমার মনের শান্তি ধরে রেখো যাতে করে তুমি আল্লাহর করুণাধারায় সিক্ত হতে পারে।"** (আ'রাফ, ৭:২০৪)

তেলাওয়াতের সময় নিশ্চুপ থাকলে কুরআনের বাণীগুলো বোঝা যায় এবং এই অনুধাবন মানুষকে জ্ঞানের নিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করে। এর ফলে স্বর্গীয় করুণাকে নাগাল পাওয়া যায়। নবীজিও এই প্রেক্ষিতে একটি ভাল উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসুদকে কুরআন তেলাওয়াত করতে বলতেন এবং শুনতে শুনতে গভীর শ্রদ্ধা এবং আধ্যাত্মিক পরমানন্দে নবিজীর কান্না চলে আসতো।

একইভাবে সন্তানদের সুরেলা কণ্ঠস্বর এবং সঠিক উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পারা পিতা-মাতার জন্য পরম সুখকর একটি অনুভূতি। যখন তারা আর ছোটটি

থাকবে না তখন এই তেলাওয়াত তাদেরকে ধার্মিক মুসলিম হয়ে ওঠার দিকে পরিচালিত করবে।

পিতা-মাতার দিকে ভালবাসা এবং সম্মান বা শ্রদ্ধা একটি শক্তিশালী স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু তার থেকেও শক্তিশালী সন্তানদের জন্য পিতামাতার ভালবাসা। এই আবেগ বাকী সব অনুভূতিকে ছাড়িয়ে যায়। অতএব, কুরআন আমাদের সতর্ক করে দেয় যাতে করে সন্তানদের প্রতি আমরা পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনে অবহেলা না করি। যদি পিতা-মাতা নিজেদের সন্তানদের ইসলামিক অনুশাসন অনুযায়ী শিক্ষা দেন তবে তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা পরিগণিত হবে; নচেৎ তারা তাদের জন্য বিপর্যয় রূপে গণ্য হবে। যে সমস্ত পিতা-মাতা সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে নবজি সা. নিম্নলিখিত বার্তাটি প্রেরণ করেছেন, “যারা কুরআন পাঠ করে সেই সমস্ত সন্তানদের পিতা-মাতাদের নূরের মুকুট এবং নূরের পরিচ্ছদ দ্বারা সজ্জিত করা হবে এবং তাদেরকে জান্নাতের বুরাকে চড়ানো হবে। ফেরেশতারা তাদের পাশে ঘুরাফেরা করবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।”

তাদের এই ভাষায় ডাকা হবে, *“এরা হলো নিজ শিশুদের কুরআন শেখানোর বিষয়ে গুরুত্বদানকারী পিতা মাত।”* (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ১৫৫)

প্রতিটি বিবাহিত দম্পতির কামনা থাকে সন্তান জন্ম দেয়ার। সন্তান নেয়াটা একজন ব্যক্তির শক্তিশালী স্বাভাবিক তাড়না। যদি কেউ ইসলামিক অনুশাসন অনুযায়ী তাদের সন্তানদের বড় করে তোলার গুরুভার অনুধাবন করতে পারে, তবে তারা দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে এবং দায়িত্বের অদম্য একটি বোধ তারা অনুভব করবে। ইসলামিক ধারায় সন্তানদের গড়ে তোলার প্রভাব হল, স্রষ্টার স্বর্গীয় ইচ্ছাকে মান্য করা। কেননা তিনি মানবজাতিকে তার উপাসনার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করে তাহলে তার কাজ এবং পরিবারের উপার্জনকারী হিসেবে সে যে সমস্ত পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হয় এসবই ইবাদত এবং তার পাপের ক্ষমা হিসেবে কাজ করে। তারা তাদেরকে নরকের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের সন্তানেরা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান বিনিয়োগ এবং আমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সবচে’ বড় আর্শীর্বাদ। অতএব সমস্ত রকম বিপদ থেকে তাদেরকে আমাদের রক্ষা করা কর্তব্য। বিশেষত আধ্যাত্মিকভাবে তাদের পরিপুষ্ট করা আমাদের দায়িত্ব। এমনকি অন্যান্য প্রাণীরাও তাদের ছানাদের ভীষণ দুঃসাহসিকতার সাথে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকে। সাধারণত মা মুরগীরা ভীরু প্রাণী হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের ছানাদের জীবন হুমকীর মধ্যে পড়লেই তারা অসাধারণ হিংস্র আচরণ করে থাকে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কিভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের ক্ষতি এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারি? তা করতে পারি, তাদের ভাল ভাল খাবার খাইয়ে নাকি পুষ্টিকর খাবার দিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করার মাধ্যমে? আমাদের সন্তানদের যে স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রয়োজন তা হল, আধ্যাত্মিক খাদ্য অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ভালবাসা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা। এভাবে তারা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা স্বেচ্ছায় এবং সুখকরভাবে পালন করতে পারবে। অন্যথায় তারা নামাজ অনিয়মিত এবং কোনরকম সন্তুষ্টি ছাড়াই পড়বে। এটা দুঃখজনক যে, কোনো কোনো মুসলিম তাদের সন্তানদের ধর্ম এবং কুরআনের শিক্ষা দেয় না। তাদেরকে কুরআনের আলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এটা সবচে' সম্ভাব্য অন্ধকার যা আমাদের সন্তানদের মনে ভবিষ্যতে ছাপ ফেলে।

আমাদের সন্তানদের পাত্র পাত্রী পছন্দ করার ব্যাপারেও আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। সম্ভাব্য বউ বা বর নির্বাচনে আমাদের প্রথম যে বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা হলো, তারা ইসলাম সম্মতভাবে বেড়ে উঠেছে কিনা এবং তারা ইসলাম চর্চা করে কিনা। অনৈসলামিক ভিতের উপর যেসব পরিবার গড়ে ওঠে তাদের সাথে জীবন গড়লে, বিবাহ বিচ্ছেদ অনিবার্য্য।

সংক্ষেপে, আমাদের অবশ্যই সন্তানদের বর্তমান সমাজের অশুভ দিক যেমন, রাত করে বাড়ী ফেরা, সময় এবং অর্থের অপচয় করা, অনৈতিক চলচ্চিত্র দেখা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করতে হবে। এসবের পরিবর্তে তাদের হৃদয় অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর নবী এবং আল্ল-াহর ওলীদের জন্য প্রেম দ্বারা পরিপূর্ণ করতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই খাঁটি হৃদয়ের অধিকারীরা আধ্যাত্মিক পথে অগ্রগতি সাধন করতে পারবে। এই উপায়ের প্রায়োগিক দিকগুলো হল কুরআন তেলাওয়াত উপভোগ করবে। স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে। ধর্মের প্রতিটি খুঁটিনাটি দিক খুব যত্নের সাথে অনুসরণ করবে। কারণ ভালবাসা ছাড়া, নামাজ এবং অন্য ইবাদতও ফলপ্রসু হয় না।

এছাড়াও সমাজের সমস্যাগুলোর সমাধান একমাত্র ইসলামের নৈতিক ব্যবস্থাপনায়ই সম্ভব। ধর্ষন এবং এই ধরনের সমাজের অন্যান্য সব অসুস্থ্যতা ইসলাম ধর্ম অনুসরণের মাধ্যমেই সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভব। এই ধরনের অপরাধ তারাই করে থাকে যারা নিজেদের হীন আকাঙ্খাগুলো নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। অন্য আরেকটি বড় সমস্যা হল, স্বার্থপরতা এবং বস্তুবাদ। এগুলোও ইসলাম দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা যায়। কেননা, ইসলাম সবসময় অন্যের স্বার্থ এবং চিন্তা ভাগ করে নেয়ার নির্দেশ দেয়। ধর্ম অনুপস্থিত থাকলেই বস্তুবাদ মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠে। অতএব, বস্তুবাদ শুধু জীবনের একটা দর্শনই নয় বরঞ্চ মানবজাতির অবক্ষয়ের একটা বহি:প্রকাশই বটে।

আমাদের সমাজে আজকাল এমন অনেক অবিশ্বাসী আছে, যারা তাদের বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার করে অথবা তারা তাদের পশু ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অথবা কোথায় থামতে হবে তা মানে না। যেহেতু তারা ধর্মীয় বাস্তবতাকে বুঝে না তাই তারা অস্তিত্বকেই অমূলক বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কুরআন অবিশ্বাসীদের আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং আল্লাহ কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতার উত্তরে বলে, **"মানুষেরা কি দেখে না যে আমরাই তাদেরকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি? তথাপি দেখ! সে প্রকাশ্য প্রতিপক্ষ হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে!"** (ইয়াসিন, ৩৬:৭৭)

এই সব অবিশ্বাসীরা ইসলামী বাস্তবতাকে গ্রহণ করে না কারণ তাদের হৃদয় মৃত। যখন কোন বিশ্বাসী তাদের ইসলামী দাওয়াত পাঠায় তখন তারা বলে, "আমরা বিজ্ঞান এবং যুক্তির যুগে বাস করছি এবং আপনি যা বলছেন তা পুরোনো আমলের গল্প, এগুলো কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।" এ ধরনের দাবীর ক্ষেত্রে কুরআন বলে যে, **"যখন তাদের বার্তাবাহকেরা পরিষ্কার আয়াত তাদের জন্য নিয়ে আনেস তখন তারা এ ধরনের জ্ঞানে আহলাদিত হয়। এজন্য যে তা তাদের আগেই ছিল, কিন্তু যেগুলোকে তারা ব্যঙ্গ করেছিল সেগুলোই তাদের চারদিক ঘিরে আছে।"** (মু'মিন, ৪০:৮৩)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যা আমরা আমাদের সন্তানদের দিতে পারি তা হল, তাদের এমন শিক্ষা প্রদান করা যাতে করে তারা শয়তানের হাত থেকে পরকালের মুক্তি ছিনিয়ে আনতে পারে। আমাদের অবশ্যই তাদের ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করতে দেয়া উচিত। দূর্ভাগ্যবশত পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ ইসলামিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর অভাবে বন্ধ হওয়ার পথে। অধিকাংশ পিতা-মাতাই তাদের সন্তানদের স্কুল নির্বাচনের আগে টাকা-পয়সার হিসাব করেন এবং ফলস্বরূপ এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই ইসলামিক বিদ্যালয়ে তাদের ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। তৎসত্বেও যদি আমাদের সন্তানেরা যথাযথ ইসলামিক শিক্ষা লাভ করতে পারে তাহলেই নৈরাজ্য, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অপরাধ প্রবণতা- ইত্যাদির মত বর্তমানের সামাজিক ব্যাধির সমাধান আমরা করতে পারবো। কুরআনই একমাত্র এই ব্যাধিগুলোকে নিরাময়ের শক্তি রাখে। আল্লাহ কুরআনে বলেন, **"আমরা কুরআন নাযিল করেছি তাদের জন্য যারা বিশ্বাসী। এ কারণেই তাদের আরোগ্য এবং আল্লাহর করুণার উৎস কুরআন। বিচারকারীদের জন্য কুরআন ক্ষতির পর ক্ষতি করা ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনে না।"** (ইসরা, ১৭-৮২)

আর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"দুনিয়া ও আসমানের সব সম্পদ আল্লাহর নিজস্ব; কিন্তু ভণ্ডরা তা বুঝে না।" (মুনাফিকুন,. ৬৩-৭)

অতএব পার্থিব সংশিষ্টতাগুলোকে আমাদের অগ্রাধিকার দেয়া উচিত নয় বরং পরকালে আমাদের সন্তানদের কী করে স্বর্গবাস হবে তা নিশ্চিত করাকেই আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটা মুসলিম উম্মাহর দুর্বলতা যে, অনেকেই ইহজাগতিক মোহের কারণে তাদের সন্তানদের শিক্ষার সঠিক পথ অনুসরণে বাধা দেয়। ইতিহাস সাক্ষী, যারা আল্লাহর প্রেরিত নবীদের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বস্ত তারাই ইহজগতে সফলতা এবং একই সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করতে পেরেছে।

নবীজি আমাদের আরও জ্ঞাত করেন যে, কোনো কোনো জাতিকে আল্লাহ উন্নত করেছেন কারণ তারা কুরআন অনুসরণ করে এবং কোনো কোনো জাতিকে ধ্বংস করেছেন কারণ তারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করেছে। (মুসলিম, ইবনে মাযাহ্)

এই পৃথিবীকে একটা বিশাল খাবারের টেবিলের সাথে তুলনা করা যায়। যার উপরে থরে থরে মুখরোচক এবং চমৎকার সব খাবার সাজানো আছে। যা আল্লাহর দুইটা গুণের বহি:প্রকাশ, পরম দয়ালু এবং পরম করুণাময় (রাহমান এবং রাহীম)। আমাদের এই পৃথি বীতে পাঠানো হয়েছে। আমরা অংশ গ্রহণ করছি এবং এই ভোজসভার সুস্বাদু খাদ্য থেকে লাভবান হচ্ছি। এ সবই মহান আল্লাহ তা'আলার মহিমা। একদিন এই ভোগসভা ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। এবং একে ঘিরে আমাদের আচরণ সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হবে। এই মৌলিক সত্যকে যেন আমরা অগ্রাহ্য না করি। এর অর্থ আমাদের আচরণবিধি এবং গৃহস্বামী অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশিত আদব-কায়দা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আমাদের উচিৎ খাওয়ার সঠিক আচরণ মেনে চলা এবং খাবারগুলো লুট না করা। প্রয়োজনাতিরিক্ত না খাওয়া। আল্লাহর মহানুভবতার কারণে এই টেবিলে খাওয়ার জন্য সবারই স্থান দেয়া হয়েছে। সেটা একজন অবিশ্বাসী অথবা একজন পথহারা বা একজন খাঁটি বিশ্বাসীই যেই হোকনা কেন। একদিন আমাদের সবাইকে কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমরা আচরণ অনুযায়ী পুরস্কৃত বা শাস্তি প্রাপ্ত হবো। পরকালে নিজ কর্মের জন্য জবাবদিহি করার আগেই এই দুনিয়াতে নিজের বিবেকের কাছে আমাদের জবাবদিহি করা উচিত।

শেষ বিচারের দিন কোন সাধারণ দিন না। কুরআন এই দিনটাকে এভাবে বর্ণনা করে, **"আমরা শুধুমাত্র সেদিনকে ভয় করি, যেদিন আমাদের প্রভুর ভ্রু কুঞ্চন এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের দুর্দশা আসবে।"** (ইনসান, ৭৬:১০) এবং সেদিন মানুষ বলবে, **"আশ্রয় কোথায়?"** (কিয়ামাহ্, ৭৫:১০)

আল্লাহ মানবজাতির জন্য তাঁর অপরিসীম দয়ার কারণে সেদিনের ভয়ানক বিপদ এবং বিষাদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন যাতে করে আমরা পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারি। **"হে বিশ্বাসী! নিজেকে এবং তোমার পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর যার জ্বালানী মানুষ**

এবং পাথর। যার উপরে কঠোর এবং অনমনীয় ফেরেশতাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সেসব ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশ কার্যকর করা থেকে পিছিয়ে যায় না। বরঞ্চ নিখুঁতভাবে ঠিক তাই করে যা তাদের আদেশ করা হয়েছে।" (তাহরীম, ৬৬:৬)

আল্লাহর কথাই সর্বশ্রেষ্ঠ কথা। এবং নবীজির দিকনির্দেশনাই সবচে' উত্তম দিকনির্দেশনা। পিতা-মাতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সবচে' মূল্যবান সম্পদ হলো কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান এবং কুরআনের অনুশাসনগুলো সম্পর্কে শিক্ষা লাভ।

আল্লাহ যেন আমাদের এমন হৃদয়ের অধিকারী করেন যে হৃদয় তাঁকে ভয় এবং তাঁর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তাঁকে তারা প্রত্যক্ষ করছে।

আল্লাহ্ যেন আমাদের কুরআন এবং নবীজিকে অনুসরণ করার শক্তি দেন। যা আমাদের সফরের শুরুর বিন্দু যার গন্তব্য স্বর্গ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের মানসিকতায় বলীয়ান হয়ে আমরা যেন নবী মুহাম্মাদের সা.-এর শ্রেষ্ঠ নৈতিকতা অর্জনের পথে চলাটাকে আল্লাহ যেন আমাদের জন্য সহজ করে দেন।

আমীন!

ইহসান এবং মুরাকাবা

নবীজি ইইসানকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন, "এটা হল আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা যাতে মেন হয় তাঁকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। যদি তাঁকে দেখা নাও যায় কিন্তু তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চিত।"

তাসাউফ বা ইসলামিক ধ্যানের অর্থ হল, সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতিতে নিজের সত্ত্বা সম্পর্কে সচেতন থাকা। শুধুমাত্র আল্লাহর সেই সব বান্দা যাদের এই সচেতনতার বোধ আছে তারাই স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে পারে। প্রতিটি সত্ত্বা এই বাস্তবতার ছায়ায় বানস করে যে, আল্লাহ খুব কাছের কেউ। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, **"আমরা তাদের ঘাড়ের মোটা শিরা থেকেও বেশী নিকটে।"** (ক্বাফ, ৫০:১৬)

এই সচেতনার পর্যায়কেই ইহসান বলে। এই সচেতনতাকে ধরে রাখার জন্য সদা সতর্ক প্রহরা দরকার। যে ব্যক্তি এই পর্যায়ে পৌঁছায় সে কখনোই এ কথা ভুলে না যে, সে সব সময় আল্লাহর নজরদারীতে আছে। এবং তার সব কাজ এবং চিন্তা তাঁর জানা অছে। এই অবস্থানে থাকতে পারাটা পাপের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বর্মের মত। সেই মানুষ কখনোই পাপ কাজ করতে পারে না যার হৃদয় থেকে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, "হে আমার প্রভু।"

যদি কোন ব্যক্তি বুঝে যে, সে অন্যদের নজরদারীতে আছে তবে সে প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণত পাপ কাজ করা থেকে দূরে থাকে। এমনকি যদি অন্যান্যরা তাকে শাস্তি নাও দেয় তবুও সে অন্যায় থেকে দূরে থাকে। যে ব্যক্তি ইহসানের অনুভূতি সব সমসয় নিজের মধ্যে লালন করে এবং স্রষ্টার নজরদারী উপলব্ধি করতে পারে সে ধরনের মানুষ কি সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে? একেবারেই না। এই পরিপ্রেক্ষিতে নবীজির সাহাবীদের সময়কার একটা চমৎকার উদাহরণ এখানে দেয়া হল-

একদিন রাতে খলিফা উমর রা. অভ্যাস অনুযায়ী মক্কার রাস্তায় টহল দিচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ এক জায়গায় থামলেন। কেননা তার কানে এসেছিল একটি মেয়ে এবং তার মায়ের আলোচনা। মা তার মেয়েকে বলছে,

"হে আমার কন্যা! যে দুধ আমরা আগামীকাল বিক্রি করবো তাতে পানি মেশাও।" মেয়েটি তার মাকে উত্তর দিল,

"হে আম্মাজান! দুধে পানি মেশাতে খলিফা কি নিষেধ করেননি?" মা মেয়েকে বকা দিল,

"ওহে আমার কন্যা! পানি মেশালে খলিফা কি করে জানবেন?" কিন্তু মেয়েটি যে আল্লাহকে ভয় করে। মায়ের দাবী মেনে নিতে পারল না বরং বলল,

"হে আম্মাজান! চলুন ধরা যাক খলিফা জানতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ? আপনি কি মনে করেন তিনি জানতে পারবেন না? এই প্রতারণা মানুষদের কাছ থেকে গোপন করা সহজ কিন্তু এটা সর্বত্র বিরাজমান মহান আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করা সম্ভব না। আল্লাহ স্রষ্টা এবং সমস্ত জগতের রিজিকদাতা।"

সতী মেয়েটির কথা উমর রা.-কে খুব স্পর্শ করল। কেননা মেয়েটি আন্তরিকভাবেই আল্লাহকে ভয় করে। মেয়েটির কথা তাঁকে এত গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল যে, তিনি তাঁর ছেলের বউ করে তাকে ঘরে তুললেন। এই পবিত্র বংশতেই উমর বি. আব্দুল আজীজ রহ. জন্ম গ্রহন করেন। যিনি ইসলামের ইতিহাসে পঞ্চম খলিফা হিসেবে বিবেচিত।

এখানে প্রধান বিষয় হল, সর্বত্র আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকার মাধ্যমে প্রত্যেকের নজরদারীর মধ্যে থাকা উচিত। কুরআনে বলা হয়েছে, **"এবং যেখানেই তুমি থাকো না কেন তিনি তোমার সাথে আছেন এবং তুমি যাই কর না কেন আল্লাহ সেই বিষয়ে খুব ভালভাবে জ্ঞাত।"** (হাদীদ, ৫৭:৪)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সবসময় তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি প্রাণীর সাথে থাকেন। তাঁর সৃষ্টির প্রত্যেকের কর্মপরিধি সম্পর্কে তিনি অবহিত। তিনি তাদের উপর নজর রাখেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে অসচেতন, এই চিন্তা করার অর্থ তাঁকে দূর্বল ভাবা। অথচ তিনি সকল দুর্বলতার উর্ধ্বে। যদি মানুষ এই বাস্তবতা সম্পর্কে জানে না। মানুষের তা জানা উচিত। এই অনুভূতি থাকলেই মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। আল্লাহর সাথে একত্রিত থাকার অনুভূতি, মানুষকে সবসময় এক ধরনের সচেতনতায় রাখে। সে কারণে পার্থিব আবর্জনা থেকে সে নিজেকে সহজেই পরিশুদ্ধ করতে পারে।

আল্লাহর এক ওলী বলেন, "রেলগাড়ী ধরতে ব্যর্থ না হওয়ার ভয়ে কোন ভ্রমণকারীই রেল স্টেশনে ঘুমায় না। এই পৃথিবীটাও পরকালে যাওয়ার পথে রেল স্টেশনের মত। ঠিক ট্রেনটা ধরার জন্য মানুষকে জেগে থাকতে হয়।"

আল্লাহর সাথে একত্রিত হওয়ার অনুভূতি মানুষকে সম্ভ্রমের সাথে তাঁর সাথে নৈকট্যকে অনুপ্রাণিত করে। বিশ্বাসীদের তার কাছাকাছি থাকার অনুভূতি, সান্তনাও দেয়। পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি এই নৈকট্যের ব্যাখ্যা দেয় এভাবে, **"তুমি কি দেখতে পাও**

না, আসমানে ও জমিনে যা কিছুই আছে সেসব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত? কোথাও তিনজনের গোপন পরামর্শ সভা হলে তার মধ্যে চতুর্থজন আল্লাহ। এমনকি পাঁচজন থাকলে, ষষ্ঠতম হলেন আল্লাহ। এর থেকে বেশীও না কমও না। কিন্তু তিনি সব সময় তাদের সাথে থাকেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন; অতঃপর তিনি তাদের জানাবেন পুনরুত্থান দিবসে তারা কি করেছিল; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত।" (মুজাদিলাহ্, ৫৮:৭)

উমর রা. তাঁর খেলাফতের সময়ে মু'আয রাদি.-কে বানু কিলাব নামের একটা গোত্রের কাছে মিশনে পাঠালেন। মিশনের উদ্দেশ্য ছিল, প্রয়োজনীয় মূল্য পরিশোধ করা, পণ্য খালাস করা এবং ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ গরীবদের মাঝে দান-খয়রাত হিসেবে বিলিয়ে দেয়া।

মু'আয রাদি. তার প্রতিটি মিশন খুব যত্নের সাথে সম্পন্ন করতেন এবং কিভাবে তিনি মানুষের হৃদয় জয় করতেন সেই সব চমৎকার গল্প করতেন। ফিরে আসার পর তার পরনে একটি মাত্র কাপড় থাকতো যা দিয়ে তিনি তার গলা, সূর্য এবং ধূলা দিয়ে রক্ষা করতেন।

একদিন তার পত্নী তাকে জিজ্ঞেস করলো, "যাদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় সে ধরনের লোকদের অর্থ-কড়ি দেয়া হয় এবং পরিবারের জন্য উপহার সামগ্রীও পাঠানো হয়। আমাদের জন্য তোমার সেই উপহার সামগ্রী কোথায়?" মু'আয উত্তর দিলেন, "আমি কি নিলাম এবং কি দিলাম তার হিসাব রাখার জন্য একজন ইন্সপেক্টর সব সময় আমার সাথে ছিল।"

তার বউ তার উপর রেগে গেল এবং বলল,

"নবীজি তোমাকে বিশ্বাস করতেন এবং আবু বকর রা.-ও তাই করতেন। এখন উমর রা.-এর সময়ে তিনি তোমার সাথে একজন ইন্সপেক্টরকে পাঠিয়েছেন। তিনি কি তোমাকে বিশ্বাস করেন না?"

তার এ কথাগুলো প্রথমে উমর রাযি.-এর বউ এর কানে গেল এবং তারপর উমরের কর্নগোচর হল। উমর মু'আয রাদি.-কে ভৎর্সনার সুরে জিজ্ঞেস করলেন,

"এসব কি? কেন তুমি বলেছ যে একজন ইন্সপেক্টরকে তোমার সঙ্গে পাঠানো হয়েছে? তুমি কি মনে করনা যে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি?

মু'আয রাযি.-এর উত্তর দিলেন, হে বিশ্বাসী কমান্ডার! এটা আমার পত্নীকে বলা একটা গল্প মাত্র। আসলে যে ইন্সপেক্টরের কথা আমি বলেছি। তিনি আপনি নন। তিনি ছিলেন আল্লাহ। যে সেবা আমি দিয়েছি তার পরিবর্তে কোন কিছুই আমার নেয়ার ইচ্ছা হয়নি..."

উমর রা. মু'আধ কি বলতে চাইছে তা বুঝলেন। তিনি বুঝলেন যে সে ধন সম্পদের ভিখারী নয়। অত:পর তিনি তাকে তাঁর নিজস্ব কোষাগার থেকে উপহার দিয়ে বললেন,

"এগুলো তোমার পত্নীর কাছে দাও এবং তাকে শান্ত করো!"

এই গল্প থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হল, আমাদের নজরদারীর মধ্যে থাকা উচিত। আমাদের সব সময় সচেতন থাকা উচিত যে, আমাদের প্রভু আমাদের উপর নজর রাখছেন। যারা দাতব্য সংস্থায় কাজ করে তাদের কাজের বিনিময়ে অর্থ-কড়ি দেয়াটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তথাপি মু'আয রাদি.-এর মানসিকতা এক মহান মূল্যবোধের প্রতীক। যারা দাতব্য সংস্থায় কাজ করে তারা বরাদ্দ সময়ের বেশিও কাজ করে। যেমন মু'আয রাযি. করেছিলেন। এই ধরনের লোকদের নিজের অহংকারবোধ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মাঝে মাঝে নিজের কাছে জবাবদিহি করা দরকার। তাদের উমর রা.-এর নিম্নলিখিত সাবধানবাণী স্মরণে রাখা উচিত, "হাশরের দিনে জবাবদিহি করার পূর্বেই নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি কর।"

নবীজির নিম্নলিখিত কথন আমাদের আল্লাহকে স্মরণ এবং তার প্রতিনিয়ত নজদারীর গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। *"আল্লাহকে ভুলে গিয়ে বাজে কথায় তোমার সময়ের অপচয় করো না; কেননা এই ধরনের কথা আল্লাহকে বিস্মিত করে। মনকে মেরে ফেলে এবং এ ধরনের মানুষ আল্লাহ্ থেকে সবচে' দূরে থাকে।"* (তিরমিযী, যুহদ, ৬২)

সুতরাং, আমাদের সারাদিন নজরদারির মধ্যে থাকা উচিৎ। তা সে ভোর হওয়ার আগেই হোক অথবা খুব সকালে ফজরের নামাযের সময় যখন আমাদের ঘুম ভাঙে তখন। অথবা দিনের বেলায়ই হোক। সারাদিন নজরদারির মধ্যে থাকার জন্য সময় অবশ্যই একটা আদর্শ। এই ধরনের মানুষ যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি জয় করার জন্য ভোর হওয়ার পূর্বের সময় এবং সারাদিন ব্যবহার করে, মনে করা হয়ে থাকে যে তারা ঐশ্বরিক আনন্দদায়ক অবস্থায় থাকে। যে এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারে, তার মন থেকে সমস্ত নেতিবাচক দিকগুলো দূর হয়ে যায়। এটা অনেকটা অতসী কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করিয়ে কাগজ পুড়ানোর মত; এই নেতিবাচক দিকগুলোর জায়গায় স্থান করে নেয় ইতিবাচক প্রকৃতি যা স্বর্গীয় গুণের মাধ্যমে আসে। এই পরিধির মধ্যে পড়ে মানুষ ভালবাসা, প্রাচুর্য্য, করুণা, দয়া এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ক্ষমার অনুভূতি উপভোগ করে। আর স্রষ্টার প্রতি যথোচিত বশবর্তিতার সাথেই তা হয়ে থাকে। এই ধরনের মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট ডাকে তাদের অহংকারের তত্ত্বাবধান করতে পারে। সে তখন তার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে এই পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বের কারণ খোঁজার চেষ্টা করে। এবং শয়তানের ফাঁদে না পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাদের হৃদয় সবসময় তাদের আল্লাহর সাথে থাকে। কুরআনে বলা

হয়েছে, **"জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষ এবং তার হৃদয়ের মাঝখানে চলে আসেন।"** (আনফাল, ৮:২৪)

আল্লাহর যে বান্দা এই শ্রেণীতে পড়ে সে আল্লাহতে বিশ্বাসের সত্যিকার স্বাদ উপভোগ করতে পারে। তাদের প্রভু তাদেরকে সরাসরি অর্থাৎ কোন মাধ্যম ছাড়াই জ্ঞান প্রদান করে থাকেন। এই জ্ঞানের মাধ্যমে তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর পৃষ্ঠাগুলো পড়তে সক্ষম হতে শুরু করে। তারা অস্তিত্বের রহস্য এবং প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করতে পারে। কুরআনে আছে: **"অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন।"** (বাকারাহ্, ২:২৪২)

এটা সেই নজরদারির অনুভূতি যা ইউসুফ নবীকে একজন প্রলুব্ধকারী সুন্দরীর নারীর ফাঁদে পড়া থেকে রক্ষা করেছিল। তিনি সেই ফাঁদ থেকে 'ইহসান' এবং 'মুরাকাবা' বা নজরদারির মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছিলেন। সুতরাং, আল্লাহর ধ্যানের অনুভূতি মানুষের হৃদয়ে স্থাপন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিৎ। আর এই অনুভূতিই তাকে তার প্রভুর সাথে মিলতে সক্ষম করে। অন্যথায়, শুধুমাত্র 'ইহসান' এবং 'মুরাকাবা' এ দুটো শব্দ উচ্চারণ হৃদয়ের জন্য কোন কাজে আসে না। ভালবাসার অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী সত্ত্বাকে শ্বাশ্বত সত্ত্বার দিকে টেনে নিয়ে যায়। একবার যদি এই ভালবাসার অনুভূতি উন্নীত হতে পারে। এই অবস্থান বৈষয়িক বস্তুকে হীন জ্ঞান করে। সেগুলোর প্রকৃত মূল্য তখন নিহিত থাকে সেগুলো বিলিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়েই। আল্লাহর প্রতি ভালবাসার জন্য হৃদয়ের জ্বালানী হল একসারি ভাল কাজ; এই ধরনের কাজ তার প্রেমাস্পদ আল্লাহকে আনন্দ দেয়।

একটি নদী যখন সাগরে মিশে যায়, তখন এর নিজস্ব স্রোত এবং রং সাগরেই বিলীন হয়ে যায়। এটা আর নদী থাকে না। 'ইহসান'-এর ক্ষেত্রেও এটাই সত্য। এটা আল্লাহতে ব্যক্তির অবিলুপ্তি মনুষ্য আত্মার মধ্যে প্রভুর গুণাবলীর প্রকাশ।

ইহসানের আরেক অর্থ হলো, পরোপকার। অতএব, আমরা বলতে পারি বিশ্বাসের মূল হলো পরোপকার। একাগ্রতা বা আন্তরিকতা, দয়া এবং প্রার্থনায় ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আচার অনুষ্ঠান এবং অভিমন্ত্রন পরোপকারের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। ইবাদতের প্রতিটি আচরণ একাগ্রতার শাখা থেকে বেরিয়ে আসা অঙ্কুর। দয়ায় মধ্যে দিয়ে তা ফুল ফোটায় এবং অবশেষে ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার মধ্যে ফল-এ পরিণত হয়। সঠিক পথে থাকার অর্থ, প্রভুর সর্বত্র বিরাজমানতা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সে অনুযায়ী আচরণ করা। শুধু অন্য মানুষের সাহচার্য্য থাকার সময় নয়, বরঞ্চ যখন সে একা তখনও এবং এই বোধ নিয়ে থাকা যে স্রষ্টা তাকে সব সময় লক্ষ্য করছেন। তাসাউফ, তার সকল তত্ত্ব এবং চর্চা নিয়ে হৃদয়কে এই অবস্থানে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে। আল্লাহর ওলীরা তাদের পুরো জীবনকালে এই প্রক্রিয়ারই শিক্ষার্থী।

একদিন ওয়েস আল ক্বারনিকে তার মাতা জিজ্ঞেস করলেন: "হে আমার পুত্র। কিভাবে তুমি সারারাত ধরে ইবাদত করতে পারো?

ক্বারনি উত্তর দিলেন, "ও আমার প্রিয় মা। আমি খুব যত্নের সাথে আল্লাহর ইবাদত করি। আমার হৃদয় করুণাধারায় এতটাই সিক্ত হয় যে, আমি না ক্লান্ত বোধ করি, না আমার শারিরীক বোধগুলো কোন সাড়া দেয়। আমার মনেই হয় না যে রাত এত দীর্ঘ।"

তার মা তাকে প্রশ্ন করলেন, "ইবাদতে থাকে যাকে 'খুশু' বা আন্তরিক ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা বলে, তা আসলে কী?"

তিনি উত্তর দিলেন, "এটা হল, এমন একটা শারিরীক পর্যায় যখন শরীরে বলম গেঁথে দিলেও ব্যথা অনুভূত হয় না।"

এই প্রেক্ষিতে ইসলামের ইতিহাস থেকে আর একটি বিখ্যাত গল্প উদ্ধৃত করা গেল। একবার এক যুদ্ধে আলী রা. পায়ে বলম ঢুকে যায়। তার সতীর্থরা সেই বলম টেনে তোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু খুব বেদনাদায়ক হওয়ার কারণে তারা তা পারছিলেন না। তারপর আলী রা. বললেন, "আমাকে ইবাদতে মগ্ন হওয়ার সুযোগ করে দাও এবং তারপর তোমরা চেষ্টা কর।" তাঁর কথানুযায়ী তারা কাজ করল বেং তারা সহজেই বলমটি টেনে বের করে ফেলতে পারলো। তাঁর ইবাদত শেষ হবার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী করেছ?"

তারা উত্তর দিল, "আমরা ওটা টেনে বের করেছি।"

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, সেই সময় আলীর শরীরে জাগতিক কোন অনুভূতি ছিল না; বরঞ্চ তিনি সৎ এবং ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার সাথে ইবাদত করার দরুণ আধ্যাত্মিক আনন্দের দিকে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় নিবদ্ধ ছিল। এটা পারহিত এবং সতর্কতার একটি পরিস্কার এবং প্রাঞ্জল চিহ্ন।

আনন্দের সাথে ইবাদত করা এবং ক্লান্ত না হওয়া শুধুমাত্র ইহসানের অনুভূতি থাকলেই সম্ভব। যে হৃদয় ইহসানের কোন বোধ অনুভব করে না, সে প্রার্থনার সময় ক্লান্তি অনুভব করে। যদি এ ধরনের লোক ধনাঢ্য হয় এবং দান-খয়রাত পরিহার করে চলে, তার কারণ হল সেই ব্যক্তি বিশ্বাস করার আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা, আন্তরিকতা সহকারে দান-খয়রাত, আনন্দের সাথে রোজা এবং ভালবাসার সাথে হজ্ব পালন এসবই 'ইহসান'- এর ফল।

আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমেই শুধু 'ইহসান' এবং মুরাকাবা বা নজরদারির পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব। এই স্মরণ করার মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে হৃদয় এবং মস্তিস্কের সংযোগ

স্থাপন হয় এবং সেই সাথে ব্যক্তির ঈমানও মজবুত হয়। এই বাস্তবতার কারণেই যখন মূসা এবং হারুন আ.-কে ফেরাওদের কাছে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় তখন আল্লাহ বলেছিলেন: **"যাও তুমি ও তোমার ভাই আমার চিহ্ন নিয়ে এবং আমাকে স্মরণে রাখতে তোমরা কেউই শিথিলতা প্রদর্শন কর না।"** (তা-হা, ২০:৪২)

কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহর গুণগানের নির্দেশ আছে। নিম্নলিখিত আয়াতটি আল্লাহকে স্মরণ করার গুরুত্ব বুঝাবার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহকে স্মরণ করা হৃদয়ের উপর পালিশের মত এবং এটা মনের প্রশান্তির একটা প্রণালী। যেমন কুরআন বলে, **"দেখ! আল্লাহকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে কোন রকম সন্দেহ না থাকলে মন শান্তি খুঁজে পায়।"** (রা'দ, ১৩:২৮)

আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে স্মরণ করার মাধ্যমই হল একটি হৃদয়ের শান্তির জায়গা। এই ধরনের হৃদয় নিম্নলিখিত আয়াতে প্রকাশিত গোপনীয়তা সম্পর্কে সচেতন, **"এমন একটা দিন আসবে যেদিন ধন-সম্পদ অথবা পুত্র, কোনকিছুই কাজে লাগবে না। কিন্তু শুধুমাত্র সেই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে যে আল্লাহকে একটি সুস্থ হৃদয় নিয়ে হাজির হতে পারবে।"** (শু'আরা, ২৬:৮৮-৮৯) এই অবস্থান অর্জন করতে মানুষকে অবশ্যই অহংকারের বাধা অতিক্রম করতে হবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে এবং অনুতাপ, সততার সাথে ইহজাগতিক দাবী ত্যাগ, ধৈর্য্য এবং সতর্কতার মাধ্যমে পরিপক্ক হতে হবে।

আমরা ধর্মের সারসংক্ষেপ করতে পারি একে দুইটি দিকে ভাগ করার মাধ্যমে: বৈধ দিক, যা অনেকটা একটি দালানের স্তম্ভের মত। আন্তরিক ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম যেন ঐ স্তম্ভগুলোর উপর কারুকাজ। তাসাউফ এই দুইটি দিককে একীভূত করে প্রজ্ঞার সাহায্যে অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে। এটা নবীজির মে'রাজ শরীফে গমনের অলৌকিক সফরের আধ্যাত্মিক জানালা খুলে দেয়।

তাসাউফ মানে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে একাগ্রতা, দয়া, শ্রদ্ধা, সমর্পন, এবং ভালবাসার মত মূল্যবোধগুলো পালন কর। অন্যকথায়, এটা অনেকটা আল্লাহর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর জীবনের ২৩ বছরে ভাগ বসানোর মত। আগে যেমন বলা হয়েছে, তাসাউফ অর্থ, বিশ্বাসীদের প্রদত্ত আল্লাহর অনুশাসন অনুযায়ী আচরণ করা। যার মাধ্যমে নবীজির অনুসারী হওয়া যায়। এই আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, **"সুতরাং, সরল পথে দৃঢ় থাকো, যেমন তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।"** (হুদ, ১১:১১২) পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর নবীজির সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল।

এটা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, কুরআন প্রথম নাযিল হওয়ার পরবর্তী ২৩ বছর নবীজি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বহু দিন অভুক্ত থেকেছেন। তিনি জীবনকালে প্রথম

পত্নী বিবি খাদিজাকে এবং তাঁর চাচা হামজাকে, যিনি তাঁকে পৌত্তলিকদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ছয় সন্তানের মধ্যে পাঁচজনকেই হারিয়েছেন। তিনি এই সব দুর্দশাকে বিনীত সমর্পনের সাথে গ্রহণ করেছেন। নবীজি সা. বলেছিলেন, কুরআনের 'হুদ' নামক সূরার এই আয়াতটি তাঁকে বুড়ো করে দিয়েছে- *"সঠিক পথে চলা অব্যাহত রাখো যে নির্দেশ তোমাকে দেয়া হয়েছে..."।* (তিরমিযী, তাফসির, ৫৬/৬)

বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষা এবং অপেক্ষমান মনোবিক্ষেপ, যেমন অন্ধ আবেগের কারণে আল্লাহকে পাওয়া পথটি দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ। এই পথে চলতে হলে বিশাল দায়িত্বশীলতার দরকার। যা এত ভারী যে এমনকি নবীজির চুলও সাদা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর ওলীরা তাঁর নিখুঁত বান্দা হতে তাদের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষত: সীমাহীন স্বর্গীয় প্রকাশের সাথে একান্ত হওয়ার শক্তি তাদের নেই। যেমন, "হে প্রভু! আপনি আপনার যা প্রাপ্য সে অনুযায়ী দেয়ার জন্য আমরা আপনাকে যথেষ্ট ভাবে জানি না..." (মুনাভি, আলফাইযুল কাবির, ২য় খণ্ড, ৫২০)

এই বাস্তবতার আলোকে আমাদের উচিৎ 'ইহসান' এবং নজরদারির ব্যাপারে এসবের প্রতীক নবীজির অনুসরণে জীবন কাটানোর আগে আমাদের উপর স্রষ্টার সার্বক্ষণিক নজরদারির ব্যাপারে সচেতন হওয়া। তিনি কতটা ধৈর্য্যশীল ছিলেন এবং আমরা কতটা? তিনি কতটা সদাশয় এবং অনুগত ছিলেন এবং আমরা কতটা, তিনি প্রার্থনা, রোজা, দান-খয়রাত এবং বিশ্বাসের স্বীকৃতিতে কতটা আন্তরিক ছিলেন এবং আমরা কতটা? সঠিক ও সরল পথে চলতে তিনি কতটা নিবেদিত ছিলেন এবং আমরা কতটা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের আন্তরিকভাবে দিতে হবে। সংক্ষেপে, আমাদের নবীজির জীবনের সাথে এই সব প্রশ্নের তুলনার আলোকে নিজের জীবন সংগঠিত করতে হবে। নবীজি ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচে' আদর্শস্বরূপ এবং আমাদের ইহকাল ও পরকালের প্রধানতম সাক্ষী ও মধ্যস্থতাকারী।

'ইহসান' এবং মুরাকাবার পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য আমাদের অহংকার পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে হৃদয়কে তৈরী করা প্রয়োজন। যাতে হৃদয় স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আমাদের কাছে আত্মসমর্পন করতে পারে। আমাদেরকে সেসব লোকদের মধ্যে গন্য করা দরকার যাদের উল্লেখ এই আয়াতটিতে করা হয়েছে, **"যে অহংকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সত্যিকারার্থে সফলকাম।"** (শামস্, ৯১:৯)

নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো সতর্কতার সাথে পালনীয়,

- বৈধ বা হালাল উপায়ে অর্জন সম্পর্কে সতর্কতা
- অন্য মানুষের এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট অন্য প্রাণীদের অধিকার সংরক্ষণ

- ভোর হওয়ার আগের কয়েক ঘণ্টা আল্লাহর ইবাদত

- আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা এবং নিষেধ অনুযায়ী বিরত থাকা

- সামাজিক সেবামূলক কাজে দায়িত্বপালন

- আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করা

- সৎ এবং ধার্মিক ব্যক্তির সাহচর্য্যে থাকা

- কুরআনের বাণী সম্পর্কে স্পর্শকাতর হওয়া এবং কুরআন মেনে চলা

- হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহকে স্মরণ করা

- অনৈতিক আচরণ পরিহার করে চলা। যেমন, পরনিন্দা, অহংবোধ, স্বার্থপরতা, অমিতব্যয়ীতা, মিথ্যাচার, হিংসা, উচ্চাকাঙ্খা, ভণ্ডামী এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রবণতা।

- মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতিটি শ্বাসের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা

- নিঃসন্দেহে নবীজি মুহাম্মাদ সা. কীভাবে একজন ব্যক্তি 'ইহসান' এবং 'মুরাকাবা'র সাথে জীবন অতিবাহিত করবে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তাঁর পরে যাদের নাম আসে তারা হলেন, নবীজির উত্তরাধিকারী আল্লাহর ওলীরা। তাঁদেরও এক্ষেত্রে অনুসরণ করা যায়। বিশ বছর আগে বিগত মাহমুদ সামী রামাযানগলু এক্ষেত্রে সবচেয়ে স্মরণীয় উদাহরণ। তিনি 'ইহসান' এবং 'মুরাকাবা' দ্বারা সজ্জিত জীবন-যাপন করেছেন এবং তিনি এই পথেই তাঁর শিষ্যদের আলোকিত করেছেন। আমরা তাঁকে স্মরণ করছি এবং তাঁর জন্য আল্লাহর করুণা এবং মাধুর্য্য ভিক্ষা করছি।

আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, আমরা যেন জীবনকে সদাশয়তা এবং সতর্কতার সাথে পরিচালিত করতে পারি।

আমীন!

মানবজাতির বাস্তবতা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানবজাতির সেবার উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীকে তাঁর অফুরন্ত সওগাত দিয়ে পূর্ণ করেছেন (যাথিয়া, ৪৫:১৩)। এছাড়াও তিনি ঘোষণা করেছেন, পূর্ণতার এই নিয়ামতের পরিবর্তে মানবজাতিকে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হবে। জীবনের সাধারণ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বরিক নিয়ম এবং মানুষের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে স্বাধীনতা এবং দায়িত্ববোধের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ভারসাম্য স্থাপনের জন্য সমন্বয় সাধন করেছেন। কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানবজাতিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে এক যোগে কাজ করার আদেশ দিয়েছেন, **"এবং তিনি এই নভোমণ্ডলকে অনেক উপরে উন্নীত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ভারসাম্য লংঘন না করার জন্য তিনি সুবিচারের ভারসাম্য স্থাপন করেছেন।"** (রাহমান, ৫৫: ৭-৮)

তথাপি যারা এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের রহস্যময়তা সম্পর্কে অসচেতন তারা এই ঐশ্বরিক শৃঙ্খলা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে অপার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছেন তার সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে পারে না। কারণ তারা জাগতিক আনন্দ এবং পার্থিব বিষয়াদির সাথে অতিমাত্রায় সংশ্লিষ্ট। দূর্ভাগ্যবশত: এই ধরনের লোকেরা অসচেতনতা এবং অজ্ঞতার ফাঁদে পড়ে তাদের জীবনকে অপচয় করে। শুভ এবং অশুভ, মানুষের মনের এই দুইটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যেই মানবজাতির বাস্তবতার রহস্য লুক্কায়িত আছে। এই প্রবণতাগুলো মানুষকে দেয়া হয়েছে ঐশ্বরিক পরীক্ষার অংশ হিসেবে, যা বিকল্প বাছাই এবং বিচিত্র চরিত্রের শুভ বা অশুভের দিকে ঝুঁকে পড়ার মাধ্যমেই শুধুমাত্র সম্ভব। মানুষকে তার জীবনের প্রধান ঝোঁক শুভ প্রবণতাগুলোর দিকে প্রবাহিত করার জন্য তাদের মরমী এবং মননের শক্তিই যথেষ্ট নয়। যদি তা না হত তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানবজাতির প্রথম নবী হযরত আদম আ. সৃষ্টি করতেন না এবং তাঁকে ঐশ্বরিক সত্য প্রদান করতেন না। যা তাকে ইহকাল এবং পরকালের স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তি পাওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত করেছে।

প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির সমস্ত মরমী এবং মননশীল ক্ষমতা সহজেই হয় শুভ, নয় অশুভ প্রবণতা অর্জনের কাজে লাগানো যায়। যেমন ঐসব ক্ষমতার মধ্যে একটি হল, যৌক্তিক মন। এই মন অনেকটা উভয় দিকে ধারালো একটি তলোয়ারের মত যা পাপপূর্ণ বা নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন কাজ করতে পারে। শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব নয়। এরপরও এই একই মন মানুষকে জানোয়ারে স্তরেরও নিচে

নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অতএব মানুষের জন্য যুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রয়োজন। আসমানী কিতাবগুলোর দিক-নির্দেশনায় তা অর্জন কা সম্ভব। অন্যকথায় নবীদের অনুশাসন অনুসরণ করে আল্লাহ প্রদত্ত স্বর্গীয় বিধান দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি নিজের মনকে চালিত করে তবে সে ব্যক্তি সত্যিকারের শান্তি লাভ করতে পারবে। যদি তা না করে তবে সে বিপথগামী হবে। সুতরাং, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ীই মনকে পরিচালিত করা প্রয়োজন।

ইতিহাস জুড়ে দেখা যায়, অনেক উদ্ধত মানুষ অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে যুক্তিকে খুব কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছে। তারা তাদের কাজের ন্যায্যতা প্রত্যয়ন করে এই ধারনা দিয়ে যে, এই খারাপ কাজগুলো করাটাই সবচেয়ে যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মৌল সেনাপতি হুলাগু খান যখন বাগদাদ আক্রমণ করে তাইগ্রিস নদীতে চার লক্ষ মানুষের সলিল সমাধি ঘটায় তখন সে কোনরূপ বিবেকের দংশন অনুভব করেনি। ইসলামপূর্ব যুগে মক্কার লোকেরা কন্যা শিশুদের, তাদের হৃদয়-নিংড়ানো চীৎকার স্তব্ধ করে জীবন্ত কবর দিত তারাও তাদের কাজের জন্য কোনোরকম বিবেক দংশনে ভোগেনি। ফলে তারা এই ভয়ানক কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। এটা তাদের কাছে ছিল অনেকটা গাছ-কাটার মত; তাদের যুক্তি ছিল যে এটা করা তাদের বৈধ অধিকার।

এসব মানুষের মন এবং অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণায়মান চাকার মত তারা অন্য দিকে চলে গিয়েছিল। এই উদাহরণগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষ এমন একটা জীব যাদের দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন; তারা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রবণতাই ধারণ করে। যদি এই দিক-নির্দেশনা নবীজির নির্দেশিত পথ অনুসরণ করার কথা না বলতো তবে মানুষের শক্তিমত্তা তাকে বিপদগামী করতো। অর্থাৎ তাদের খুনীতে রূপান্তর করে এই চিন্তা দ্বারা বিভ্রান্ত করতো যে, তারা ঠিক কাজটিই করছে। দিক-নির্দেশনা ছাড়া একটি মন যেন বিবেকের উপর কালো মেঘের আবরণে ঢাকা যা তার সমবেদনা এবং দয়ার্দ্র অনুভূতিগুলোকে নির্বাসিত করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ যথাযথ পথ মানবজাতিকে দেখানোর জন্য যুগে যুগে নবীদের পাঠিয়েছেন এবং আমাদের এটা বুঝাবার জন্য যে, উপদেশ দিক-নির্দেশনা এবং তাদের উন্নীত করার জন্য মহান ব্যক্তিদের মানুষের কতখানি প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের আশীর্বাদ মুহাম্মাদ সা.-এর পথপ্রদর্শন। জাহিলিয়াত তথা ইসলামপূর্ব অন্ধকার যুগের নিষ্ঠুর মানুষেরা কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দিত। তাদেরকে দয়াশীল মানুষে রূপান্তর করেছে ইসলাম। একটা সময় তাদের অবস্থা হয়েছিলো, বিন্দুমাত্র অবিচার দেখলেই তারা কাঁদতো।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কিছু মানুষকে বিশিষ্ট গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন খলিফারা। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মানুষকে আত্মা এবং অহংকার উভয়ই

প্রদান করেছেন। দু'টোর মধ্যে অবিরাম সংঘাত চলে। এটাই পরীক্ষা। অতএব সবচে' উন্নত সৃষ্টি মানুষ এই দু'য়ের সংঘাতে অহংকার জয়ী হলে পশুতে পরিণত হয়। আর আত্মা জয়ী হলে ফেরেশতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। আত্মা এবং অহংকারের মধ্যে অব্যাহত সংগ্রাম এবং প্রচেষ্টার দ্বারাই নির্ধারিত হয় তাদের সঠিক অবস্থান। অতএব সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে মানুষেরই পরিশুদ্ধতা তাযকিয়াহ্ এবং নৈতিক উৎকর্ষতার সবচে' বেশি প্রয়োজন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কুরআনে বলেন যে, 'তাযকিয়াহ্' এবং 'তারবিয়াহ' থেকে যে জীবন বহু দূরে অবস্থান করে তা পশুতুল্য। হয়তো তার চেয়েও নিম্নের। **"অনেক জ্বীন এবং মানুষের জন্য আমরা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে যা দ্বারা তারা কিছুই উপলব্ধি করে না, চক্ষু আছে যা দ্বারা তারা কিছুই দেখে না এবং কান আছে যা দ্বারা তারা কিছুই শোনে না। তারা গবাদিপশুর মত, শুধু তাই নয়, আরও বিপথগামী। কেননা তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে অসচেতন।"** (আ'রাফ, ৭: ১৭৯)

মানুষের এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্য, দূর্বলতা এবং সবলতা, তাদের মনো:জগত এবং বাহ্যিক জীবনের কঠোর টানা-পোড়েন থেকে উদ্ভুত হয়। মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকে মেনে নিয়েছে যা পাহাড় মানতে অস্বীকার করেছে। কারণ তারা দায়িত্ব নিতে ভয় পায়। এই টানা পোড়েনগুলো কাটিয়ে ওঠা কঠিন। এটার কারণ নৈতিক উৎকর্ষতার অধিকারী হলে মানুষ আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছায়। এবং একই সময় মরণঘাতী পাপ তাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যে সমস্ত মানুষের মাঝে শান্তি নেই তাদের হৃদয় পশুর বৈশিষ্ট্য দ্বারা পূর্ণ। অর্থাৎ তাদের মনোজগত পশুতুল্য। তাদের কেউ কেউ শৃগালের মত ধূর্ত, কেউ কেউ হায়েনার মত হিংস্র, কেউ পিপীলিকার মত পরিশ্রমি, কেউ আবার সাপের মত বিষাক্ত। কেউ ভালবেসে ঠোকরায়, কেউ জোঁকের মত রক্ত চোষে, কেউ আবার হাসতে হাসতে তার বন্ধুর পিঠে ছুরি বসায়। এসব কিছুই পশুদের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি মানুষ, যারা তাদের অহংকার থেকে মুক্ত নয় এবং কালক্রমে একটি ভাল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হতে পারে না, তারা তাদের নিজস্ব অশুভ প্রবণতা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। কিছু মানুষের শুধুমাত্র একটি পশু প্রবৃত্তি থাকে। অন্যদিকে, অনেকের বেশি থাকে। সেগুলো খুঁজে বের করা জ্ঞানী লোকের পক্ষে কঠিন নয়; মনে কি আছে চেহারায় তার প্রতিফলন পড়ে।

এই পৃথিবীতে ইতিবাচক প্রবণতা সম্পন্ন মানুষ এবং নেতিবাচক প্রবণতা সম্পন্ন মানুষ পাশাপাশি বাস করে। এই অবস্থার আংশিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় একটি আস্তাবলে। বদমেজাজী হিংস্র পশুর সাথে একটি মনোরম গজলা হরিনকে যদি রাখা যায় তার সাথেই তাকে থাকতে হবে। কখনো কখনো একজন কৃপন একজন বদান্যলোকের সাথে পাশাপাশি বাস করে। একজন জড়বুদ্ধি লোকের পাশে একজন বিচক্ষন লোক, একজন দয়ালু লোকের পাশে একজন পাষান হৃদয়ের মানুষ বাস করে। কৃপনরা নিষ্ঠুর, তারা ভীতু এবং অন্যদের সেবা করতে অনিচ্ছুক। জড়বোদ্ধরা প্রাজ্ঞদের বুঝে না; নিষ্ঠুর লোকেরা ভাবে যে, তারা

ন্যায়বান কিন্তু তারা সবসময় তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকে। ফেরেশতাদের মত আত্মার অধিকারীরা মন্দ লোকের পাশে বাস করে। প্রথম জন সত্যকে আবিস্কারের এবং ভাল বান্দা হওয়ার চেষ্টা করে। অন্যদিকে মন্দ লোকটি প্রবৃত্তির দাস। সে মনে করে যে, সুখ হলো খাওয়া দাওয়া, আমোদ প্রমোদ এবং সমাজে উঁচু অবস্থান হাসিল করা।

সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যক্তি দ্বারা আকীর্ণ পৃথিবীতে একজন মানুষের বাস করা কঠিন এক পরীক্ষা। তথাপি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটা জরুরী এবং এই পৃথিবীতে এটাই আমাদের সত্যিকারের লক্ষ্য। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য খারাপ প্রবণতার চাইতে ভাল নৈতিকতা বোধের বিকাশ প্রয়োজনীয়। আমাদের সত্তায় অবশ্যই নৈতিক উৎকর্ষতা সঞ্চার করতে হবে।

মানবদেহ মাটি থেকে তৈরী এবং আবার মাটিতেই ফিরে যায়। আমরা যদি পশু প্রবৃত্তি ধারন করি, তবে 'তাযকিয়াহ' এবং 'তাসফিয়াহ' ব্যবহার করে নিজেদেরকে তা নিয়ন্ত্রন করতে হবে। অন্যথায় আমাদের মধ্যে অবস্থিত অহংকারের মন্দ দিকগুলোর হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো না। কেননা এই দিকগুলো আমাদের আত্মাকে দুর্বল করে দেয়। কুরআনে আল্লাহ বিবৃত করেছেন, **"আত্মা এবং অহংারের অনুপাত এবং তাদের বিন্যাসের ফল আমাদের ভুল বা সঠিক কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে; সত্যিকারার্থে সেই সফলকাম হয় যে অহংকারকে পরিশুদ্ধ করে এবং যে পারে না সে দূর্দশাগ্রস্ত হয়।"** (শাম্‌স্‌, ৯১:৭-১৩)

নিম্নলিখিত উপদেশের মাধ্যমে মওলানা রুমী সঠিক এবং ভুল ধারণা দু'টোকেই ব্যাখ্যা করেছেন: "হে সত্যের পরিব্রাজক! তুমি কি সত্য কি তা জানতে চাও? মূসা কিংবা ফেরাউন কেউই মারা যায়নি! তারা তোমার মধ্যেই রয়েছে। তারা তোমার মধ্যে লুক্কায়িত। তোমার ভিতরেই তারা পরস্পরের সাথে অনবরত যুদ্ধ করে চলেছে। সুতরাং তোমার মধ্যেই তাদের খোঁজ কর।

রুমী বলেন:

"প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ কর না। কারণ পরিশেষে এই দেহ মাটির কাছেই বিসর্জিত হবে। পরিবর্তে তোমার আত্মার ক্ষুধা মেটাও। এটাই শুধু স্বর্গলোকে যাবে এবং সম্মানিত হবে। অল্প পরিমাণে সুস্বাদু খাবার দিয়ে তোমার শারিরীক ক্ষুধা নিবৃত্ত কর। কেননা যারা প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করে তারা অহংকারের দাস এবং কালক্রমে একটি অপ্রীতিকর ভবিষ্যৎ এর শিকার হয়। তোমার আত্মাকে আধ্যাত্মিক খাদ্য দাও। তাকে পরিপক্ক চিন্তার খোরাক, সূক্ষ্ম উপলব্ধি এবং আধ্যাত্মিক খাদ্য দাও। যাতে করে সম্ভাব্য সক্ষম উপায়ে তার যেখানে যাবার কথা সেখানে যেতে পারে।"

কোনোরকম আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ (তারবিয়াহ) ছাড়া অহংকার অনেকটা পচা শিকড়যুক্ত একটি গাছের মত। সেই গাছের ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন এর ডালগুলোতে, পাতায় এবং ফলে প্রকাশ পায়। একিভাবে যদি হৃদয়ের কোনো রোগ থাকে তা ঘৃনা, হিংসা এবং ঔদ্ধত্যের মত খারাপ প্রবণতার আকারে দেহতে প্রতিফলিত হয়। এই খারাপ ঝোঁকগুলো অহংকারের সাথে সংযুক্ত। এই রোগ দূর করার জন্য আল্লাহর নির্দেশগুলো মেনে চলা উচিত।

যারা ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে তাদের জন্য একটি আদর্শ ব্যক্তির দিক নির্দেশনার দরকার; সেই আদর্শ ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত হলো, তাঁকে অনুকরণ এবং তাঁর সমকক্ষ হওয়ার সাধনা করা।

পরার্থপরতা

একবার আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর রাদি. ভ্রমন করতে করতে একটি খেজুর বাগানের পাশে থামলেন। বাগানের তত্ত্বাবধায়ক ছিল একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস। কেউ একজন ক্রীতদাসটির জন্য তিনটুকরো রুটি নিয়ে আসলো। এমন সময় সেখানে একটি কুকুর উপস্থিত হলো। ক্রীতদাসটি কুকুরটিকে একটুকরো রুটি খেতে দিল। কুকুরটি সেটা খেল। তারপর সে আরও একটি টুকরো কুকুরটিকে দিল। কুকুরটি সেটাও খেল। সে কুকুরটিকে শেষ টুকরোটাও দিল এবং কুকুরটি খেয়ে নিল। এই ঘটনা দেখে আব্দুল্লাহ রাদি. ক্রীতদাসটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রোজগার কত? সে উত্তর দিল, আমার রোজগার তিনটুকরো রুটি। যা আপনি এই মাত্র দেখেছেন।

আব্দুল্লাহ রাদি. এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেন কুকুরটিকে সবটুকু দিয়ে দিলে?"

সে উত্তর দিল, "সাধারণত এ তলাটে কুকুর দেখা যায় না। এই কুকুরটি নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে এসেছে। আমি তাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় চলে যেতে দিতে পারি না।"

আব্দুল্লাহ রাদি. জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু তুমি আজ কি খাবে?"

ক্রীতদাসটি বলল, "আমি ধৈর্য্য ধারণ করবো। আমি আমার সারাদিনের উপার্জন আল্লাহর এই ক্ষুধার্ত জীবকে দিয়েছি।"

আব্দুল্লাহ রাদি. বললেন "সুবহানাল্লাহ! মানুষ বলে যে আমি খুব সদাশয় এবং দয়ালু। এই ক্রীতদাস দেখি আমার থেকেও বেশী সদাশয় এবং দয়ালু।"

এই ঘটনার পর তিনি বাগান এবং ক্রীতদাসকে কিনে নিলেন।

তিনি ক্রীতদাসটিকে মুক্তি দিলেন এবং বাগানটি তাকে দান করলেন। (এই গল্পটি ইমাম গাজালী রাহ. কর্তৃক কিমইয়া-ই সা'দাহ্‌তে বর্ণিত হয়েছে)

এই ধরনের দয়ালু এবং নরম মনের মানুষ ইসলাম ধর্মের দান। ইসলাম শত্রুতা এবং হিংসা উৎপাটন করার জন্য এবং সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সামাজিক সমতা এবং ভালবাসা বহাল রাখার জন্য যাকাত দেয়াটা বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলাম স্বেচ্ছামূলক দান-খয়রাতকেও উৎসাহিত করে যা ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধকে উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করার

একটি বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন বাধ্যবাধকতা। অতএব ইসলাম প্রতিটি বিশ্বাসীকে একটি সমৃদ্ধ হৃদয় বিকাশে সাহায্য করে যা তাকে পরার্থপরতার সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে দিতে সক্ষম। আল্লাহর একত্ববাদ নিশ্চিত করার পর ধর্মের সত্যিকার লক্ষ্য হলো, দয়ালু, বিবেচনা পূর্ণ এবং চিন্তাশীল মানুষ তৈরী করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই পূর্ণাঙ্গতা শুধুমাত্র হৃদয়ের স্নেহ মমতা এবং দয়ার অনুভূতির মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে নিজের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিচার না করেই নিজস্ব উপার্জন অন্য জনের সাথে ভাগ করে নেয়ার মানসিকতা তৈরী হয়। এই অনুভূতি আরও গভীর হলে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করার অনুভূতি আরও পুষ্ট হয়। আরবীতে একেই আমরা 'ইসার' (পরার্থপরতা) বলি।

দয়ার্থতা আগুনের মত যা একজন মুসলিমের হৃদয়ে কখনো নিভে যায় না। এই পৃথিবীতে মানুষ হওয়ার বিশিষ্ট একটি অর্থ আছে। যা আমাদেরকে আমাদের স্রষ্টার সাথে মিলনের পথে পরিচালিত করে। একজন দয়ালু মুসলিম সদাশয়, বিনীত এবং সেবক হয়ে থাকে। একিসাথে সে একজন হৃদয়ের চিকিৎসক যে অন্যদের আত্মায় জীবন প্রবিষ্ট করায়। একজন দয়ালু বিশ্বাসী এমন একজন ব্যক্তি যে সব সময় দয়া এবং ভালবাসার সাথে তার সেবা প্রদান করার প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং একই সঙ্গে সে তার চারপাশের মানুষের জন্য আশাবাদ এবং বিশ্বাসের উৎস হয়। একজন বিশ্বাসী প্রতিটি সংগ্রামের অগ্রভাগে থাকে। অন্যান্যদের হৃদয়ে সে শান্তি প্রদান করে। যেমন তাদের কথাবার্তা, আচরণ, উপস্থিতি দ্বারা বিশ্বাসীরা সব ধরনের কৃপণতা, দুর্দশা এবং বেদনা প্রতিরোধে একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। তারা সব সময় দুঃখী সমস্যাজর্জরিত, পরিত্যক্ত এবং হতাশ মানুষের পাশে থাকে। কারণ, একজন মুসলিমের বিশ্বাসের প্রথম এবং প্রধান ফসল হলো করুণা এবং দয়া। কুরআনের মধ্য দিয়ে মনুষ্য নৈতিকতা এবং মূল্যবোধগুলো পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। এই কারণে কুরআন পাঠের শুরুতেই আমরা রহমান ও রহিম তথা পরম করুণাময় এবং পরম দয়ালু আল্লাহর এই দুইটি গুণাবলীই দিয়েই শুরু করি। আমাদের প্রভু আমাদের সেই সুবার্তাই দেন যে, তিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দয়ালু এবং তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে নৈতিকতার গুণাবলীই মূর্ত করার আদেশ দেন। পরিবর্তে আল্লাহর প্রেমে পূর্ণ একজন বিশ্বাসীর হৃদয় আল্লাহর সৃষ্ট অন্যান্য জীবদের প্রতি করুণা সিক্ত দয়ার্দ্র আচরণ করে। আল্লাহকে ভালবাসার পরিণতি হলো, তাঁর সৃষ্টির প্রতি মমতা এবং দয়া প্রদর্শন করা। একজন আল্লাহর প্রেমিক খুশী হয়ে আত্যোৎসর্গ করে এবং প্রেমিকের প্রতি তার ভালবাসার মাত্রার এটি একটি প্রকাশ।

আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করা, আল্লাহকে ভালবাসারই একটি বহি:প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে অনেক রকমের সদকাহ বা আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত আছে। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সেবার সবচে' পূর্ণ বিকশিত রূপ হলো 'ইসার' (পরার্থপরতা)। এর বৈশিষ্ট্য হলো, নিজের প্রয়োজনের চাইতেও অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া। পরার্থপরতা

সংবেদনশীলতা উচ্চতম স্তর যার বিবেকপূর্ণ প্রতিফলন প্রতিটি পূর্ণ বিকশিত বিশ্বাসীর সামাজিক আবরণে পড়ে। পরার্থপরতার বিকশিত আবহে প্রবেশ করা শুধুমাত্র একজন দয়ালু হৃদয় এবং দয়ালু আত্মার পক্ষে সম্ভব; কেননা, প্রকৃত পরার্থপরতা তাই যা একজন মানুষ দারিদ্রকে ভয় না করেই দিয়ে থাকে। এই পর্যায়ে পৌঁছানোর অর্থ পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি যা যুগে যুগে আল্লাহ প্রেরিত নবীদের এবং আল্লাহর বন্ধুদের জীবনীতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। অবশ্যই প্রত্যেকে এ ধরনের শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে আমরা যত সেই দিগন্তের কাছাকাছি পৌঁছাবো তত বেশী আমরা আল্লাহর আশীর্বাদপুষ্ট হবো। এমনকি পরার্থপর হওয়ার পথে সবচে' ছোট্ট পদক্ষেপও একটি শ্বাশ্বত অর্জন যা হেলাফেলা করার নয়।

আবু হুরায়রা রাদ.-এর বিবরণ অনুযায়ী- "একবার নবীজির কাছে একজন লোক দেখা করতে এলো এবং তাঁকে বলল, "হে আল্লাহর নবী! আমি ক্ষুধার্ত!" তখন নবীজি একজনকে তার একজন পত্নীর কাছে পাঠালেন এবং সে খাবার চাইল। কিন্তু নবীজির পত্নী বললেন, "আমি কসম খেয়ে বলছি ঘরে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।" তার আর সব পত্নীদের কাছ থেকে একই উত্তর পাওয়ার পর নবীজি সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মধ্যে কে এই লোককে রাতের অতিথি হিসেবে গ্রহণ করতে চাও?" তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, "হে আল্লাহর নবী, আমি তাকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করলাম।" এই বলে সে দরিদ্র লোকটিকে নিজ গৃহে নিয়ে এলো। সে তার পত্নীকে প্রশ্ন করল, "ঘরে কি খাবার আছে?" তার পত্নী উত্তর দিল, "না, যৎসামান্য খাবার আমাদের সন্তানদের জন্য শুধু আছে।" নবীর ঐ সাহাবি স্ত্রীকে বললেন, "তাহলে ছেলেমেয়েদের ব্যস্ত রাখো। তারা যদি খেতে চায়, তাদের বিছানায় নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিও। মেহমান খেতে আসলে, বাতি নিভিয়ে দিও। আমরা ভান করবো যে আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ। মেহমান আসার পর তারা খেতে বসল। অতিথি তৃপ্তির সাথে খেল, অন্যদিকে তারা খাওয়ার ভান করল। আলো না থাকায় মেহমান বুঝতেই পারল না যে গৃহকর্তা খেয়েছে কিনা। তারা ক্ষুধা নিয়ে রাত্রিযাপন করল। সকালে গৃহকর্তা নবীজির সাথে দেখা করতে গেলেন। নবীজি তাকে দেখা মাত্রই জিজ্ঞেস করলেন, *"তোমার আতিথ্যের জন্য আল্লাহ তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন।"* (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর এক বন্ধু শাইখ মাহমুদ সামী রামাযানওলু। আইন বিষয়ে পড়াশুনা করলেও একজন ব্যক্তির অধিকার খর্ব হবে এই ভয়ে তিনি ওকালতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। এর স্থলে তিনি ইস্তাম্বুলের তাহড়াকাফুল নামক স্থানে একটি ষ্টোরে বই বিক্রেতার কাজ নেন। তিনি বসফোরাস থেকে খারাকয়ে নৌকায় পাড়ি দেন এবং তারপর বাসের পরিবর্তে হেঁটে খারাকয় থেকে তাহতাকালেতে পৌঁছান। তিনি বাস ভাড়া বাঁচিয়ে তা দান করে দিয়েছিলেন। এ ধরনের মহান ব্যক্তিকে সচেতনতা এবং নৈতিকতার পর্যায় আমাদের

সামনে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এমনকি আমাদের ব্যক্তিগত আয়েশ, বাড়ীর সাজসজ্জা অথবা আমাদের প্রতিদিনকার ব্যয় থেকে আমরা যদি ছোট ছোট ত্যাগ স্বীকার করি তাহলে আমরাও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উচ্চতর নৈতিকতার অংশীদার হতে পারবো।

পরার্থপরতার পরিধি সদাশয়তাকেও ছাড়িয়ে যায়। কেননা, সদাশয় ব্যক্তি নিজের উদ্বৃত্ত সম্পদ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর বাকীটুকু দান করে। কিন্তু পরার্থপর ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের জন্য যেটুকু দরকার সেটুকুও দান করে দেয়। পরার্থপরতার আধ্যাত্মিক পুরস্কার বান্দার আত্মত্যাগের সমানুপাতিক। আল্লাহর প্রশংসা সেসব আনসারদের জন্য যারা নিজেদের সবকিছু মুহাজিরগণদের যারা মক্কায় হয়রানির শিকার হয়েছিল তাদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিল তাই নিম্নলিখিত আয়াতে আনসারদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, **"কিন্তু তারা নিজেদের চাইতে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এমনকি যদিও তারা নিজেরাই ভাগ্যাহত ছিল। এবং যারা তাদের তাদের আত্মার লালসা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে। তারাই শুধু সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে।"** (হাশর, ৫৯-৯)।

একবার উমর রাদি. তার ভৃত্য এবং একটি উট নিয়ে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। তারা পালা করে উটের পিঠে সওয়ার হচ্ছিলেন। যখন তার ভৃত্যের উটের পিঠে সওয়ার হওয়ার পালা আসল, তখন তার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও তিনি তাকে উটের পিঠ থেকে নামতে দিলেন না। এমনকি জেরুজালেমের প্রবেশদ্বারে পৌঁছানোর পরও। দৃশ্য অনেকটা এরকম যে, ভৃত্য উটের পিঠে এবং উমর লাগাম ধরে তার পাশে হাঁটছেন। এটা 'ইসার' বা পরার্থপরতার একটি উদাহরণ। উপরে বর্ণিত ছোট সত্য ঘটনাটিকে এক ধরনের আত্মত্যাগ বলা যায়।

পরহিতের সর্বোচ্চ স্তর হল, পরার্থপরতা। যার গূঢ়ার্থ নিজের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা অন্যান্যদের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। বিশেষত: নবীরা, তাদের সাহাবীগণ, আল্লাহর ওলীগণ এবং ন্যায়বান বান্দারা এ ধরনের বিশেষ পরহিতের ধারক এবং বাহক।

নিম্নলিখিত ঘটনাটি হযরত আলী রা. ফাতিমাকে নিয়ে। যেখানে পরার্থপরতা সবচেয়ে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। ইবনু আব্বাস রাদি. বর্ণনা করেন যে, আলী এবং ফাতিমা রাদি. তাদের দুই পুত্র হাসান এবং হুসাইন দীর্ঘদিন অসুস্থ্যতা থেকে আরোগ্য লাভের পর তারা তিনদিন রোজা রেখেছিলেন। প্রথম দিন ইফতারীর জন্য বার্লি রান্না করলেন। সন্ধ্যায় ইফতার করার সময় দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দেখলেন একজন ক্ষুধার্ত দরিদ্র লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা সেই লোকটিকে আল্লাহর ওয়াস্তে খুশী হয়ে ইফতারিটা দিয়ে নিজেরা শুধু পানি খেয়ে রোজা ভাঙ্গলেন। দ্বিতীয় দিন ইফতারীর সময় একজন এতিম বালক উপস্থিত হলো। তারা বালকটিকে তাদের খাবারগুলো দিয়ে দিলেন নিজেরা পানি পান করে

রোজা ভাঙ্গলেন। তৃতীয়দিন একজন ক্রীতদাস তাদের সাহায্য চাইল। তারা গভীর ধৈর্য্য এবং পরার্থপরতা দেখালেন এবং তাদের ইফতারিটা তাকে খেতে দিলেন।

এ ধরনের অতুলনীয় বদান্যতা, পরার্থপরতা এবং চমৎকার নৈতিকতাকে নিশ্চিত এবং উচ্চ প্রশংসা করে নিম্নলিখিত আয়াতে আল্লাহ বলেন, **"এবং তারা দরিদ্র, এতিম এবং ক্রীতদাসকে আল্লাহর প্রেমে পড়ে খাওয়ালো। তারা বলে, আমরা তোমাদের শুধুমাত্র আল্ল-াহর ওয়াস্তে খাওয়ালাম। তোমাদের কাছ থেকে কোন পুরস্কার বা ধন্যবাদ আশা করি না। আমরা শুধু মাত্র শেষ বিচারের দিন এবং আল্লাহর কাছ থেকে দুর্দশাকে ভয় করি। আল্লাহ তাদেরকে সেই ভয়াবহ দিন থেকে মুক্তি এবং তাদের উপর উজ্জ্বল আলো এবং স্বর্গীয় আনন্দ বর্ষন করবেন।"** (ইনসান, ৭৬:৮-১১)

মুহাম্মাদ সা.-এর বদান্যতা, আত্মত্যাগ এবং পরার্থপরতার সাথে আল্লাহর কোন সৃষ্ট জীবেরই তুলনা চলে না। তাঁর বদান্যতা সাধারণ মানুষের বদান্যতা থেকে অনেক বেশী গভীর ছিলো। আল্লাহর রাহে আত্মত্যাগ, ধর্মের ব্যাখ্যা করা, মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন, ক্ষুধার্তদের অন্ন দেয়া, অজ্ঞদের উপদেশ দেয়া এবং দরিদ্রকে তিনি জ্ঞান, সম্পদ এবং আত্মা দিয়ে সাহায্য করার মাধ্যমে সদাশয় এবং পরার্থপরতা করে দেখিয়েছেন।

কুরাইশদের মধ্যে সবচে' সুপরিচিতি পৌত্তলিক, সাফ্ওয়ান ইবনু উমাইয়া হুনাইন এবং তাইফের যুদ্ধে মুসলমান না হয়েও নবীজির সাথে ছিল। জিরানা নামক স্থান দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নবীজি লক্ষ্য করলেন যে, সাফওয়ান বিস্ময়ের সাথে সংগৃহীত লুটের কিছু মালামাল দেখছে। তিনি সাফওয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি এগুলো পছন্দ হয়েছে?" সে উত্তরে 'হ্যাঁ' বলতেই নবীজি বললেন, "নিয়ে যাও, এগুলো সব তোমার।" এই ঘটনার পর সাফওয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং বলে যে, নবীজি ছাড়া আর কারও হৃদয় এতটা সদাশয় নয়।" (ইসলাম তারিহি, পৃ: ৪৭৪)

বদান্যতার সবচে' চমৎকার স্তর হল পরার্থপরতা। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, নবী, তাঁর সাহাবী এবং পরবর্তী প্রজন্মের ন্যায়বান বান্দাদের এ ধরনের সদাশয় আচরণের দ্বারা অনেক একগুয়ে অবিশ্বাসী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। অনেক শত্রু বন্ধু হয়ে ওঠে। যেমন পরার্থপরতা বহু বিশ্বাসীকে তার সতীর্থ বিশ্বাসীদের প্রতি ভালবাসা জোরালো করে তোলে। আয়ত্বের মধ্যে থাকলে, আল্লাহর নবী সা. তা পূরণে কখনোই কারো অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেননি। কথিত আছে যে, একবার তাঁর কাছে নব্বই হাজার দিরহাম ছিল। তিনি সে অর্থ একটি মাদুরে বিছিয়ে যে দরিদ্র লোকই সেখান দিয়ে যাচ্ছিল তাকেই দিয়ে দিয়েছিলেন।

মুক্তহস্তে দানের বৈশিষ্ট্য

মুক্ত হস্তে দান করার গুণ, যাকে কুরআনের 'বিরর' বলা হয়েছে, সেটাও 'ইসার'-এর মত একটি মহান পরার্থপরতা। সব ধরনের নৈতিক গুণাবলীর আদর্শ উদাহরণ। নবীজি সা. এভাবেই একজন অতুলনীয় মহান ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছেন। নিচের গল্পটি তুচ্ছ ব্যাপারেও নিজের চাইতে তার মুসলিম ভাইদের অগ্রাধিকারের দেয়ার ব্যাপারে তার সংবেদনশীলতাকে তুলে ধরেছে। একদিন তিনি মেসওয়াক করার জন্য দুইটি মাজনি তৈরী করলেন। তার মধ্যে একটি অন্যটির চাইতে বেশী নিখুঁত হয়েছিল। তিনি ভালটি তাঁর এক সাহাবীকে দিলেন এবং খারাপটি নিজের জন্য রাখলেন। সাহাবি যখন তাকে বললেন, "হে আল্লাহর প্রেরিত নবী, এই ভালটাই আপনার জন্য নিন।" নবীজি তখন বললেন, *"ঘন্টাখানেকের সাথী হলেও তার বন্ধুত্বের অধিকারের ব্যাপারে যত্নশীল না হলে, সেই ব্যক্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়।"* (ইহয়াউলুমিদ্দিন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৫)

এইভাবে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, বন্ধুত্বের মূল্য 'ইসার' এবং 'বিরর' এর উপলব্ধির মাধ্যমে পরিশোধ করা উচিত। অন্যকথায়, নিজের স্বার্থের চাইতেও অন্য মুসলিম ভাই এর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমেই বন্ধু বন্ধুর হক আদায় করে থাকে। (ইহ্য়া উলুম আদ দ্বীন, পৃ: ৪৩৫)

এ ধরনের ত্যাগের আরেকটি উদাহরণ এখানে দেয়া গেল। একদিন এক মসজিদে নবীজিকে ঘিরে তার সাহাবীরা বসলেন এবং তাঁরা তার মুখ থেকে ধর্মীয় হিতোপদেশ শুনছিলেন। তখন নবীজি নিচে উদ্ধৃত আয়াতটি পাঠ করলেন, **"তোমার ভালো লাগার জিনিষ অন্যকে না দিতে পারলে কখনোই তুমি ন্যায়বান হতে পারবে না এবং তুমি যাই দাও না কেন আল্লাহ সে ব্যাপারে জ্ঞাত।"** (আল ইমরান, ৩:৯২)

নবীজির সাহাবী শ্রোতারা এই আয়াতটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন। তারা চিন্তা করতে লাগলেন, তাদের সবচে' ভালো লাগার জিনিষ তারা দান করতে পারবেন কিনা। সহসাই আবু তালহা নামের এক সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখভাব বিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত। নববী মসজিদের কাছে ছয়শত খেজুরগাছের একটি বড় বাগান তার ছিলো। এবং সেই বাগানটি তার খুব প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই নবীজিকে সেই বাগানে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং তাঁর পদচারনায় ধন্য হতেন।

আবু তালহা বললেন, "হে আল্লাহর দূত! আমার যত সম্পত্তি আছে তার মধ্যে আমি আমার এই বাগানটিকেই সবচে' ভালবাসি। আপনিও তো এই বাগানটির সঙ্গে পরিচিত। এই মুহুর্তে আল্লাহর ওয়াস্তে এই বাগানটি আল্লাহর প্রেরিত দূতকে দান করার ইচ্ছা হচ্ছে। এই বাগানটি আপনার ইচ্ছে মত ব্যবহার করুন এবং চাইলে তা দান করে দিতে পারেন।" একথা বলার পর তিনি সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য সেই বাগানে গেলেন। বাগানে পৌঁছে

আবু তালহা তার পত্নীকে একটি গাছের ছায়ায় বসা অবস্থায় দেখতে পেলেন। আবু তালহা ভিতরে প্রবেশ না করে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ও আবু তালহা! আপনি কেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? ভিতরে আসুন।" আবু তালহা বললেন, "আমি ভিতরে প্রবেশ করতে পারবো না, তুমিও তোমার জিনিষপত্র নিয়ে বাগান ত্যাগ কর।" এরকম অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনে তার স্ত্রী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।" কেন আবু তালহা? এই বাগান কি আমাদের নয়?" তিনি বললেন, "না, এখন থেকে এই বাগান মদিনার গরীব লোকদের সম্পত্তি।" এরপর তিনি উপরিউক্ত আয়াতের শুভ বার্তাটি স্ত্রীকে বললেন এবং আগ্রহ সহকারে তার এই দানের কথা জানালেন। তার পত্নী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি আমাদের দুজনের পক্ষ থেকে এই দান করেছেন না শুধু একাই তা করেছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমাদের দুজনের পক্ষ থেকে।" একথা শুনে তার স্ত্রী খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আল্লাহ যেন আপনার উপর সন্তুষ্ট হন, আবু তালহা। আমাদের চারিদিকে গরীব মানুষদের দেখে আমিও একই কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সাহস করে আপনাকে কিছু বলতে পারিনি। আল্লাহ যেন আমাদের এই দান গ্রহণ করেন, এই প্রার্থনাই করি। আমিও বাগান ত্যাগ করে আপনার সাথে যাচ্ছি।"

যদি এই বৈশিষ্ট্যটি মানুষের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে যায় তাহলে এটা ভবিষ্যবাণী করা কঠিন হবে না যে, পুরো পৃথিবী জুড়ে কী ধরনের সুখের আমেজ বিরাজ করবে। এই ত্যাগ থেকে কি বৈভব আসবে তা কল্পনা করুন। এই বোধই আবু তালহাকে এ ধরনের আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, সাহাবীদের মধ্যে সবচে' দরিদ্র আবু যরকেও নবীজি এই বলে দান খয়রাতে উৎসাহিত করেছেন যে, "হে আবু যার! তরকারি রান্না করার সময় বেশী করে পানি দিয়ে তা তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাগ করে খেও!। (মুসলিম, বিরর, ১৪২)

একজন বিশ্বাসীর অন্ধকার রাতে পূর্ণিমার আলো দান করা উচিৎ এবং দান খয়রাত করার জন্য বিবেচক, সংবেদনশীল, দয়ালু, পরার্থপর, সদাশয়, করুণাস্কিত সহানুভূতিশীল এবং প্রবল উৎসাহী থাকা উচিত। বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীতে, দান-খয়রাত এবং পরার্থপর হওয়া একটি অপরিহার্য্য চাহিদা। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে আমরাও দারিদ্র এবং চাহিদা পূরণে অক্ষম একজন হতে পারতাম। এ কারণে অসুস্থ্য, দু:খী, নি:সঙ্গ, দরিদ্র এবং ক্ষুধার্ত মানুষকে দান খয়রাত বা সাহায্য করাটা আল্লাহর আমাদের প্রতি অসীম করুণার ঋণ পরিশোধ করার মত একটা ব্যাপার। এবং অহংকারশূণ্য অনুভূতি নিয়ে কাজ করা আমাদের কর্তব্য। গরীবদের সাথে আমাদের প্রাচুর্য্যকে ভাগ করে নিতে পারলে সেসব হৃদয় সুখী হবে, যা আমাদের এই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পরকালে পুরস্কার এ পাওয়া এবং সুখী হওয়ার উৎস হবে। হে প্রভু! সব ধরনের দানই যেন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সীমাহীন রত্নভান্ডার হয়।

প্রভু! আমাদের নবী মুহাম্মাদের সা. পরার্থপর জীবনের প্রতিফলন যেন আমাদের জীবনে ঘটে এবং সেই সমস্ত ওলীরা, যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করে পরার্থপর জীবনের জীবন্ত উদাহরণ হয়েছেন, তাঁরা যেন আমাদের পথ প্রদর্শক হন।

আমীন!

ইসলাম মানবজাতিকে নবজীবন দেয়

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা. এমন একটি সমাজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে সমাজ সহিংসতা এবং অন্যায়-অবিচারের পঙ্কিলতায় ডুবে ছিল। সীমাহীন করুণা এবং ভালবাসায় বিচ্ছুরিত তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমে তিনি ঘৃণা এবং প্রতিহিংসার আকীর্ণ সমাজটিকে ভালবাসা এবং পারস্পরিক মমতায় পূর্ণ সমাজে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর আগমনের পূর্বে, সেখানকার লোকেরা অল্পবয়সী এবং দুর্বলদের সাথে দুর্ব্যবহার এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে অন্যদের আক্রমণ করার মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠেছিল। নবীজির আচরণ দেখে, যারা এই ধরনের কাজ করতো তারা নিজেদের সংশোধন করে তাদের নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করতে শিখল। এই সব লোকেরা করুণা এবং ভালবাসায় মূর্ত হয়ে উঠল এবং তাদের মূল্যবোধের উদাহরণ দ্বারা বাকী মানুষদের পথ প্রদর্শনের শক্তি অর্জন করল। নিকষ অমানিশায় তারাগুলো যেমন পৃথিবীকে আলোকিত করে, তেমনি তারাও ইসলামের সৌন্দর্য্যকে প্রতিফলিত করতে লাগল। নিচের গল্পটি মুসা'আব ইবনু উমাইর-এর যা এরকম বহু উদাহরণের একটি।

একদিন ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য মুস'আব রাদি. এবং তাঁর বন্ধু আস'আদ ইবনু জুরারা, আব্দু আশহাল এবং জাফরের গোত্রগুলোতে গেলেন। এই সব বংশের প্রধান ছিল সা'দ বি. মু'আদ এবং উসাইদ বি. হুদাইর। সা'দ উসাইদকে ববলেন, ঐ সব লোকদের এখানে আসা বন্ধ করছ না কেন? তারা আমাদের মধ্যকার দরিদ্র এবং সরল মানুষগুলোর সাথে প্রতারণা করছে।"

একথা শুনে উসাইদ, মুস'আব এবং জুরারার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সে তার বল্লম তাদের দিকে তাক করে গর্জন করে উঠল, "যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও, তবে এখনই এই জায়গা থেকে চলে যাও।"

রাগ না করে মুস'আব রাদি. উত্তর দিলেন, "যদি আপনি শান্ত হয়ে আমার কথা শোনেন, তাহলে বলবো আপনাদের জন্য আমার একটা বার্তা আছে। আপনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ একজন মানুষ। আমি যা বলবো তা যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে গ্রহণ করতে পারেন। এবং যদি না পছন্দ হয়, তাহলে আমি যা কিছু বলবো তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।"

এই কথায় উসাইদ একমত হয়ে তার বলম সরিয়ে ফেলল। ইসলাম সম্পর্কে মুস'আব রাদি. এর চমৎকার সব কথা শুনে সে নিজেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। তারপর সে তার বন্ধু সা'দ-এর কাছে গেল এবং বলল, "তাদের বক্তব্য আমি শুনেছি এবং তাদের কথায় ক্ষতিকর কিছু পাইনি।"

এই অনাকাঙ্খিত অতিথিদের তার বন্ধু অনুমোদন দেয়ায় সা'দ খুব অসন্তুষ্ট হল। এবং তারপর সে তলোওয়ার খাপ থেকে অর্ধেক খুলে সশরীরে মুস'আব এর কাছে গেল। সে তাদের চলে যেতে বললো। আগের মত একইভাবে মুস'আব কর্কশ ভাষায় কিছু না বলে মিষ্টি কথা দিয়ে পরিস্থিতি সামলালেন এবং গভীর বিচক্ষণতার সাথে ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে বললেন। তার বন্ধু উসাইদ এর মত সা'দও মাত্র পাওয়া বার্তার ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয় আকর্ষণের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

আরবের অধিবাসীরা কিভাবে ইসলামকে গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় তাদের আগ্রাসী চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং কিভাবে তারা নবী মুহাম্মাদের সা. আচরণ দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছে। তার এটা একটি উদাহরণ। আরবেরা অবশেষে ধৈর্য্য এবং মানসিক পরিপক্কতার উচ্চতম পর্যায় নিজেদের মধ্যে বিকশিত করেছিল। তারা বুঝেছিল যে, ইসলাম মানুষকে ধ্বংস করার জন্য নয় বরঞ্চ তাদের পুনরুত্থানের জন্য এসেছে। এবং তারা নিচের কথাগুলো ইতিহাসের পাতায় উৎকীর্ণ করেছে, "যারা খুনী, তাদের আধ্যাত্মিক পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন।"

রুমীও বলেন যে, তারা জানে করুণা এবং শুভত্বের সামনে অশুভ ক্ষমতা শক্তিহীন "করুণাকে সাগরে যখন তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে ওঠে তখন এমনকি পাথরও জীবনের অমৃত পান করে।

তুচ্ছ ধূলিকণা দৃঢ় এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে; পৃথিবীর গালিচা সার্টিনের মত মনথন হয়ে ওঠে এবং সোনার বস্ত্র পরিধান করে। শত বছর আগের মৃতরা কবর থেকে বেরিয়ে আসে; অভিশপ্ত অশুভ আত্মাদের সৌন্দর্য্য দেখে হুরীরাও তাদের ঈর্ষা করে।

পৃথিবীর পুরো চেহারা সুশ্যামল হয়ে ওঠে; শুষ্ক বনভূমিতে ফুল ফোটে এবং বিকশিত হয়। নেকড়ে এবং ভেড়ারা এক সাথে পানি পান করে; নিরাশরা সাহসী এবং বীর হয়ে উঠে।" (মাসনাবি, ২২৮২ ৮৫)

নবীজি দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদেরও ক্ষমা করে দিতেন। তাঁর প্রিয় চাচার, হামজার হত্যাকারী ওয়াহ্শীকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। নবীজির মানুষের জন্য করুণা এবং ভালবাসা। তাঁর ক্রোধকেও ছাপিয়ে যেত। নবীজির ভালবাসার প্রাচুর্য্যে অনেক ক্রোমান্বিত লোকও বিগতিল হয়ে করুণায় গোলাপ বাগানে রূপান্তরিত হয়েছিল। একজন তুর্কী কবি, নবীজির আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: "যদি কোন

মনুষ্য প্রাণীর দাঁত না থাকতো, তবে তার নিজ ভাইয়েরাও তাকে গিলে ফেলতো।” এই উক্তি দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, তখনকার মানুষ তার ঘনিষ্ঠজনদেরও প্রতি নিষ্ঠুর ছিল। ইসলাম মানবজাতিকে এই ধরনের গভীর অজ্ঞতা এবং পাশবিকতার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

সেই সমাজের নিষ্ঠুর লোকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এতটাই মমত্ববোধ জেগে উঠেছিল যে ইয়ারমুকের যুদ্ধে কিছু আহত লোকদের নিয়ে নিচের অবস্থাটি উদ্ভুত হয়েছিল। শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করার অগে যখন আহতদের পানি পান করতে দেয়া হলো, প্রত্যেকেই তার পাশের জনকে আগে পান করাতে বলল এবং প্রথমে কেউ পানি পান করাটা প্রত্যাখ্যান করল। এভাবে চলার পর তাদের প্রত্যেকের রূহ, তৃষ্ণা নিবারণের আগেই কব্জ হয়ে যায়।

নবীজি প্রেম এবং করুণার কাফেলাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রতিনিয়ত নৈতিক আচরণের সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করেছেন। ফলে, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে প্রত্যেকে তাঁর অনুকরণীয় চরিত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গত শতাব্দীতে হল্যান্ডের হেগ-এ পণ্ডিত এবং চিন্তাবিদরা একত্রিত হয়ে যারা যুগে যুগে মানবজাতির উন্নতির জন্য অবদান রেখেছেন এমন একশ জনকে নির্বাচন করেছিলেন। যে নীতিমালা অনুসরণ করে তারা মনীষীদের নির্বাচন করেছিলেন সে অনুযায়ী নবী মুহাম্মাদকে সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে মনোনীত করেন। মজার ব্যাপার হলো নির্বাচন কমিটির প্রতিটি সদস্যই ছিলো খৃষ্টান। উল্লেখ্য যে, নবীজির উচ্চ মার্গের নৈতিক গুণাবলী দ্বারা বিমোহিত হয়ে, তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এমনকি তাঁর ঘোর শত্রুরাও তাঁকে মিথ্যাবাদী বা স্বৈরাচারী আখ্যা দিতে পারেনি; পরিবর্তে তারা বাধ্য হয়েছিল তাঁর প্রশংসা করতে।

যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং ইসলামের সেবা করতে চায় তাদের জানা উচিৎ যে, ইসলামের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হলো মানবতার পুনরুদ্ধার। শুধুমাত্র যারা প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং যারা এটা বুঝে যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচে’ মূল্যবান বস্তু হচ্ছে মানুষ তারাই আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ইসলাম এবং মানবতার সেবা করতে পারে। অন্যকথায়, ইসলামের লক্ষ্য হলো আদর্শ মানুষের উদ্ভব ঘটানো। এই আদর্শ শুধুমাত্র তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব যখন উপলব্ধিকারি হৃদয় বিগলিত এবং পুনর্জাগরিত হয় এবং এর মধ্যে লুক্কায়িত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হতে শুরু করে।

ফলে ইসলাম ধর্ম সবসময় মুসলিমদের আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়ার উপর গুরুত্ব দেয় এবং মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এমন অনেক মহান ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে যে কোন ধর্ম বিশ্বাসের মানুষ যাদের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে থাকে। যারা তাদের অহংকার দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয়ে পশুবৎ জীবন যাপন করে তারা নবীজির উদাহরণ এবং অনুশাসনের মাধ্যমে দেবদূত প্রতিমা তারকা হয়ে ওঠে এবং তাদের ঔজ্জ্বল্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে হযরত উমর রা. নিজ কন্যা সন্তাকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন। অথচ পরবর্তীতে তিনিই করুণার উৎস ধারা হয়ে ওঠেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি একটি পিপীলিকারও ক্ষতি করতে চাননি। অতএব, ইসলামের চেতনার অর্থ হলো, সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসা এবং মমতার সাথে আলিঙ্গন করা। মানুষের হৃদয়ে ইসলামের বপন করা সীমাহীন করুণার বীজের মাধ্যমে মানুষ তার সীমিত শক্তি এবং দূর্বল প্রকৃতিকে অতিক্রম করে গড়ে ওঠে। তারা তখন শ্বাস্বত জীবনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

ইসলাম মানুষকে পুনরুদ্ধার করতে এসেছে। ইসলাম যেই আবেগ এবং অনুভূতির শিক্ষা দেয়। তাই মানবতার সারকথা। বিখ্যাত তুর্কী সূফী কবি ইউনুস ইমরে বলেছেন,

"চলো, আমরা একে অপরের বন্ধু হয়ে যাই

চলো, আমরা জীবনকে সহজভাবে নিই

চলো, আমরা অন্যকে ভালবাসি এবং অন্যের ভালবাসা অর্জন করি

কেউ এই পৃথিবীতে চিরদিন থাকবে না।

যারা তাদের আত্মার ভিতরের স্বর্গীয় প্রেম এবং করুণার বরাদ্দকৃত অংশকে সুসংহত করতে পারেনি তারা মানবতা এবং তাদের নিজের আত্মার শত্রু। এসব নির্দয় মানুষেরা তাদের আধ্যাত্মিক পুষ্টি এবং পূর্নতার পথকে অবরুদ্ধ করে রাখে। অন্যদিকে জালালউদ্দিন রুমী এবং ইউনুস ইমরের মত আল্লাহর মহান বন্ধুরা হলেন করুণার ঝর্নাধারা। তাদেরকে স্বর্গেই গোলাপের মত সবাই ভালবাসে। এমনকি খুব দু:সময়েও তাঁরা আশাবাদ ছড়িয়ে দিতে এবং সমাজের ক্ষত সারাতে সক্ষম।

সব মুসলিমের গোলাপের প্রকৃতির মত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করা উচিৎ। গোলাপ যেমন তীক্ষ্ম কাঁটার মধ্যে দিয়ে মিষ্টি সুগন্ধ ছড়ায়। কাঁটার বৈশিষ্ট্য ধারন করার পরিবর্তে বিশ্বাসীদের উচিত দীর্ঘ শীতের পর প্রস্ফুটিত গোলাপের মত হওয়া। এই প্রেক্ষিতে রুমী বলেন, "যে এই দুনিয়ায় কাটার বীজ বপন করে, সাবধান! গোলাপ বাগানে তার খোঁজ করো না।" রুমী আরও বলেন,

"চাঁদের পিঠে কলঙ্ক লক্ষ্য করছ স্বর্গে কাঁটা তুলছ!

কাঁটা উত্তোলনকারী, যদি তুমি স্বর্গে যাও, সেখানে তুমি নিজেকে ছাড়া কোন

কাঁটাই দেখতে পাবে না।"

আমাদের উসামানী আমলের পূর্বসূরীরা যুদ্ধবন্দীদের সাথে খুব দয়ার্দ্র আচরণ করতেন। একজন যুদ্ধবন্ধী অফিসার একবার বলেছিল- "ও করুণা, তুমি এমন এক স্বৈরাচারী যে, আমাকে আমার শক্রুকে ভালবাসতে শেখায়!"

এটা দূর্ভাগ্যজনক যে, আজকাল কিছু বস্তুবাসদী এবং অবিশ্বাসীরা সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেলে। মানবজাতি এ পর্যন্ত যা প্রত্যক্ষ করেছে তার মধ্যে এটা সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়। সন্ত্রাসবাদ, ভালবাসা এবং করুণার অভাবের ফসল। সন্ত্রাসবাদীদের হৃদয়ে কখনোই এ ধরনের মহিমান্বিত অনুভূতি বাসা বাঁধে না। ইসলাম হৃদয়ের ধর্ম এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে এ ধরনের কোন বোধ থাকে না। কেননা তাদের হৃদয় পাথরের মত শক্ত। ইসলামের আবির্ভাবের শুরু থেকেই যে কোন ধরনের সন্ত্রাস এবং নৈরাজ্যকে প্রত্যাখ্যান করে এনেছে। ইসলাম কানোরকম বৈষম্য না করেই মুসলিম এবং অমুসলিমদের অধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা করার আদেশ দেয়।

যে সমস্ত গোত্র ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়, তাদের কাছে নবীজি শিক্ষক পাঠাতেন। একবার একটি ঘটনা। বি'রে মা'উনা নামের এক অবিশ্বাসী গোত্র এই ধরনের কিছু শিক্ষকদের তাদের যাত্রাপথে বন্দী করে নিয়ে হত্যা করে ফেলে। এরপর থেকে নবীজি সব সময় তাদের নিরাপত্তার জন্য সাথে কিছু সৈনিকও পাঠাতেন। তিনি এই সব সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র শিক্ষকদের রক্ষা করতেই যেন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। একবার এই ধরনের ব্যাটেলিয়ানের একজন সেনাধ্যক্ষ, খালিদ বি. ওয়ালিদ বিনা প্রয়োজনেই অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। ফলে কিছু লোক এবং তাদের সম্পদের ক্ষতি হয়েছিল। এই ঘটনা শোনার পর নবীজি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, খালিদ যা করেছে সে ব্যাপারে আমি দায়ী নই। সে যা করেছে তাতে আমি খুশী নই।" তিনি তিনবার এই বাক্য দুটি উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি আলী রাদি.-কে পাঠালেন এর সব ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য। যার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত কুকুরে জরিমানাও অন্তর্ভূক্ত ছিল।

অমুসলিমদের প্রতি তাদের আচরণে উসমানি আমলের শাসকেরা নবীজির উচ্চ নৈতিকতা অবলম্বন করেছিলেন এবং তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অমুসলিমদের কখনো বাধ্য করেন নি। তারা কখনো অন্যান্য জাতিকে ধ্বংস করার অথবা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন দ্বারা তাদের সংস্কৃতিকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেনি। বরঞ্চ, তারা অমুসলিমদের সতীর্থ মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছেন। এ ধরনের সহিষ্ণুতার কারণে আজকের পোলাণ্ডর মানুষ বলে: "আমরা কখনোই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবো না যদি না ইসমানি ঘোড়াগুলো ভিষ্টুল নদী থেকে পানি পান না করে..."

এভাবে অন্যান্য জাতির শোষিত মানুষ তাদের নিজেদের শাসকদের চাইতে উসামানি শাসনকে প্রাধান্য দেয়। যখন অটোমানরা কন্সটানটিনোপল দখল করল তখন কিছু কুলীন

বাইজান্টাইন পরামর্শ দেয় যে, তাদের পোপের কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, নোটারাস নামের একজন অভিজাত ব্যক্তি বলেছিলেন, "কন্সটানটিনোপলে খৃষ্টান ধর্ম জাজকদের টুপিগুলো চাইতে আমি উসমানি পাগড়ি দেখতে বেশী পছন্দ করবো।"

বর্তমানের ইসলামী দুনিয়ায়, আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক মানসিকতা গ্রহণ করা দরকার যেখানে আল্লাহর ওয়াস্তেই আমরা মানুষকে ভালবাসবো। এটা কোন রাজনৈতিক কারণে নয়। বরঞ্চ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

আল্লাহর সৃষ্টিদের প্রতি সূফীরা যে করুণা দেখিয়েছেন নিচের গল্পটি তার একটি ভাল উদাহরণ। একদা তাঁর এক সফরের সময়, বায়েজিদ বুস্তামি রাহ. একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কিছু খাবার খেলেন। তারপর তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি খাবার থলেতে একটি পিপড়া দেখতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে গাছেন নিচে বিরতির সময় পিপড়াটি থলেতে উঠেছে। পিপড়াটিকে গৃহহীন হয়েছে ভেবে তিনি বিষন্ন বোধ করলেন। তিনি আবার সেই গাছের নিচে ফিরে গেলেন এবং পিপড়াটিকে তার আদি নিবাসে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি আল্লাহর সৃষ্টিজীবের অধিকার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এমনকি একটি পিপড়ারও একজন মানুষের মত সম্মানীয় হওয়ার প্রয়োজন আছে। ইসলাম এ ধরনের মহান হৃদয়ের জন্ম দিয়েছে যে, একটি পিপড়ার প্রতিও সর্বোচ্চ করুণা প্রদর্শন করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ধরনের মানুষ তাদের সতীর্থ মানুষদের অধিকার সংরক্ষণকে আর সব কিছুই উপরে স্থান দেয়। আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত করার মাধ্যমেই শুধু এ ধরনের মানসিকতা অর্জন সম্ভব। যা তাকে ফেরেশতাদের ঈর্ষার পাত্র করে তুলবে। নিজের অহংকারের বোধগুলোকে সন্তুষ্ট করার মানে সে এমন একটা অবস্থায় পতিত হবে যা তাকে পশুদের থেকে নিচের অবস্থানে নিয়ে যাবে। এই অবস্থা থেকে উপরে উল্লেখিত আগের অবস্থান নেয়াই উত্তম।

প্রচুর পরিমাণে অন্যায়-অবিচার এবং নিষ্পাপ মানুষকে হত্যার মধ্যে দিয়ে বর্তমান পৃথিবী সংঘাতময় হয়ে উঠেছে। মানুষ তাদের হীন আকাংখাগুলেকে অনুসরণ এবং তাদের আধ্যাত্মিক বিকাশকে অগ্রাহ্য করার প্রক্রিয়ার পরিণতিতেই এই সংঘাতের জন্ম হয়েছে। পরিশেষে অন্যকে ভালবাসা এবং করুণা করার মত মহিমান্বিত অনুভূতিগুলো মানুষ হারিয়ে ফেলবে। যারা এই পঙ্কিলতায় ডুবে আছে তাদের মুক্তির সমাধান, সত্যকে এবং ইসলামের গভীরতাকে আবিস্কারের মধ্যেই নিহিত আছে; তাদের এই আবিস্কারের ডাকের কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে। এটা উপলব্ধি করে যে, এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ ক্ষণস্থায়ী।

এই পৃথিবী আমাদের পরকালের চিরস্থায়ী জীবনর প্রস্তুতি মাত্র। খ্যাতিমান সূফী এবং আল্লাহর প্রেমিক ইউনুস ইমরে তার একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন, "আল্লাহর ওয়াস্তেই

আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালবোসো।” স্বৈরাচারীদের সুস্থ করার জন্য, এটা কি সবৈধ পংক্তি নয়? এই স্বৈরাচারীদের পরকালের সুখে প্রবেশ করার আগে তাদের কাজগুলোর সংস্কারের প্রয়োজন। যদি ঐ সমস্ত মানুষেরা ইউনুস ইমরের মানবতার জন্য ভালবাসার কিছু অংশ চর্চা করতে সক্ষম হয়, তাহলে যে সমস্ত ভয়ংকর অপরাধ তারা করেছিল যেগুলো আর মরবে না। যদি তারা এই পংক্তিটির ব্যাপারে মনোযোগ দেয় তাহলে তাদের অহংকারের অন্ধকার দিক দ্বারা সৃষ্ট শত্রুতার চাইতে তারা মানবতার প্রতি ভালবাসা এবং সুবিচারের অনুভূতির আশীর্বাদপুষ্ট হবে।

আমাদের অবশ্যই ঘোষণা করা উচিত যে, কিছু লোকের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। অতএব যারা নিজেদের মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে তাদের থেকে প্রকৃত ধার্মিক লোকদের সতর্কভাবে আমাদের পৃথক করা দরকার। ইসলামের ইতিহাসে আমরা ‘খাওয়ারিজ’ ধরনের দলগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছি যারা ইসলামের নামে নিষ্পাপ মানুষদের হত্যা করেছে। কেননা তাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। অতীতেও আমরা কিছু রাষ্ট্রের এই রকম দুরভিসন্ধির সাক্ষী হয়েছি। তাদের অনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মন্দ লোকেরা শুদুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত আকাংখাগুলোকে পূরণ করার জন্য ধর্মের মূল্যবান অনুভূতি এবং ধারণাগুলোকে ব্যবহার করছে এবং এর পরিণতি হয়েছে ধর্ম এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের মানহানির মধ্যে দিয়ে। রূমী বলেছেন, তাদের মন্দ কাজের জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হবে।

“বেশীর ভাগ মানুষই শিকারির মত; এধরনের মানুষকে বিশ্বাস কর না, তারা যদি বলেও শান্তিতে থাকো।

তাদের হৃদয় শয়তানের আখড়া; শয়তানিতে পূর্ণ লোকদের বকবকানি কখনো শুনবে না।

যে শয়তানের নি:শ্বাসের সাথে ‘লা হাওলা’ গলাধঃকরণ করে, নিশ্চিত যে সে নির্বোধের মত হঠকারী যুদ্ধে লিপ্ত হবে।” (মাসনবী, ২৫১-৫৩)

রূমী এ ধরনের পাপীদের কবলে পড়ে বিপদাপন্ন না হওয়ার জন্য নিষ্পাপ মানুষদের শুদ্ধ হৃদয়কে সাবধান করেছেন, “সে বৃথা উচ্চারণ করে যে বলে, “ও আমার প্রিয়তম”। সে হয়তো তার প্রিয়তমের চামড়া কসাই এর মতো উপড়ে ফেলতে পারে।

সে বৃথাই উচ্চারণ করতে পারে যে, সে তোমার চামড়া উপড়ে ফেলবে; ঠিক তাকে যে শত্রুদের থেকে আফিম আস্বাদন করে।” (মাসনাবী, ২৫৮-৯)

তাদের নিষ্ঠুর হৃদয়ের উপর মুখোশের মত হৃদয়হীন সন্ত্রাসীরা মানবতাকে ব্যবহার করে। যারা কখনো স্বর্গীয় প্রেমের আস্বাদ লাভ করেনি এ ধরনের লোকেরা আদর্শবাদী হলে তারা তাদের আদর্শকে শুধুমাত্র মানুষকে বিষাক্ত করার জন্য জাহির করে। যদি তারা কবি হয়, তবে তারা অন্যের আত্মাকে বিষাক্ত করে। যদি তারা নীতিবান হয় তবে তারা শুধু অনৈতিকতাই ছড়ায়। নিচের বাক্যগুলোতে রূমী এই ধরনের লোকদের প্রকৃত চরিত্র উম্মোচন করেছেন। "যদি সে হাতে একটি গোলাপ ধরে থাকে, সেটা কাঁটায় পণিত হয়; এবং যদি সে তার কোন বন্ধুর কাছে যায়, সে তাকে সাপের মত ছোবল মারে।" (মাসনবী, ২য় খণ্ড, ১৫৪)

সংক্ষেপে, এ ধরনের লোকেরা আত্মার হত্যাকারক। তাদের চোখ অন্ধ এবং তাদের বোধগুলোকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে নির্মম আনন্দ পায়। মাদকের মতো সব ধরনের অমানবিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তারা মানুষকে নিষ্ঠুর পশুতে রূপান্তরিত করে। প্রকৃত মানবিক যুক্তি এবং কারণ চর্চা করার পরিবর্তে তারা মানুষের প্রতিহিংসা এবং আগ্রাসনের প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করে। পুরো ইতিহাস জুড়ে দেখা যায় যে, তারা প্রতিনিয়ত মানবতার নিকৃষ্টতম শত্রু হিসেবেই কাজ করে গেছে। এ ধরনের লোকদের নিয়ত সম্পর্কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, **"যখন তাদের বলা হয়: 'পৃথিবীতে কোন মন্দ কাজ কর না।' তারা বলে: 'আমরা তো এমন লোক যারা সব কিছু শুদ্ধ করে।' অথচ তারা মন্দ কাজের প্রতিভূ। কিন্তু তারা সেটা উপলব্ধি করে না।"** (বাকারা, ২:১১-১২)

কেউ এটা দাবী করতে পারবে না যে, সাধারণ মানুষকে হত্যা করা একটি ধর্মীয় আচরণ এবং কেউ এটাকে জিহাদের সাথে গুলিয়েও ফেলবে না। আসলে যারা নিজেদের পাপ কর্মকে বৈধ করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে তারা কখনোই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে না। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের আচরণের ভয়ংকর পরিণতি ব্যাখ্যা করেছেন, **"এই প্রেক্ষিতে ইসরায়েলের সন্তানদের জন্য আমরা স্থির করেছি যে, যদি কেউ অন্য কোন ব্যক্তিকে জবাই করে, যদি তা হত্যার উদ্দেশ্যে বা মন্দ কাজ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে হয় তবে সে পুরো জাতিকে জবাই করেছে। এবং যদি কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করে, তা যেন সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করা। অত:পর, তাদের কাছে একটি পরিষ্কার মোজেজা নিয়ে আমাদের দূতেরা এসেছেন, তথাপি তার পরেও অনেকেই নীতির বাইরের কাজে লিপ্ত থেকেছে।"** (মাইদাহ্, ৫:৩২)

পবিত্র কুরআনের বিবেচনায় একজন নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করা, সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সমান। কেননা এ ধরনের হত্যাকারী বস্তুতত: পক্ষে মানবজীবনের পবিত্রতাকেই আক্রমণ করে। যদি কেউ একজন নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করে এর নিহিতার্থ হল এই যে, সে নিজস্ব ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করতে পারে। এই ধরনের

আচরণের মাধ্যমে সে অন্যান্যদেরও এ কাজে উৎসাহিত করে। অতএব ইসলাম ধর্মে নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করা সবচেয়ে বড় অপরাধ। এবং যারা এই অপরাধ সংঘটিত করে তারা পরকালে আল্লাহর ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায়। অন্যদিকে কেউ যখন অন্যের জীবন বাঁচায় একটা অপরাধ প্রতিরোধ করে বা সেই কারণগুলোকে অপসারণ করে যা মানুষরূপী কসাই তৈরী করে, এই ধরনের সাহসী মানুষকে নীতিগতভাবে সমগ্র মানবতার রক্ষক হিবে বিবেচনা করা হয়।

রূমী ইসলামকে জীবনের তৃষ্ণা নিবারক পানির সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেন যে, বেঁচে থাকার জন্য যে পানি তার কাছে কেউ মারা যেতে পারে না: "জীবনের পানির উপস্থিতিতে কেউ কখনো মৃত্যু বরণ করে না।" (মাসনবী, ৪২১৮)

মানুষের জীবনকে শারিরীক এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে রক্ষা এবং সংরক্ষণ করাই ইসলামের সমস্ত নিয়ামত এবং অনুশাসনের লক্ষ্য। সব সময়ই ইসলাম মানবজাতিকে শুদ্ধ বিশ্বাস এবং সুআচরণ করতে উৎসাহিত করে এবং এটা মানুষের মধ্যে করুণা এবং মানবজাতির সেবা করার জন্য ভালবাসা, প্রজ্ঞার জন্য ভালবাসা, ভদ্রতা, দয়ার্দ্রতা এবং ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার অনুভূতি জাগ্রত করে।

বিশেষতঃ পবিত্র রামাজান মাসে ইসলাম, মুসলিমদের একটি বিশেষ ধরনের আত্যাত্মিক আবহ দান করে। এই মাসে মুসলিমরা রোজা রাখা, তারাবীহ পড়া এবং গরীবদের খুব আন্তরিকতার সাথে দান খয়রাত করার সুযোগ পায়। রোজা রাখার মাধ্যমে যে সমস্ত ধমনীগুলো নির্দয়তার রোগ দ্বারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেগুলো খুলে যায় এবং পরিস্কার হয়ে যায় এবং হৃদয় তখন দূর্বল দরিদ্র এবং নি:সঙ্গ মানুষের দিকে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।

মাহে রমজান করুণার মাস। করুণার অনুশীলনে একজন মুসলিম অনেক গভীর থেকে ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারে। কেননা তার হীন আকাংখাগুলোকে লাগাম তার হাতে থাকে এবং সেগুলোকে তখন নিয়ন্ত্রন করা সহজ হয়। এই প্রক্রিয়ায় আত্মা পরিশুদ্ধ এবং ঐশ্বরিক পথগুলোর প্রতি আরো সংবেদনশীল হয়ে ওটে। করুণার ফসল হল ক্ষমাশীলতা, সদাশয়তা এবং বিনয়। অন্যকে সেবা করার মাধ্যমে আমরা ক্রমে ক্রমে হিংসা ত্যাগ করতে শিখি। এই সব কঠিন অর্জনগুলো পবিত্র রমজান মাসে পাওয়া সহজতর হয়। সমগ্র মানব জাতির প্রতি আমাদের সেবা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ঐশ্বরিক অনুশাসনগুলো মান্য করার জন্য আমরা যতই সংগ্রাম করি ততই আমাদের আত্মা তাদের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে থাকে। সেবার এই শ্বাশ্বত মানসিকতায় আত্মা 'প্রভু'র মত পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছাতে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

সংক্ষেপে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত পরিতৃপ্তি অর্জন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস এবং মেধাসম্পন্ন কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। একজন ভাল মুসলমান তার হৃদয় এবং মস্তিস্ককে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে আর তার প্রায়োগিক রূপ হলো মানবতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করা এবং একটি নৈতিকভাবে উৎকর্ষ জীবনের অনুশীলন করতে শেখা। রূমী এই দৃষ্টিভঙ্গীকে নিম্নলিতিভাবে বর্ণনা করেছেন,

"ওহে, রূপবান সঙ্গী পেলে কদাকার ব্যক্তি সুখী হয়, দু:খ হয় সেই পোলাপী প্রসন্নতার মুখাবয়বের জন্য যার সঙ্গী পাতাঝরা বিবর্ণ হেমন্ত।" (মুতানাব্বি, ১৩৪১)

ও আমার প্রভু। ইসলামের সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়ে ইহকাল এবং পরকালকে পরম সুখের এবং পরিতৃপ্তির স্থান করে দাও। মুসলিম উম্মাহকে সব ধরনের মন্দ এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করো।

আমীন।

ইসলামিক রহস্যবাদের অর্থবহতা

আবু দারদা নামের নবীজির এক সাহাবীকে দামাস্কের বিচারক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তাঁর পদমর্যাদার কারণেই তিনি বহু অপরাধীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। একদিন এক অপরাধীর বিচারের রায় দেয়ার পর মামলাটির ইতি ঘটে। কিন্তু পরে তিনি সেই মামলার শুনানীর সময়ে উপস্থিত কিছু লোককে অপরাধীকে গালি দিতে শুনলেন। তা শুনে যারা অভিশাপ দিচ্ছিল তাদেরকে আবু দারদা রাদি. জিজ্ঞেস করলেন,

"একজন মানুষকে গভীর কুয়োয় পড়ে যেতে দেখলে তোমরা কী করবে?"

তারা উত্তর দিল, "তাকে উদ্ধার করার জন্য আমরা একটা রশি কুয়োতে ফেলবো।"

"সেক্ষেত্রে, পাপের গর্তে পতিত এই লোকটিকে উদ্ধারে তোমরা চেষ্টা করছ না কেন?"

এই কথা শুনে তারা খুব আশ্চর্যবোধ করল এবং জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এই পাপী লোকটিকে ঘৃণা করেন না?"

আবু দারদা তাঁর বিচক্ষণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন, "আমি তার ব্যক্তিত্বের শত্রু নই কিন্তু তার পাপের শত্রু।"

আবু দারদা রাদি. বিশ্বাসীদের একটা পাঠ শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। আবু দারদা রাদি.-এর বিচক্ষণতা নবীজির নৈতিকতারই প্রতিফলন এবং এই প্রতিফলনগুলো সবচে' পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা বা অনুশাসন যেগুলো তাসউফ বা ইসলামি রহস্যবাদের মর্মমূলে এক সাথে জড়ো করা হয়েছে। এই প্রাজ্ঞতা পাপীকে তার পাপের মধ্যে আরও নিমজ্জিত করে না। বরঞ্চ, এটা পাপীকে অনুশোচনা করার একটা সুযোগ দেয় এবং তাকে করুণা, ভালবাসা এবং ক্ষমার সমুদ্রে পরিশুদ্ধ করে। আবু জাহেলের সাথেও নবীজি এইরূপ আচরণ করেছিলেন। পৌত্তলিক আবু জাহেল তার শত্রুদের সাথে খুব নিষ্ঠুর আচরণ করতো। তার পাপগুলো উম্মোচন করে তাকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে তিনি সবসময় তাকে আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং করুণার স্বর্গীয় সাগরে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য দয়ার্দ্রতাকে আহবান করতেন।

অনুতপ্ত আত্মাদের প্রতি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর নবীর ভালবাসা এবং করুণা প্রদর্শন করেন। যদি কোনো পাপী অনুতপ্ত হয় তবে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে তার অতীতকে

পরিশুদ্ধ করে দেন। অনুতপ্ত ব্যক্তির আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। এমনকি আল্লাহ তার পাপগুলোকে ভাল কাজে রূপান্তরিত করার তৌফিক দান করেন। সেই সমস্ত অনুতপ্তদের প্রসঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, **"যদি সে অনুতপ্ত হয়, বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ সেই ব্যক্তির সমস্ত মন্দকে ভালতে রূপান্তরিত করেন। কেননা, আল্লাহ সবসময় ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়।"** (ফুরকান, ২৫:৭০)

যারা তাদের জন্য বরাদ্দকৃত স্বর্গীয় প্রেম এবং করুণার অংশ গ্রহণ করেনি, তারা একই সাথে নিজেদের এবং মানবতার শত্রু। এই সমস্ত লোকেরা আধ্যাত্মিক পুষ্টির আহরণের পথ বন্ধ করে দেয়। এদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিতুলনা করা যায়। রূমী এবং ইউসুপ ইমরের মত মানুষদের যারা আল্লাহর মহান বন্ধু এবং করুণার ঝর্নাধারা অর্জন করেছেন তারা স্বর্গের গোলাপ ফুলের মত। যাদের সব ন্যায়বান লোকেরা ভালবাসে। এমনকি খুব বিপর্যয়ের সময়েও তারা আশার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করতে পারেন এবং সমাজের ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলতে পারেন। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যা প্রতিটি মুসলিমের থাকা উচিত। এসরেফগলু রাহ. সুফী দর্শনকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন: "বন্ধুর জন্য চিনির মত করে বিষ গলাধ:করণ করা উচিত।"

মাহমুদ সামী রাহ.-ও পাপী মুসলিমদের প্রতি করুনা এবং ভালবাসা প্রদর্শনের একটা ভাল উদাহরণ আমাদের সামনে তুলে ধরেন। বিষাদগ্রস্ত হয়ে একদিন তাঁর এক ছাত্র তাঁর বাড়ীতে এসে দরজায় টোকা দেয়। সে ছিলো মাতাল এবং কোন অবস্থাতেই তার শাইখের দরজার সামনে আসার কথা নয়। দরজা যে খুলেছিল সে তার অবস্থা দেখে খুব রেগে গেল। এবং ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকালো। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখানে কি করছো? তুমি কি জান না কার সাথে তুমি দেখা করতে এসেছ?" দরিদ্র লোকটি উত্তর দিল, "এছাড়া অন্য কোন জায়গা আছে কি যেখানে এই বাড়ীর মত সম্ভাষণ মিলবে?" মাহমুদ সামী রাহ. এ কথাগুলো শুনতে পেলেন। তিনি ছাত্রটিকে তার আধ্যাত্মিক প্রাসাদে প্রবেশ করতে দিলেন। তাকে সান্তনা এবং তার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করলেন। করুণা এবং ভালবাসা দিয়ে তিনি তার হৃদয়ের ক্ষত নিরাময় করলেন। এ ধরনের আচরণ ছাত্রটিকে তার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করল এবং সে তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হলো। পরবর্তীতে সে একজন আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক মানুষ হয়ে ওঠে।

মানুষের প্রতি সূফী দৃষ্টিভঙ্গী ইতিবাচক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। মানুষের পাপের দিকে উঁকি না মেরে এবং তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে না ধরে সূফীরা বরঞ্চ ব্যক্তির ভাল গুণগুলোর নিরীক্ষণ এবং সেগুলোর অন্তর্গত দিকগুলো বিকাশের চেষ্টা করে থাকেন। যাইহোক, এই দৃষ্টিভঙ্গী যেন আমাদের বিপথগামী না করে। এর অর্থ এই নয় যে সূফীরা মানুষের পাপী হওয়াকে অনুমতি দেয়। সূফীরা পাপের অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারেন না।

কিন্তু তারা পাপীদের সমবেদনা এবং ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ করেন। এবং এভাবে তাদের সাহায্য করার জন্য তারা তাদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করেন। সুফীদের কাছে একজন পাপী ব্যক্তি ডানা ভাঙ্গা একটি পাখীর মত। এ ধরনের লোক তাদের করুণা এবং সমবেদনা কে আকর্ষণ করে। পাপীকে সাহায্য, এবং তার ক্ষত-বিক্ষত আত্মাকে সান্তনা দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য। তাঁরা পুরোপুরি আল্লাহর ওয়াস্তেই তা করে থাকেন। এটা মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা এবং যত্ন দেখানো আধ্যাত্মিক পূর্নাঙ্গতা অর্জনের সবচে’ কার্যকরী পন্থা।

নিচের ছোট্ট সত্য ঘটনাটা উমর বি. খাত্তার রা. দ্বারা বিবৃত নবীজির জীবদ্দশায় আব্দুল্লাহ বলে এক ব্যক্তি ছিল। যার ডাক নাম ছিল হিমার (গাধা)। সে নবীজিকে খুব হাসাতো। তাঁর অতিরিক্ত মদ্যপানের আসক্তি থাকার কারণে নবীজি তাকে বেশ কয়েকবার বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন এই অভিযোগে তাকে নবীজির কাছে আনা হল এবং বেত্রাঘাত করা হলো। অনেক লোকের মাঝে একজন চিৎকার করে উঠল, ‘ও আল্লাহ! ওকে অভিশাপ দিন! এই একই অভিযোগে কত ঘন ঘন তাকে নবীজির কাছে আনা হচ্ছে।” নবীজি বললেন, “আলাহ যাতে তাকে অভিশাপ না দেন, আমি জানি সে আল্লাহ এবং তার নবীদের ভালবাসে।” (বুখারী, হুদুদ ৫)

শুধুমাত্র মানুষ হওয়ার কারণেই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষের অবস্থান সবচে’ শীর্ষে। খারাপ কাজ এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ এই অনন্য অবস্থানকে পরিবর্তিত করতে পারে না। কেননা, প্রতিটি নারী পুরুষ আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত ঐশ্বরিক শ্বাস, নির্যাস বহন করে। যদিও বেশির ভাগ পাপীই তাদের মূল্য এবং ঐশ্বরিক বিন্যাসে তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন নয়। তথাপি এই ঐশ্বরিক নির্যাস সবসময় মানুষের সঙ্গে বিরাজ করে। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝানো যাক। এটা যেন অনেকটা হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরের কাদায় পড়ে যাওয়ার মত। এমন কোন মুসলিম নেই যে, এই ঘটনায় শোকার্ত হবে এবং কালো পাথরটিকে এর পবিত্র স্থানে পুন:স্থাপন করার জন্য দৌড়ে যাবে না। তারা এটাকে চোখের অশ্রু দিয়ে পরিস্কার এবং এটাকে পালিশ করবে। এমনকি কালো পাথরটি ধূলা এবং ময়লায় আকীর্ণ হলেও মুসলিমরা এর প্রতি প্রাপ্য সম্মান এবং ভালবাসা প্রদর্শন করবে। এটা জান্নাত থেকে আসার কারণে তারা এর উৎপত্তি এবং উচ্চ মূল্যকে স্মরণে রাখে। মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটনাটি একই রকম। তারা জান্নত থেকে এসেছে অর্থাৎ আমাদের বাবা আদম এবং যে পাপ কাজই তারা করে থাকুক, এই স্বর্গীয় নির্যাস কখনো তাদের ত্যাগ করে যায় না।

একিভাবে একজন ভাল চিকিৎসক কখনো তার রোগীর অসুস্থ্যতার জন্য রাগান্বিত হয় না। রোগীর অজ্ঞতা অলসতা এবং অন্যান্য ক্রুটি-বিচ্যুতির কারণেই রোগ হয়ে থাকে। একজন ভাল চিকিৎসক তার রোগীর ব্যথা এবং যন্ত্রনা ভোগকেই বিবেচনা করে এবং তার

ঘাটতির দিকে তাকায় না। তৎক্ষনাৎ, চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসার জন্য উঠে পড়ে লাগেন এবং রোগীর উপর রেগে সময়ের অপচয় করেন না। তেমনিভাবে সূফীরা হলেন আধ্যাত্মিক চিকিৎসক এবং যখন একজন সূফী সমাজের সদস্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিক অসুস্ততা দেখতে পান তারা অভিযোগ করার বদলে তৎক্ষণাৎ তা থেকে আরোগ্যলাভ করানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সূফীরা হলেন আধ্যাত্মিক ঝড় তুফানে একটি জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেটের মত। এমনকি যদি নিজ ত্রুটির কারণে কোন ব্যক্তি বিপাকে পড়ে তবে ডুবন্ত মানুষটিকে লাইফ-জ্যাকেট দেয়াটা কর্তব্য এবং সুখের কারণ মনে করে। খাইবারের যুদ্ধের পর নবীজি বলেছিলেন, "হে আলী! সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের নীচে যা কিছু আছে তা পাওয়ার চাইতে একজন মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানোটাই তোমার জন্য উত্তম।"

ইতোমধ্যেই একটি আয়াতে একজন ব্যক্তিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার যে অর্থবহতা সর্বশক্তিমান আল্লাহ দেখিয়েছেন, তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

"এবং যদি কেউ একটি জীবন রক্ষা করে, এটা যেন অনেকটা সব মানুষের জীবন রক্ষা করেছে"। (মাইদাহ্, ৫:৩২)

একজন ব্যক্তির করা নিকৃষ্টতম পাপ হল কাউকে আল্লাহর সাথে শরিক করা এবং আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। কোমল এবং সহ্যশীল দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এই ভয়াবহ পাপের আরোগ্য নিহিত আছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসা আ.-কে ফেরাউনের কাছে পাঠানোর সময় মুসাকে ফেরাউনের সাথে কোমল এবং দয়ার্দ্র স্বরে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সফলভাবে কাউকে ইসলামের পথে পরিচালিত করা একজন বিশ্বাসীর সর্বোচ্চ বিজয় এবং তার মুক্তির সেতুবন্ধন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন মূসা আ.-কে তাদের সাথে কোমল আচরণ করার নির্দেশ দিয়ার সময় তিনি ফেরাউনের অবিশ্বস্ততা সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু কেন তার পরও তার সাথে নম্র আচরণের নির্দেশ? কারণ, আল্লাহ আমাদের এমন আচার আচরণ শিখাতে চেয়েছেন যার দ্বারা আমরা ইসলাম প্রচার করতে পারি।

ইসলাম সম্পর্কে অন্যকে বলার সময় আমাদের অবশ্যই দয়ালু এবং ভদ্র হতে হবে। এমনকি যদি আমাদের বিরোধীপক্ষ ইসলামের প্রতি শত্রুতায় ফোরাউনের মত হয়, তবুও। আমাদের আবেগ তাড়িত বা অমুসলিমদের সাথে কর্কশ হওয়া চলবে না। হুমকী দেয়া, এবং এ ধরনের অন্যান্য আচরণ ইসলাম প্রচারের জন্য ইসলামিক পন্থা নয়। বাস্তবতাকে স্বীকার করে রূমী তাঁর মুতানাব্বি কিতাবে লিখেন, "মূসাকে বলা আল্লাহর কথাগুলো ভালভাবে বুঝতে হবে: "ফেরাউনের এর সাথে চমৎকারভাবে কথা বলো এবং তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ কর! কেননা, যদি তুমি ফুটন্ত তেলে পানি যোগ কর তাহলে তুমি শুধু আগুনকেই আরও তীব্র করবে এবং পাত্র ও তেল - দুটোকেই ধ্বংস করবে।"

নিম্নলিখিত আয়াতটি নবীজির ব্যক্তিত্ব বিবেচনা করে, কুরআন মুসলিম উম্মাহকে বলে, **"তাদের সাথে ভদ্র, নম্র আচরণ করা আল্লাহর করুণার অংশ। তুমি যদি কঠোর বা কর্কশ-হৃদয়ের অধিকারি হও তাহলে তারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের ত্রুটিগুলো উপেক্ষা কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাদের সমস্যার বিষয়ে পরামর্শ দাও। অত:পর কোন সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর উপর ভরসা রেখ। কেননা, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে।"** (আল ইমরান, ৩:১৫৯)

অন্যদের ইসলাম সম্পর্কে বলা এবং ইসলামী দাওয়া পাঠানোর পন্থা শেখানোর যে সমস্ত আয়াত নাজিল হয়েছে তার মধ্যে নিম্নের আয়াতটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে। **"সকলকে আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় প্রাজ্ঞ এবং চমৎকারভাবে ধর্ম প্রচারের আমন্ত্রণ জানাও এবং তাদের সবচে' মাধুর্য্যমণ্ডিত যুক্তি প্রদর্শন কর। যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং যাদের পথ প্রদর্শনের দরকার, তাদেরকে তোমার প্রভু খুব ভালভাবেই চেনেন।"** (নাহল, ১৬:১২৫)

এই সহিষ্ণুতা এবং নম্রতা শুধুমাত্র বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানকারী পাপীদের জন্যই নয়, যারা ভাল বিশ্বাসী, তাদের প্রতিও প্রদর্শন কতে হবে। আমরা সবাই মানুষ এবং এমনকি যারা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করে, তারাও মাঝে মাঝে ভুল করে। কারো ভুলগুলো শুদ্ধ করার জন্য যদি আমরা কর্কশ পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহলে এটা এমনকি অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। অন্য ব্যক্তিকে সুস্থ্য করার পরিবর্তে, আমাদের অবিবেচক এবং অমার্জিত আচরণ তাদের জন্য আরও দুর্দশা বয়ে আনতে পারে। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ কর্কশ আচরণ সহ্য করতে পারে না। এমনকি পুত্র এবং কন্যারাও পিতামাতার অমার্জিত আচরণ সহ্য করতে পারে না এবং অসম্মানজনকভাবে দেয়া একটি ভাল উপদেশও এর মূল্য হারিয়ে ফেলে।

মানব মনের নাজুক মনস্তত্বের কথা ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। এবং একজন পাপীর সাথে কখনো কর্কশ আচরণ করা উচিৎ নয়। তা সে যত বেশী পাপ কাজ করে থাকুক। আমাদের আচরন যেন তাদের হারিয়ে যাওয়া আত্মসম্মান বোধ জাগিয়ে তোলে এবং আল্লাহপ্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তি তাদের মধ্যে পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে। নবীজি খুব দৃঢ়ভাবে আমাদের সাবধান করেছেন যে, একজন বিশ্বাসীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা একটি পাপ কাজ এবং আমাদের কখনোই কারো খারাপ অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা মশকরা বা অসম্মান জ্ঞাপন করা উচিত না। তিনি বলেন, *" মুসলিম ভাইদের অসম্মান প্রদর্শন করা একজন মুসলিমের জন্য ভয়াবহ পাপ।"* (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমেদ)

বেজমিয়ালেম নামের এক সম্ভ্রান্ত উনসানী নারী ভৃত্যদের ব্যক্তিত্ব এবং অখণ্ডতা অটুট রাখার জন্য দামেস্কে একটা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের কর্মস্থলে যদি কোন ক্ষতি

তারা করে তার ক্ষতিপূরণ দেয়াই এই ফাউন্ডেশনের কাজ। ফলে ভৃত্য এবং কর্মজীবি মানুষ কিছু ভাঙ্গলেও খারাপ বোধ করবে না।

ইসাম ধর্ম প্রচারে আমাদের অবশ্যই অন্যদের প্রতি নম্র এবং ক্ষমাশীল হওয়া উচিৎ এবং আমাদের নিজদের সমালোচনা এবং দায়িত্ব পালন করা উচিত। সর্বশক্তিমান আল্ল-াহ বলেন, **"এবং তিনি তার বান্দাদের ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত।"** (ফুরকান, ২৫:৫৮) অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"তোমরা যারা বিশ্বাস কর। যতদূর সম্ভব সন্দেহ পরিহার কর। কেননা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্দেহ করা পাপ। এবং একে অপরের উপর গোয়েন্দাগিরি করো না। গীবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষন করতে চাও? নিশ্চয় তোমরা তা ঘৃনা কর। সুতরাং কিন্তু আলাহকে ভয় করো। কেননা, আল্লাহ সর্বদা প্রত্যাবর্তনকারী, পরম করুণাময়।" (হুজুরাত, ৪৯:১২)

যারা এই আয়াতগুলো মেনে চলে তারা নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের প্রতীক। এই ধরনের মানুষেরা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে যে, এই পৃথিবী অন্যদের থেকে পৃথক নয়। যেহেতু আমরা সবাই এখান থেকে সেখানে পরিভ্রমন করি। ওটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমান গাজী তাদের মধ্যে একজন যিনি এই আয়াতগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে জীবন যাপন করেন। তাঁর গুরু সেইখ এদেবালি একদিন াতকে নিম্নলিখিত পরামর্শটি দেন, "হে আমার পুত্র! এখন তুমি একজন রাজা। এখন থেকে তোমার উপর রাগ করাটা আমাদের দাবী এবং তোমার ভূমিকা হবে সহিষ্ণুতার। তোমার উপর রাগ করলে তোমার কর্তব্য হবে আমাদের হৃদয় পুনরায় জয় করা। আমরা যখন তোমাকে দোষারোপ করবো তখন ধৈর্য্যশীল হওয়া হবে তোমার ভূমিকা। আমরা যখন ভুল করবো এবং দূর্বল হবো তোমাকে তখন আমাদের ত্রুটিগুলোর ব্যাপারে সাহায্যকারী এবং সহিষ্ণু হতে হবে। আমরা সমস্যাপীড়িত এবং পরস্পরের সাথে মত বিরোধে জড়িয়ে পড়লে তোমার কর্তব্য হবে আমাদের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া। আমরা অন্যায্য কথা বললে এবং তোমার সমালোচনা করলে আমাদের ক্ষমা করা হবে তোমার কর্তব্য। হে আমার পুত্র! এখন থেকে আমরা যদি বিভেদের শিকার হই তোমার কর্তব্য হবে আমাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। আমরা যদি অলস হয়ে পড়ি তোমার দায়িত্ব হবে কাজ করা এবং আমাদের কঠোর পরিশ্রম করায় অনুপ্রাণিত করা।"

এটা শাসকদের জন্য অমূল্য উপদেশ তাদের সাথে খারাপ আচরণ করলে তাদের আল্লাহর ওয়াস্তে অবশ্যই ক্ষমা করে দিতে হবে। যেকোন পরিস্থিতিতে তাদের অধীনদের প্রতি তাদের অবশ্যই সমবেদনা এবং ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে।

যখন নবীজি কোন ব্যক্তির ত্রুটি উল্লেখ করতেন তখন তিনি তার পরিচয় গোপন রাখতেন। কোন সম্প্রদায়কে তাদের ভুল শুধরে দেওয়ার সময় তিনি কখনই কাউকে আঘাত করতেন না। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, "আমার কোন ভুলের জন্য তোমরা এই এই কাজ করেছ?" মনে হয় যেন, অন্যদের ত্রুটির জন্য তিনি নিজেকে দায়ী করছেন।

এটা সূফীদের একটি সাধারণ চর্চা। যাতে করে যে ব্যক্তি পাপ কাজ করেছে তাকে আঘাত না করা। এটার কারণ, আল্লাহর পথ হলো অন্যের হৃদয় জয় করা এবং তাদের গড়ে তোলা। তাদের অনিষ্ট সাধন নয়। বিখ্যাত সূফী কবি ইউনুস ইমরে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে নিম্নলিখিত পংক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন

"হৃদয় হল আলাহ তা'লার সিংহাসন
আল্লাহ হৃদয়ের পরীক্ষা নেন।
ইহকাল এবং পরকালের দূর্ভাগা সেই
যে একটি হৃদয় ভাঙ্গে।"

দোষী মুসলিমদের ক্ষমা করা এবং যারা অন্যের ক্ষতিসাধন এবং অন্যকে আক্রমণ করে তাদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করা একজন খাঁটি মুমিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যে সমস্ত মুমিনরা অপরাধী তাদের শুভ কামনায় ভাল বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করে এবং তাদের আত্মার প্রতি ইহকাল এবং পরকালের অনুশোচনার মাধ্যমে দোয়া করে। এই করুণা এবং সমবেদনার সবচে' মহান উদাহরণ হলেন নবীজি সা.। যখন তায়েফের লোকেরা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করল আল্লাহর কাছে তাদের শাস্তি দাবী করার পরিবর্তে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। যারা তাঁর ক্ষতি করতো তাদের ধ্বংসের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে কখনো প্রার্থনা করেননি। নবীজির সবচেয়ে বড় শত্রু মক্কার লোকদের জন্যও তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। তাঁর প্রার্থনার মাধ্যমে অনেক স্বৈরাচারী ভাল মুসলিমে পরিণত হয়। কুরআন আমাদের বলে যে, **"শুভ এবং অশুভ কখনও এক রকম নয়। সর্বশক্তি দিয়ে অশুভকে মোকাবিলা কর। দেখ তার এবং তোমার মধ্যে শত্রুতাকে মনে কর উষ্ণ বন্ধুতা হিসেবে।"** (ফুসসিলাত, ৪১:৩৪)

নবীজি বলেন, শুধুমাত্র ভালর প্রতিদানে ভাল করা বা খারাপের সাথে খারাপ আচরণ করা ভাল জিনিস নয়। বরঞ্চ তোমার সাথে খারাপ আচরণ করার পরও তার সাথে ভাল আচরণ করাটাই উত্তম।" (তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌র ওয়াসসিলা, পৃ. ৩২৩)

হাদীসে বর্ণিত আরচণগুলোকে অনুসরণ করলে, আমাদের শত্রুও বন্ধু হয়ে উঠবে। যদি সেই আমাদের বন্ধু হয় তার বন্ধু প্রগাঢ় হবে এবং সে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। বর্তমানে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় মানুষেরা বস্তুবাদী দর্শনের নির্মম আক্রমণ থেকে পালানোর জন্য

রহস্যবাদী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কেননা বস্তুবাদী জীবনধারা মানবজাতির মনুষত্বকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। অতএব, পাশ্চাত্রের মানুষদের ইসলামে আহবান করার জন্য ইসলামী রহস্যবাদের (তাসাউউফ) অনুশাসনগুলো প্রয়োগ করাটা সবচেয়ে উপকারী এবং সবচেয়ে ক্ষমাপূর্ণ। ইসলম ধর্ম গ্রহণ করা পাশ্চাত্যের বহু লোক তাদের আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটাবার জন্য মওলানা রূমী এবং ইবনে আরাবীর রচনাবলী পড়ছে। এটাও একটা বাস্তবতা যে, বর্তমান পাশ্চাত্য দুনিয়ায় তাসাউফের উপর লেখা বইগুলো সবচেয়ে জনপ্রিয়। অতএব আমাদেরকে রূমীর এই আহবানে সাড়া দেয়া উচিত, "এসো! এসো! তুমি যেই হও না কেন। এসো, এমনকি যদি তুমি অবিশ্বাসী হও। একজন আগুনের পূজারী হও, একজন পৌত্তলিক হও! নিরাশার আলয় আমাদের আশ্রয় স্থল নয়। এমনকি তবুও এসো, যদি শত বারও তুমি তোমার অনুশোচনা থেকে বিচ্যুত হও।"

মওলানা রুমীর উচ্চারিত সর্বব্যাপী দয়া এবং ভালবাসার প্রয়োজন। সহিষ্ণুতার জন্য তাঁর আহবানের লক্ষ্য হলো মানুষকে তাদের ঐশ্বরিক প্রকৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর ক্ষমা এবং সমবেদনার মাধ্যমে ইসলামের কাছে তাদের নিয়ে আসা। এই কথাগুলো দ্বারা রুমী মানুষের দ্বারা কৃত সব ধরনের ক্রটিগুলোকে গ্রহণ করার কথা এবং কোন রকম সংশোধন ছাড়াই সেই পর্যায়ে থাকার কথা বলেন নি। তাঁর লক্ষ্য হলো, মানুষের আধ্যাত্মিক জগতকে রোগমুক্ত করা। মহান সূফীদের হৃদয় অনেকটা মেরামত কারখানার মত সেখানে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের মেরামত করা হয়। অতএব, তাঁর আহবান প্রকৃত মুসমিলদের প্রতি নয় বরঞ্চ বিপথগামী এবং অজ্ঞদের প্রতি তাঁর এই আহবান।

বিশেষত সেই সময়ে যখন ধর্মীয় জীবন দূর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষরা অজ্ঞ থাকে তখন আমাদেরকে ইসলামের আহবানে মহান সূফীদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। পরার্থপর ভালবাসা, ক্ষমা এবং সহিষ্ণুতা প্রয়োজন। যারা সব ধরনের আধ্যাত্মিক ক্লেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং আল্লাহকে অমান্য করার সমুদ্রে নিমজ্জিত তাদের রক্ষা করার এটাই সবচে' টেকসই পন্থা।

অন্যদিকে এটা সবচে' দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাপীদের প্রতি সহিষ্ণুতা ব্যক্তিগতভাবে শত্রুর সামনে পড়লে প্রযোগ করা যেতে পারে। পাপীদের সহ্য করা ঠিক নয় যদি তাদের পাপ সমাজের জন্য ক্ষতিকারক হয় এবং সমাজের শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করে। যারা স্বৈরাচারী এবং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে সমাজের বুননটাকে ধ্বংস করতে তৎপর তাদের আমাদের ভালবাসা এবং সহিষ্ণুতা প্রাপ্য নয়। সাধারণ মানুষের পাপ এবং পাপীর প্রতি অরুচি থাকাটা খারাপ নয়। তারা পাপ থেকে পালাতে চায়। যে পাপ এ ধরনের হঠকারী আচরণের মাধ্যমে সাধারণকে উত্তেজিত করে এবং তাদেরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য যেটা আবশ্যক। পাপ হলো মোহিনী নারীর সঙ্গীতের মত যা প্রলুব্ধ করে এবং পাপ

কাজ সংঘটন সহজ করে দেয়। অতএব পাপকে হালকাভাবে নেয়ার দুটো ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। প্রথমত কেউ সহজেই পাপের মধ্যে ডুবে যেতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ পাপের কারণে আল্লাহর ক্রোধকে ছোট করে দেখে। অন্যকথায়, আমাদের অবশ্যই পাপীর প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে। তবে পাপকে নয়। আনাস বি. মালিক রাদি. থেকে বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসটি এটাই ব্যাখ্যা করে। নবীজি বলেছিলেন, *"ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো মানুষের জন্য সহজতর কর। এটাকে তাদের জন্য কঠিন কর না এবং তাদেরকে ভাল বার্তা পাঠাও এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণ হয়ো না।"* (বুখারী, ইলিম, ১১; মুসলিম, জিহাদ, ৬-৭) অবশ্য তা ধর্মের মূলের ক্ষতি না করেই এবং সরল পথ থেকে ভ্রষ্ট না হয়েই করা উচিত।

হে আমাদের প্রভু। যারা প্রজ্ঞা এবং ঐশ্বরিক ভালবাসা অর্জন করেছে তাদের মধ্যে আমাদের জায়গা দাও। তোমার জন্যই তোমার সৃষ্টির প্রতি আমাদের হৃদয়কে ভালবাসা এবং ক্ষমার উৎসে পরিণত কর। আমাদের পাপ এবং কদর্যতার জায়গায় সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বরিক পুরস্কারের স্থান দাও। আমাদের মানুষদের জীবন শান্তি এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য দ্বারা পূর্ণ কর এবং সব ধরনের বিপর্যয় এবং অবিশ্বাস থেকে আমাদের রক্ষা কর।

আমীন!

ভালবাসা (মুহাব্বাহ্)

ভালবাসা হলো আনন্দ, উৎফুলতা, প্রশান্তি এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের আস্বাদ। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেয়া সবচে' সেরা উপহার হলো ভালবাসতে পারার ক্ষমতা। সুতরাং ভালবাসা সব সময় মূল্যবান বস্তুর দিকে বিন্যস্ত থাকা উচিৎ। সেসব হৃদয়ের জন্য এর ব্যবহার করা উচিৎ যে হৃদয় সত্যিকারার্থেই বন্ধুত্ব বুঝে। ভালবাসার এই পর্যায় মানুষ এবং পৃথিবীর অন্যসব জীবদের জন্য স্বর্গীয় প্রেম অর্জনের পথে একটি ধাপ। তথাপি দূর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মানুষ তাদের ক্ষণস্থায়ী অহংবোধের আকাঙ্খাগুলোর জন্য ভালবাসার মত স্বর্গীয় উপহারকে বিসর্জন দেয়।

যাদের প্রকৃত অর্থেই ভালবাসা প্রাপ্য তাদের তা না করে পাওয়াটা এই জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। সস্তা বৈষয়িক স্বার্থের মুঠোয় ভালবাসা বন্দী হওয়াটা অনেকটা ফুটপাতের ফাটলের মধ্যে গজানো চমৎকার একটি ফুলের মত। আগে অথবা পরে পদাঘাতে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুই এর নিয়তি। রাস্তায় পড়ে হারিয়ে যাওয়া একটি হীরকখন্ডের জন্য খুবই দূর্ভাগ্যজনক। এবং যার প্রাপ্য নয় এমন ব্যক্তির হাতে এটা পড়াটাও একটি গভীর এবং বিষাদময় ক্ষতি।

যারা স্বল্পস্থায়ী এবং মূল্যহীন বস্তুর জন্য তাদের ভালবাসার সম্পদ বিসর্জন দেয় তারা স্বর্গীয় প্রেম থেকে বঞ্চিত। এ ধরনের মানুষদের জন্য মহান সূফী সাধক জালালুদ্দীন রূমী নিম্নলিখিত নির্দেশনামূলক উদাহরণের সূচনা করেছেন,

"যারা এই পৃথিবীকে ভালবেসেছে এবং এর জন্য তাদের হৃদয়কে উৎসর্গ করেছে তারা ছায়া শিকারী সদৃশ। কিভাবে একটি ছায়া তার হবে? একইভাবে একজন নির্বোধ শিকারী একটি সত্যিকার পাখীর সাথে তার ছায়াকে গলিয়ে ফেলে এবং সেটা ধরার চেষ্টা করে। ছায়া শিকারীর কর্মকান্ড দেখে এমনকি গাছের ডালে বসা সত্যিকার পাখীটি কৌতুক বোধ করে।"

যে হৃদয়ে ভালবাসার বীজ ডালপালা মেলে না সেই হৃদয়কে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা যায় না। অহংকারের অনুভূতির দাস হয়ে এক অর্থে তারা আধ্যাত্মিক অনুভূতির ধ্বংস বহন করে। তথাপি যে ভালবাসা আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের স্বর্গীয় ঝর্না থেকে পুষ্টি লাভ করে তা অনেকটা স্বর্গের পুষ্পের মত চমৎকার সুগন্ধ ছড়ায়। এমনকি যদি কখনো কখনো তাদের

ফুলগুলো মলিন এবং পাতা ঝরে যায়। তা হলো, পুনরুদ্ধার এবং পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তির জন্য ঝর্নাদারা থেকে হাসিটুকু।

যারা স্বর্গীয় ভালবাসা অর্জন করে, যা ভালবাসার উৎস তারা অন্য প্রাণীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। অন্যকথায়, তার স্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে এসব প্রাণীদের দেখতে পারার ক্ষমতা অর্জন করে। যে সমস্ত আল্লাহর বন্ধুরা এই চূড়ায় পৌঁছায় তারা নিজেদের সব ধরনের অহংবোধ সম্পন্ন উল্লাস থেকে পরিশুদ্ধ বা মুক্ত করতে পারে এবং এই উপলব্ধি নিয়ে বাঁচে যে, সত্যিকার আনন্দ আল্লাহর জ্ঞানে এবং ভালবাসায় নিহিত। হাদীস কুদসীতে বলা হয়েছে যে, *"আমার বান্দারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের উপর প্রদত্ত ধর্মীয় কর্তব্যগুলো পালন না করে। এবং আমার বান্দারা আমার নৈকট্য লাভের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করতে থাকে যতক্ষণ না আমার ভালবাসা লাভ করে। তারপর যখন আমি তাকে ভালবাসি আমি তার শ্রবনেন্দ্রিয় হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে। তার দৃষ্টি হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। তার হাত হয়ে উঠি আমি, যে হাত দিয়ে সে কাজ করে এবং তার পা বনে যা দিয়ে সে হাঁটে।"* (বুখারী, রিকাক, ৩৮)

এই আধ্যাত্মিক শীর্ষবিন্দু পৃথিবীর সবচে' উঁচু পাহাড়ের চূড়ার মতই দুর্লভ। যারা এই স্বর্গীয় মাধুর্য্য এবং আশীর্বাদ অর্জন করে তাদের ব্যক্তিত্বের নির্ধারক উপাদান তাদের ব্যক্তিত্বকে অসাধারণ করে তোলে। এ ধরনের মানুষেরা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের সাথে বিশিষ্ট পন্থায় কথা বলে। এটা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র যা দরকার তা হলো সেই সব জীবদের ভাষার সাথে হৃদয়ের পরিচয়।

যারা শুনতে পারে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত আছে যা গায়ক পাখী, কোমল ফুল অথবা ছোট নদীর তরঙ্গ দ্বারা উৎসারিত হয়। রাতের বাতাস সীমাহীন গল্প বলতে পারে যারা সজাগ তাদের জন্য। সকালের বাতাস কত ধরনের মৃদু মন্দ হাওয়া বয়ে আনে? ভালবাসা এবং সমবেদনায় পূর্ণ একটি হৃদয়ের অধিকারী একজন নিখুঁত বিশ্বাসী তারাই, যারা এই পৃথিবীর স্বর্গীয় গোপনীয়তা এবং প্রজ্ঞার ধারাকে গভীরভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এসব স্বর্গীয় রহস্য এবং চমকপ্রদ শিল্পের সাক্ষী হওয়ার পর স্বর্গীয় প্রেমের উত্তপ্ত গানগুলো একটি সুস্থ মস্তিস্ক এবং জীবন্ত হৃদয়কে স্পর্শ না করা কি সম্ভব?

প্রিয়তমের গুরুত্ব এবং পূর্ণাঙ্গতার সাথে সাথে ভালবাসার মূল্য যথোচিত হয়। সেই অনুসারে মানবিক ভালবাসার চূড়া বা শীর্ষ বিন্দু হলো নবীজির জন্য ভালবাসা। কেননা, অন্য কোন মানুষকে কল্পনা করা অসম্ভব যার তাঁর থেকে বেশী ভালবাসা প্রাপ্য।

তথাপি ভালবাসার জন্য নবী মুহাম্মাদ সা. শেষ গন্তব্য নন। কেননা মানুষের ভালবাসার চূড়ান্ত গন্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলা। যিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। মানুষের শেষ

পর্যায় এবং চূড়ান্ত গন্তব্য হলো আল্লাহ যা আধ্যাত্মিক প্রেমের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। সূফীরা এই নির্দিষ্ট স্থানটিকে বলেন, "ফানা ফিল্লাহ' এবং 'বাকা বি- আল্লাহ'। এই অবস্থান নদী যেমন সাগরে নিমজ্জিত হয় হয়, ঠিক তেমনি।

আল্লাহর এক মাহন বন্ধু তার কবিতায় 'ফানা ফির রাসুল (এর অর্থ, যে সমস্ত গুণাবলী নবী মুহাম্মাদের সুন্নাহ এর সাথে পরস্পর বিরোধী তা অহংকে দমন করার মাধ্যমে হৃদয় থেকে মুছে দেয়া) এবং 'ফানা ফিল্লাহর জ্বলন্ত আগুনকে নিম্নলিখিত কবিতায় মূর্ত করেছেন,

"হে আমার প্রিয়তম! তোমার সৌন্দর্য্যের প্রকাশে, বসন্ত প্রজ্বলিত!

গোলাপ, নাইটেঙ্গেল, সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত ফুলে মাটিতে এবং কাঁটায় আগুন লেগেছে।

সূর্যের মত উজ্জ্বল, তোমার আলোয়, সব প্রেমিকেরা জ্বলছে।

হৃদয়ে আগুন, বক্ষে আগুন এবং কন্দরদের দুচোখে আগুন লেগেছে।

এই সব আগুন দিয়ে শহীদের ভালবাসার শবকে কি ধোয়া সম্ভব?

শরীরে আগুন, শবধারে আগুন এবং ঠান্ডা সুমিষ্ট পানিতে আগুন লেগেছে।"

আল্লাহর প্রেরিত দূত মহানবীকে সত্যিকারভাবে ভালবাসলেই আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা সম্ভব; স্বর্গীয় ভালবাসা পাওয়ার আগে এটাই হলো মনুষ্য ভালবাসার শেষ বা চূড়ান্ত পর্যায়। এই কারণেই যারা মহানবীকে ভালবাসে না তারা আল্লাহকে ভালবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম নয়। জানা উচিত যে, শুধুমাত্র ভারবাসা এবং ক্ষমার নদী স্বর্গীয় ভালবাসার সাগরে মিশে যায়। আর যা হল মহানবরি প্রতি ভালবাসা। মহানবীকে ভালবাসার অর্থ আল্লাহকে ভালবাসা; তাঁর অনুগত হওয়া মানে আল্লাহর অনুগত হওয়া এবং তাঁকে অমান্য করা মানে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। ফলশ্রুতিতে মহানবীর আশর্বিাদময় অস্তিত্ব হয়ে ওঠে পুরো মানবতার জন্য ভালবাসার অভয়ারণ্য। কুরআনে বলা হয়েছে, **"বলঃ যদি তুমি আল্লাহকে ভালবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন এবং তোমার সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। কেননা আল্লাহ সবসময় ক্ষমাশীল, সবচেয়ে করুণাময়।"** (আল ইমরান, ৩:৩১)

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ভালবাসার সবচেয়ে উলেখযোগ্য চিহ্ন হলো প্রিয়তমের জন্য আত্মবিসর্জন এবং আত্মসমর্পন। প্রেমিকের হৃদয়ে ভালবাসার মাত্রার উপর নির্ভর করে সে তার প্রিয়তমের সঙ্গে কতখানি একাত্ম হতে পারবে। যদি অন্তরে ভালবাসা থাকে তবে সেখানে আন্তরিকতা অভিপ্রায়ের শুদ্ধতা এবং স্বর্গীয় আর্শীর্বাদও থাকবে। মানুষের কর্ম তখনই উচুঁ দরের হয় যখন তা সে ভালবাসা দিয়ে সম্পাদন করে। বিপরীতে

যে কাজগুলো ভালবাসা দিয়ে করা হয় না সেগুলো ভানে ভরা। আন্তরিকতা বহির্ভূত হয় এবং শুধুমাত্র অহংকারকেই শক্তিশালী করে।

এমনকি ছোট্ট একটা কাজ যদি ভালবাসার জন্য করা হয় তা বাহ্যিক ভাবে মূল্যবহ কিন্তু অনান্তরিক কাজের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। স্বর্গীয় ভালবাসায় এর গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। কেননা, স্বর্গীয় ভালবাসা হলো সব ধরনের ভালবাসার চূড়া। স্বর্গীয় ভালবাসার আশীর্বাদধন্য হতে পারলেই একজন বান্দার জন্য সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ অর্জন। তথাপি এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আর সব কিছুর মত ভালবাসাও সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। অতএব, তাঁর অনুমতি ছাড়া একজন বান্দা কখনো সেই স্তরে পৌঁছাতে পারে না। সুতরাং একজন বান্দার উপর যে দায়িত্বগুলো বর্তায় তা হলো, প্রার্থনা করা, মিনতি করা এবং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা। কুরআন বলে, **"বল (প্রত্যাখ্যানকারীদের উদ্দেশ্যে) আমার প্রভু কখনোই তোমার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন না যদি না তুমি তাঁর ইবাদত কর। কিন্তু তুমি আসলেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছ এবং শীঘ্রই সেই অপরিহার্য্য শাস্তি আসবেঃ।"** (ফুরকান, ২৫:৭৭)

স্বর্গীয় ভালবাসা এবং সমবেদনা নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্ম করলেই আল্লাহকে ভালবাসতে পারা সম্ভব এবং এটাই তাঁকে ভালবাসার চিহ্ন। আর এই কাজগুলো গভীর সম্ভ্রমের সাথে নিজের বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলো সম্পাদানের পর শ্রদ্ধা, দয়া এবং আনন্দের সাথে করতে হবে। এই পর্যায়ে চলা অক্ষুন্ন রাখলেই স্বর্গীয় ভালবাসা লাভ করা সম্ভব। স্বর্গীয় ভালবাসার অর্থ হলো মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অনুধানবন করা। আর সব ধর্মীয় দায়িত্ব কর্তব্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহকে ভালবাসা। অন্য সব কাজ হলো এই ভালবাসারই বহি:প্রকাশ মাত্র।

এটা স্বাভাবিক যে, যখন একজন বিশ্বাসীর অন্তরে আল্লাহর জন্য মোহাব্বাত বৃদ্ধি পায় তখন আল্লাহর ওয়াস্তে তার ভাল কাজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সে কারণেই যারা আল্লাহকে ভালবাসার পথে অগ্রগতি সাধিত করে তারা শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক কাজগুলো করে সন্তুষ্টি অনুভব করে না। পরিবর্তে তারা যেই যত্ন এবং আনন্দ নিয়ে বাধ্যতামূলক কাজগুলো করে থাকে সেই একই অনুভূতি নিয়ে তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কিছু করে। ফলে মরুভূমিতে যেমন পানি পান করার আকাঙ্খা তীব্রতর হয় ঠিক তেমনি ভাল কাজ করার আকাঙ্খাও তাদের মধ্যে তীব্রতর হয়। এই পর্যায়ে কোন কিছুই মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন ছাড়া, স্বস্তি দেয় না। কুরআনে যেমন বলা হয়েছে, **"(ন্যায়বান আত্মা বলবে:) পুরো বিশ্রামে এবং সন্তুষ্টিতে থাকা হে আত্মা! ফিরে এসো তোমার প্রভুর কাছে, তাঁর কাছে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে আনত হও!"** (ফাজর, ৮৯:২৭-৩০)

যে বিশ্বাসীরা স্বর্গীয় ভালবাসার এই স্তরে পৌঁছেছে, তারা নিশ্চিতভাবে তাদের পুরো জীবন এবং প্রতিটি শ্বাস ইবাদতে নিবেদন করার চেষ্টা করে। তারা নির্জন জায়গায়, রাতের আঁধারে, মানুষের প্রশংসা থেকে দূরে বসে আল্লাহর ইবাদত করে। আল্লাহর বান্দা হওয়ার অন্তহীন সচেতনতা নিয়ে, 'ইহসান' এর (যার অর্থ, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, যেন সে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে এবং আল্লাহ সব সময় তার কর্মের উপর নজর রাখছেন এই সচেতনতা নিয়ে বাস করা) আশ্রয়ে ভালবাসার পান করে তাদের তৃষ্ণা নিবারন করার চেষ্টা তারা করে। যদি প্রয়োজন হয় এভাবে তারা তাদের সম্পত্তি, পদমর্যাদা, সমস্ত বৈষয়িক বিষয় আশয় এবং এমনকি তাদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। সর্বোপরি, তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা এবং সন্তুষ্টি লাভের মিনতি অব্যাহত থাকে।

আম্মার বি. ইয়াসিরের জীবন থেকে নিম্নলিখিত ঘটনাটা উল্লেখ করা গেল। যেখানে দেখানো হয়েছে মহানবী সা.-এর সম্মানিত সাহাবীদের আল্লাহর প্রতি ভালবাসা এবং স্রষ্টার ইচ্ছার প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্পন। একটি যুদ্ধের আগে ইউফ্রেতিস নদীর তীরে হাঁটার সময় আম্মার তাঁর অন্তর্গত অনুভূতিগুলো যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা এইরূপ, "হে আমার প্রভু! যদি আমি জানতে পারি যে ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ঝাঁপ দিলে তুমি সুখী হবে তাহলে আমি এখনই তা করবো। যদি আমি জানতে পারি যে, একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিলে তুমি আরও খুশী হবে, তবে এখনই আমি তা করবো। হে আমার প্রভু! আমি যদি জানতে পারি যে, পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে গেলে তুমি আরও খুশী হবে তবে তৎক্ষনাৎ আমি ঝাঁপ দেবো। হে আমার প্রভু শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমার কাছে আমার নিবেদন আমাকে হারিয়ে ফেলো না। আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভে ইচ্ছুক।" (তাবাকাত ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, ২৫৮)

আমাদের ধর্মের মর্মকথা হলো আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহর অনুসরণ করে আশীর্বাদপুষ্ট হওয়া। স্বর্গীয় ক্ষমা এবং বন্দুত্বের জন্য এটাই একমাত্র পন্থা। আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য উচ্চতম স্তর হলো আল্লাহকে ভালবাসতে পারা। কেননা ঐশ্বরিক উপস্থিতির দরজা একমাত্র ভালবাসার চাবি দিয়েই খোলা যায়। ভালবাসা শুধুমাত্র বাগ্মীতা হওয়া উচিত নয়। অন্তরের কথার প্রতিফলন ফাঁকা বুলিতে হয় না। এবং আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভালবাসার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর সবচে' খারাপ দিক হলো, এ ধরনের কৃত্রিমতা শুধুমাত্র আত্মগরিমা, ক্ষমতা এবং বিত্তই আনয়ন করে।

মহান সাহাবীরা প্রকৃত ভালবাসার সবচেয়ে বাস্তব উদাহরণের নায়ক। তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে এবং উদ্দেশ্যে আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের জন্য ভালবাসার তাঁরা জীবন্ত উদাহরণ। এরকম কিছু উদাহরণ নীচে দেয়া হলো।

আল্লাহর রাসূল সা. মক্কার অদূরে গ্রোত্রগুলোতে কুরআর শিক্ষকদের পাঠালেন। গ্রোত্রগুলোর মধ্যে আদাল এবং কারে-এর গোত্র শিক্ষক পাঠাতে অনুরোধ করেছিল। গোত্র দু'টির উদ্দেশ্যে দশজন শিক্ষকের একটি দল রওনয়ানা দিল। যাত্রা পথে তাদের আক্রমণ করা হলো। সংঘাতে আটজন শিক্ষক শহীদ হলেন এবং বাকী দুইজনকে বন্দী করা হলো। জায়েদ ইবনে আল দাসিনা এবং খুবায়েব ইবনে আদি নামক এই দুই সাহাবীকে আক্রমণকারীরা মক্কার বহু দেবতায় বিশ্বাসীদের হাতে তুলে দিল। যারা তাদের মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছিল। তাদের হত্যা করার আগে বহু ইশ্বরবাদীরা জায়েদকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি মুহাম্মাদের সাথে জায়গা বদল করে নিজের জীবন বাঁচাতে চাও?" জায়েদ খুব করুণাভরে আবু সুফিয়ানকে, যে তাকে প্রশ্ন করেছে, তাকে দেখল এবং বলল, "আমি যে শুধু আমার পরিবার এবং সন্তানদের সাথেও থাকাটা গ্রহণ করতে পারছি না তাই নয়। তাঁর পায়ে চোটে কাঁটা ফুটুক, তাও চাই না।" (আবু নুয়াম, মারিফাত আস সাহাবা)

এই অতুলনীয় ভালবাসার প্রমাণ পেয়ে আবু সুফিয়ান বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে বলল, "আসলেই আমি বিস্মিত! মুহাম্মাদের প্রতি তাঁর সাহাবীদের ভালবাসা পৃথিবীর আর কোন মানুষের মধ্যে দেখিনি।"

এর পরে বহু ঈশ্বরবাদীরা খুবায়েব এর কাছে গেল এবং তাকে বলল যে সে যদি তার বিশ্বাস ত্যাগ করে তবেই তার জীবন বেঁচে যাবে। মহান সাহাবী খুবায়েব এর প্রতিক্রিয়া ছিল বেশ পরিস্কার। "এমনকি যদি তোমরা আমাকে পুরো পৃথিবীটাও দিয়ে দাও তবু আমি আমার বিশ্বাস ত্যাগ করবো না।" শহীদ হওয়ার আগে খুবায়েব এর একটি মাত্র অন্তিম ইচ্ছা ছিল, নবী মুহাম্মাদ সা.-কে ভালবাসার অভিবাদন পাঠানো।

কিন্তু কে নবীজির কছে এই অভিবাদন নিয়ে যাবে? অসহায় খুবায়েদ আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীর আন্তরিকতার সাথে প্রার্থনা করলেন, "হে আমার প্রভু! এখানে কেউ নেই যে, আমার অভিবাদন তোমার দূতের কাছে পৌছে দেবে। আমার অীভবাদন তাঁর কাছে পৌঁছে দাও!"

ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহর প্রেরিত দূত মুহাম্মাদ মদীনায় তাঁর সাহাবীদের সাথে বসা অবস্থায় উচ্চারণ করলেন, "ওয়ালাইহিস্‌সালাম," যার অর্থ "তার উপর আল্লাহর শান্তি এবং আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।" একথা শুনে সাহাবীরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কার অভিবাদনের জবাব আপনি দিলেন? তিনি জবাব করলেন, "তোমাদের ভাই খুবায়েব-এর অভিবাদন!"

মক্কার বহু ঈশ্বরবাদীরা দুইজন সাহাবীকেই নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করে শহিদ করল। মহান সাহাবী খুবায়েব রাদি.-এর মৃত্যুর আগের শেষ কথাগুলো খুব উল্লেখযোগ্য। "মুসলিম

হিসেবে শহীদ হওয়ায় আমি গর্বিত, কিভাবে আমার মৃত্যু ঘটল তাতে আমার কিছু যায় আসে না।" (বুখারী, মাগাজি, ১০; ওয়াকিদি, মাগাজি, পৃ. ২৮০-৮১)

একইভাবে আল্লাহর প্রেরিত দূতের প্রতি ভালবাসার কারণে তরুণ সাহাবীরা তাঁর কুটনীতিজ্ঞ হওয়ার গৌরবে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করতো। তারা তাঁর ধর্ম প্রচারের চিঠিগুলোও বিলি করার দায়িত্ব নিতে চাইতো। এমনকি তাঁর যে কোন ইচ্ছা পূরনের লক্ষ্যে তারা নিজকে নিবেদিত করতে চাইতা। তার জন্য যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে হোক না কেন মহানবীর প্রতি অন্তহীন ভালবাসার এটা একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত। সীমাহীন মরুভূমি এবং উচুঁ উচুঁ পাহাড় অতিক্রম করে তারা সাহসের সাথে রাজাদের সামনে বার্তাটি পড়তো। পিছনে দাঁড়ানো থাকতো জলাদ।

নবীজির প্রতি সাহাবীদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল যে, তারা তাঁর শারিরীক বর্ণনা প্রায় দিতেই পারতো না। খালিদ বি. ওয়ালিদ যখন একটি মুসলিম গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন গোত্রপ্রধান তাকে নবীজির শারিরীক বর্ণনা দিতে বলল। খালিদ রাদি. উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি তাকে বর্ণনা করতে পারবো না।"

গোত্রপ্রধান তাকে অনুরোধ করেছিল, "যতটুকু জানেন ততটুকুই আমাকে বলুন।"

খালিদের রাদি. উত্তর ছিল, আমি আপনাকে এতটুকুই বলতে পারি যে, "মহানবীর পদমর্যাদা তাঁকে প্রেরণকারী আল্লাহর সম্মানের দিকে বিবেচনা করে বলা যায়। প্রেরণকারী যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, তাহলে তাঁর প্রেরিত দূতের পদ মর্যাদাটা কল্পনা করুন। "

আমর বি. আস রাদি. একই প্রশ্নের উত্তর নিম্নলিখিত ভাষায় দিয়েছিলেন,

"আমি কখনোই আল্লাহর প্রেরিত দূতকে সযত্নে লক্ষ্য করিনি, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধই এর কারণ। অতএব, আপনি যদি তার শারিরীক বর্ণনা করতে বলেন, আমি তা করতে পারবো না।"

নবীজির প্রতি সাহাবীগণের ভালবাসার প্রকাশ সাহাবীগণের নবীজির আদেশ পালন এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে তাঁর নেতিক উৎকর্ষতা সম্পন্ন চরিত্রকে নিজের ভিতরে আত্মভূত করার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যায়। একজন প্রেমিক যতটুকু তাঁর প্রিয়তমাকে ভালবাসবে, তত দৃঢ়ভাবে সে তাকে অনুসরণ করবে। আল্লাহর প্রেরিত নবী এই পৃথিবীর দয়া এবং সৃষ্টির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী অন্তহীন ভালবাসা এবং মমতার সাথে এর অখণ্ডতাকে স্বীকার করা।

তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ আবু আব্দুর রাহমান জাবেলী এভাবে বিবৃত করেছেন,

"বাইজান্টাইন এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়, আমরা আবু আইয়ুব আল আনসারীর রাদি. সাথে একই জাহাজে ছিলাম। আমাদের নেতা ছিলেন আব্দুল্লাহ বি. কায়েস। যখন মহান সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী যুদ্ধের লুটের মাল বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকটির কাছে আসলেন, তখন তিনি একজন মহিলাকে কাঁদতে দেখলেন। মহিলাটি যুদ্ধ বন্দী। আবু আইয়ুব আনসারী তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে। তারা বলল, "এই মহিলার একটি শিশু সন্তান ছিল তারা তাকে তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এ কারণে সে কাঁদছে।"

আনসারী তৎক্ষণাৎ তার সন্তানকে খুঁজে মায়ের কাছে ফেরত দিলেন। তারপর মহিলাটির কান্না থামল। লুটের মালের দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসারটি তার সেনাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ বি. কায়েসের কাছে এ ব্যাপারে নালিশ করল। কায়েস এর কারণ জানতে চাইলে আইয়ুব আনসারী রাদি বললেন, "আমাকে আল্লাহর নবী বলেছিলেন, "যারা মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নেয়, তাদেরকে আল্লাহ শেষ বিচারে দিন তাদের ভালবাসার মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন।" (মুসনাদ আহমেদ, ৫ম খণ্ড, ৪২২; তিরমিযী, বুয়ু, ৫২, ১২৮৩)

এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ এবং নবীকে ভালবাসার জন্য তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ক্ষমা, মমতা এবং ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকানো প্রয়োজন। এর কারণ বিশ্বাসের সর্বোৎকৃষ্ট ফসল হলো ভালবাসা এবং ক্ষমা।

নিম্নলিখিত নির্দেশনামূলক ঘটনাটি তাবৎ সৃষ্টির প্রতি ক্ষমা এবং ভালবাসা দেখানোর সহজাত আশীর্বাদকে আরও পরিস্ফুট করে এবং দেখায় যে কিভাবে এই ঝোঁক মানুষকে বিশ্বাসের উৎসে পৌঁছে দেয়।

মহানবীর যুগকে সুখের যুগ বলা হয়। সাহাবীদের মধ্যে হাকিম বি. হিজাম রাদি. বলে একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নবীজির পত্নী খাদিজার আত্মীয় ছিলেন। তিনি খুব সদাশয়, সমব্যথী এবং দানবীর ব্যক্তি ছিলেন। প্রাক-ইসলাম যুগে তিনি ছোট ছোট কন্যা শিশুদের তাদের বাবাদের কাছ থেকে কিনে নিতেন। কেননা সেই সময়ের বাবারা তাদের কন্যা শিশুদের অবাঞ্ছিত ভাবতো এবং জীবন্ত কবর দিতো। এভাবে তিনি শিশুদের জীবন বাঁচাতেন এবং তাদের রক্ষা করতেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি নবীজির কাছে জানতে চাইলেন, মুসলিম হওয়ার আগে তার করা ভাল কাজগুলো কি কোন সাহায্যে আসবে? নবী মুহাম্মাদ সা. হাকিমকে উত্তর দিয়েছিলেন, এই ভাল কাজগুলোই তার মুসলিম হওয়ার পিছনে আশীর্বাদ রূপে কাজ করেছে।

যদি সমবেদনা সহকারে জীবিত প্রাণীদের সাথে আচরণ করা যায় তবে অবিশ্বাসীদেরও তা প্রকৃত ধর্ম নিয়ে আসার গৌরবে আশীর্বাদের কারণ হয়। এটা সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার।

তাহলে যুক্তি অনুসারে বোঝা যায় যে, এ ধরনের আচরণ ইতোমধ্যেই যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য আরও বড় পুরস্কার বয়ে নিয়ে আসবে।

আল্লাহর বান্দাদের দেয়া আল্লাহর সবচে' সেরা পুরস্কার হল প্রকৃত বিশ্বাস। আমাদের স্রষ্টা আদেশ দেন যে, এই পুরস্কারকে আমাদের জীবদ্দশায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সযত্নে লালন করতে হবে। কুরআন বলে, **"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর। যা তাঁর প্রাপ্য এবং বিশ্বাসী না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।"** (আলে ইমরান, ৩:১০২)

বিশ্বাসের আশীর্বাদের সবচেয়ে সেরা ফসল হলো সৃষ্টিকে সৃষ্টার চোখ দিয়ে দেখা এবং তাবৎ জীবকে ভালবাসা। এটা একজন বান্দাকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে এবং তাকে ক্ষমা, দয়া ও ভালবাসার জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। তাহলে সৃষ্টির প্রতি দয়া, মমতা, ক্ষমতা ছড়িয়ে দেয়া উচিৎ। আল্লাহর মহান বন্ধু জালালুদ্দিন রূমী এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেন, একজন মাতাল লোক ধর্মীয় হিতোপদেশ চলাকালে সূফী আবাসে আসল। সূফী দর্শনের শিষ্যরা মানে দরবেশরা তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন এবং অপমান করলেন। রূমী এমনভাবে মাতাল লোকটির সাথে আচরণ করলেন যেন সেও প্রকৃত বিশ্বাস সম্পর্কে শিখতে এসেছে। তারপর তিনি সেই সব মানুষদের উদ্দেশ্যে বললেন, যারা মাতাল লোকটাকে অপমান করেছে "যদিও এই লোকটিই ওয়াইন পান করেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমরাই মাতাল হয়েছো।"

পাপের প্রতি নিদারুন বিরুক্তির স্বাভাবিক অনুভুতির সাধারণীকরণ করা উচিৎ নয়। এই গল্পটি তারই একটি বাস্তব উদাহরণ। বিপরীতে একজন পাপীকে আহত পাখী হিসেবে দেখা উচিৎ। যার সমবেদনাপূর্ণ আচরণ দরকার এবং তাকে হৃদয়ে জায়গা দিয়ে শিক্ষা এবং দিক-নির্দেশনা দেয়া উচিৎ। উস্তাদ আহমেদ ইয়েভি এই বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। "যেখানেই তুমি একজন ভগ্নহৃদয় মানুষ দেখবে, তার আরোগ্যের কারণ হয়ো।

এরকম বঞ্চিত কেউ যদি জীবন তরী আর বইতে না পারে। তবে তার বন্ধু হয়ো।" এটা ভুললে চলবে না, "সুখের যুগের ফসল দিয়ে আজকের বিশ্বাসী সমাজ আশীর্বাদ ধন্য হয়েছে। নবীজির সময়কেই 'সুখের যুগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান সাহাবী এবং আল্লাহর বন্ধুরা এই পবিত্র বিশ্বাস পরবর্তী প্রজন্মদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তারা আল্লাহর জন্য তার চারপাশে ঘুরেছেন। অতএব তারা আমাদের বিশ্বাসের আকাশে তারার মত দীপ্তি ছড়িয়েছেন। বিশ্বাসের বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আশীর্বাদ এবং ক্ষমার উৎস হয়েছেন। আমাদের যুগের আলোকবর্তিকা হয়েছেন এবং পৃথিবীতে মহিমান্বিত আল্লাহর সাক্ষী হয়েছেন।

স্বর্গীয় প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহর ধর্ম প্রচারে নবীজি তাঁর সাহাবীগণ এবং আলাহর অনুগত বান্দারা যে ব্যতিক্রমী শ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা আমাদের জন্য উদাহরণ হিসেবে কাজ করা উচিত। আমাদের উপর অর্পিত এই স্বর্গীয় বিশ্বাস কখনোই ত্যাগ না করা এবং ভবিষৎ প্রজন্মের কাছে তা নির্ভেজাল শুদ্ধতা এবং সুস্পষ্টতার সাথে হস্তান্তর করার চেষ্টা করার দায়িত্ব পালন করলে আমাদের পরকালে শ্বাস্বত সুখের তা উৎস হয়ে উঠবে। বিশ্বাসীর অন্তর বিশ্বাসের আনন্দ এবং উঁচু স্তরের স্বর্গীয় প্রেমকে সবসময় অনুভব যেন করতে পারে। কারণ সত্যিকারের সুখ শুরু হয় যখন স্বল্পস্থায়ী ভালবাসার সীমাবদ্ধ সীমানাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে।

ক্ষণস্থায়ী ভালবাসার দাসত্ব থেকে মুক্তিই হল শ্বাস্বত আশীর্বাদ অর্জনের পূর্বশর্ত। হৃদয় থেকে তাৎক্ষণিক ভালবাসা দূর করার উপায় হলো, প্রতিটি ভালবাসার চূড়ান্ত লক্ষ্যকে আল্লাহর সাথে যোগ করা। সব ভাল কাজ যেমন, দেশ ও জাতির পরিবার, সন্তানের জন্য ভালবাসা, ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ, ইবাদত, দান-খয়রাত এবং ভাল আচরণ বা শিষ্টাচার, স্বর্গীয় প্রেম এবং আনন্দের দিকে টেনে নিয়ে যায় যদি সেগুলো আল্লাহকে ভালবাসার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিকে দেখা সব কিছুই দৃষ্টান্তস্বরূপ। সামগ্রিকভাবে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার কারণে তারা তাদের অস্তিত্বকে বিসর্জন দেন। এমনকি দরিদ্র সাহাবীরাও তাদের অল্প সম্পত্তি কোন রকম ইতস্ততা ছাড়াই বিসর্জন দেন। যাতে করে আল্লাহ এবং নবী থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়েন এবং তার সাথে থাকতে পারেন।

কবি ফুজুলি, নিচের উদাহরণে কিভাবে হৃদয় ভালবাসার কেন্দ্র হয় এবং কিভাবে কেউ ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায়, তা ফুটিয়ে তুলেছেন,

"লায়লার গ্রামে হেঁটে বেড়ানোর সময় মজনুকে বিদেশীরা জিজ্ঞাসা করল লায়লার বাড়ীটা কোথায়?

মজনু উত্তরে বলল, "তার বাড়ীর খোঁজ করে বৃথাই হয়রান হয়ো না।"

তারপর সে তার নিজের হৃদয়ের দিকে নির্দেশ করে বলল, "এখানেই লায়লার বাড়ী।"

আমাদের এই উদাহরণে প্রতিফলিত গূঢ়ার্থ অনুধাবন করা উচিৎ। আল্লাহ এবং নবীর জন্য আমাদের হৃদয় কতখানি ভালবাসায় পূর্ণ? আমাদের ইবাদত এবং আচরণে বিশ্বাসের আনন্দ প্রতিফলিত হয় কি? অথবা ভালবাসা কি শুধুই একটি বাগ্মীতাপূর্ণ শব্দ যা জিহবা ছাড়িয়ে হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে না? আমাদের হৃৎস্পন্দন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং চর্চা কতখানি কুরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী? ক্ষণস্থায়ী জাগতিক আশীর্বাদকে আমরা স্বর্গীয় ভালবাসায় কতখানি পরিবর্তিত করতে পারি?

উমন রা. উচ্চারিত অনুশাসন অনুযায়ী আমাদের অবস্থা সব সময় নিরীক্ষণ করা দরকার। “ঐশ্বরিক বিচারালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার আগেই নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি কর।” নবী মুহাম্মাদের ব্যক্তিত্ব এবং আধ্যাত্মিকতাকে যারা উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করে তারা কত সুখী এবং তারাই স্বর্গীয় প্রেমের সত্যকে বুঝতে পারে।

হে আমাদের প্রভু! বিশ্বাসের আশীর্বাদ দিয়ে আমাদের অন্তরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। যারা অমান্য এবং অবিশ্বাসের কদর্যতাকে দেখতে পায় তাদের মত আমাদের দেখার শক্তি দাও! যাদেরকে তুমি ভালবাসো তাদেরকে যেন আমরা ভালবাসি! যাদেরকে তুমি অপছন্দ কর, তাদেরকে যাতে আমরা অপছন্দ করি। তোমার ভালবাসা নবীর ভালবাসা এবং তুমি যাদেরকে ভালবাসো তাদের ভালবাসা নিয়েই যেন আমরা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি।

আমীন।

তাসাওউফ সম্পর্কে ওসমান নূরী তপবাসের সাথে সাক্ষাৎকার

আলতিনউলোক: আপনার বই "ঈমান থেকে ইহসান (বিশ্বাসের অন্ত:স্থকরণ)"- এ আপনি বলেছেন যে, একজন মুসলিমের জীবনে সূফী দর্শন খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের বিস্তারে এবং একই সাথে সত্যের পথে মানক্ষিক আত্মাকে পূর্ণাঙ্গতা এবং দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য সূফী দর্শনের উপযোগিতা কী? এর সফলতার পিছনের রহস্যটা কী?

তপবাস: ইসলাম চর্চায় মানুষের প্রশিক্ষণের বিশেষ পদ্ধতিই হলো 'তাসাওউফ'। ইসলামের বাহ্যিক দিক হলো 'শরিয়াহ'। আর একটি নৈতিকতাপূর্ণ জীবনের পথে মানুষকে পরিচালিত করার লক্ষ্যে শরিয়াহ এ রয়েছে পুরস্কার এবং শাস্তির ধারণা। অন্যকথায়, একজন মুসলিমের জীবনকে সুনির্দিষ্ট আকৃতি দেয়ার জন্য শরিয়াহ এর মধ্যে রয়েছে বেহেশত এবং দোজখের মৌলিক ধারণা। অন্যদিকে 'তাসাওউফ' হল ইসলামের অন্ত:স্থ দিক। যার মধ্যে এর প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে রয়েছে ভালবাসা এবং ক্ষমা এবং এর সাথে যোগ করা হয়েছে বেহেশতের পুরস্কার এবং দোজখের শাস্তি। আজকাল মানুষ তাদের পাপ থেকে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এবং ধর্মের সুরক্ষিত বর্ম থেকে সরে গিয়ে বিপথগামী হচ্ছে। অহংবোধই এর কারণ। ক্ষমা এবং ভালবাসার মাধ্যমে পাপীদের মুক্তি সম্ভব। অতএব সূফী দর্শনের কোমল হাত পাপীদের দরকার হয় বলে তাসাওউফ এর পদ্ধতি বাড়তি অর্থবহতা লাভ করে। এটা শুধু আমাদের দেশেই যে গুরুত্ব পেয়েছে তা নয় বরঞ্চ পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ও যেখান সূফী পদ্ধতি বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছে। যারা অহংবোধ এবং শুধু যুক্তির উপর ভিত্তি করে তত্ত্বের ফাঁদে নিমজ্জিত তাদের সূফীরা ইসলাম ধর্মে আমন্ত্রণ জানায়। যা জীবন প্রদায়ক শ্বাস-প্রশ্বাস, পাপীদের প্রতি আমাদের আচরণ ঘৃণা এবং প্রতিহিংসাপূর্ণ না হয়ে ক্ষমা এবং সমবেদনায় পূর্ণ আশাবাদ হওয়া উচিত। একজন পাপী যে সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে সে ব্যক্তির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য। তাদের ভয়াবহ অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য অভিশাপ এবং বকা-ঝকা করা একটি হীন পদ্ধতি।

মানুষ যদি তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বহু দূরে বিচরণ করে তবু মানুষ হওয়ার কারণে তার অন্তর্জাত মূল্যের জন্য সে কিছু বিবেক এবং সম্মানের ভাগীদার। একজন পাপীর সাথে (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) ধূলায় মলিন পবিত্র হজরে আসওয়াদ পাথরের তুলনা করা যায়। এই মহামূল্যবান পাথরের সেই দু:খজনক অবস্থা দেখে কোন মুসলিমই উদাসীন থাকতে পারে না। এটাকে পরিস্কার এবং এর যথাযথ জায়গা স্থাপন করতে তারা ছুটে যায়।

কেননা এটা স্বর্গ থেকে আসার কারণে তাদের চোখে তা মহামূল্যবান। একইভাবে, কোন পতিত মানুষকে দেখে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক উপায়ে তাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের ছুটে যাওয়া উচিত।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি তাঁর অস্তিত্বের আধ্যাত্ম সত্তা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। সুতরাং প্রতিটি মানুষ স্বর্গীয় গোপনীয়তা ধারণ করে। সে কতটা পাপ করে তা বিবেচ্য নয়। কেননা, তার রয়েছে অন্তর্জাত মূল্য। যাকে কোন কিছুই ধ্বংস করতে পারে না।

রূমী বলেছেন, মানুষ খাঁটি। পরিস্কার পানির মত যার মধ্যে দিয়ে তাকে পরিস্কারভাবে দেখা যায়। যদি এই পরিস্কার পানি কর্দমাক্ত এবং ধূলায় আকীর্ণ হয় তখন এর মধ্য দিয়ে তাকে আর দেখা যায় না। তেমনি ঐশ্বরিক আলো দেখতে পাওয়ার জন্য এই পানিকে ময়লা মুক্ত করা প্রয়োজন। 'তাসাওউফ' এমন একটি পন্থা যার মাধ্যমে কামজ আকাংখা থেকে একজন ব্যক্তির আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা যায়। সূফীরা কাউকেই এই পরিশুদ্ধ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেন না। এমনকি যদি সেই ব্যক্তি পাপে নিমজ্জিত থাকে, তবুও না। এটাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত যে কাউকে সূফীরা সুযোগ দেন। নবীজির জীবনে সব ধররনের পাপীকে ক্ষমা করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যেমন, নবীজি তার প্রিয় চাচা হামজা রাদি.-এর হত্যাকারী ওয়াহসিকেও ক্ষমা করা থেকে বাদ দেন নি। ওহুদের যুদ্ধে ওয়াহসী যখন তার চাচা হামজাকে হত্যা করে তখন নবীজি গভীরভাবে শোকার্ত হয়ে হয়ে পড়েন। রাসুলুল্লাহ সা. ওয়াহসীকে শ্বাস্বত মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য তার কাছে একজন বার্তাবাহক পাঠান। ওয়াহসী এর উত্তরে নিম্ন লিখিত বার্তাটি পাঠায়, "হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাকে মুক্তির আহবান জানাতে পারেন না। কেননা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, '(তারাই আল্লাহর খাঁটি বান্দা) যারা অন্য দেবতাকে আল্লাহর শরীক করে না, আল্লাহর সৃষ্ট পবিত্র প্রাণীদের হত্যা করে না (ন্যায়নিষ্ঠ কারণ ছাড়া) এবং ব্যাভিচার করে না; এবং যে কেউ একাজগুলো করলে (শুধু যে) শাস্তি পাবে তাই নয়; শেষ বিচারের দিন তার দণ্ড দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এবং সে সেখানে চরম অপমানের সাথে বাস করবে।' (ফুরকান, ২৫: ৬৮-৬৯)। এই আয়াতে বর্ণিত প্রতিটি পাপ কাজ আমি করছি। আমার মুক্তির কোন সম্ভাবনা আছে কি?"

অনুতপ্ত পাপীদের সংশয় দূর করার লক্ষ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই আয়াতটি নাজিল করেন, **"বল, হে আমার বান্দারা, যাদের আত্মা নীতিভ্রষ্ট! আল্লাহর ক্ষমা সম্পর্কে হতাশ হয়ো না। কেননা আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করেন। কেননা তিনি সব সময় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"** (জুমার, ৩৯:৫৩)। এই আয়াত শুনে ওয়াহসী খুব খুশী হয়ে বলল, "হে আমার

প্রভু! আপনার ক্ষমা কী মহৎ!" আর কখনো এসবের পুনরাবৃত্তি হবে না এই নিয়ত করে সে তার সব পাপের জন্য অনুতপ্ত হলো এবং তার বন্ধুদের সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

নবীজির জীবনের এ ধরনের উদাহরণ থেকে তাসাউউফ এর আলো নেয়। নবীজি হলেন ঐশ্বরিক গুণাবলীর নিখুঁত বহি:প্রকাশের আধার এবং তাঁর উপরই স্বর্গীয় বিধানসমূহ নাজিল হয়েছে। সূফী দর্শন অনুযায়ী, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতার পরিমাপক দণ্ড অনুযায়ী মানুষই সবচে' উচ্চ অবস্থানে রয়েছে। কেননা মানুষের সৃষ্টি হয়েছে এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে। বাকী সব সৃষ্টির বিপরীতে সে চোখের মনির মত। কোন পাপই তার এই অন্তর্জাত গুণটিকে মুছে ফেলতে পারে না। এ সম্পর্কে তাসাউফের দৃষ্টিভঙ্গী খুব ভারসাম্যপূর্ণ। পাপীকে সহ্য করা যায় কিন্তু পাপকে নয়। আমরা পাপকে ঘৃণা করবো কিন্তু পাপীকে ক্ষমা প্রদর্শন করবো। যাতে করে পাপের পঙ্কিলতা থেকে সে উঠে আসতে পারে। তা করতে গিয়ে তাসাউউফ মানুষকে সবচে' কার্যকরী বা ফলপ্রসূ পদ্ধতি অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে তাদের আমন্ত্রণ জানায়। মানুষের প্রকৃতিই হলো ভালবাসা এবং ক্ষমার হাত দ্বারা প্রসারিত করে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। এ ধরনের কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে আব্দুল কাদির জিলানী, ইউনুস ইমরে, বাহাউদ্দীন নাকশবান্দী, জালালুদ্দীন রুমী এবং অন্যান্য আল্লাহর বন্ধুরা।

আলতিনউলুক: আপনি আমাদের দেখিয়েছেন, কিভাবে তাসাউফ একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গতার দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে অপবিত্রতা থেকে পরিশুদ্ধ করে। এই প্রেক্ষিতে একজন মুসলিমের জীবেন তাসাওউফ এর স্থান কোথায়? তাসাউফ ছাড়া কি একটি ধার্মিক জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব?

তপবাস: আপনার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর আমি একটি গল্পের মাধ্যমে দিতে চাই্। যা আমার বাবা মূসা আফেন্দী আমাকে বলেছিলেন,

খৃষ্টান ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া আমাদের এক প্রতিবেশী ছিল। একদিন আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম কেন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তার উত্তর ছিল, 'রবি মোল্লা নামের খুব উঁচু নৈতিকতাসম্পন্ন এক প্রতিবেশী, যে ব্যবসায়েও খুব নেকবখত ছিল, তার কারণেই আমি ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হই। তার অনেকগুলো গরু ছিল এবং দুধ বিক্রি করে সে জীবিকা নির্বাহ করতো। একদিন সে আমাদের বাড়ীতে আসল এবং একটি বিশাল পাত্র ভরা দুধ আমাকে দিয়ে বলল, "এটা তোমার দুধ।" আমি তাকে বললাম, "তোমার কাছে কোন দুধ আমি পাই না। মনে মনে ভাবলাম যে সে কোন ভুল করেছে।"

এই দয়ালু এবং মহান ব্যক্তিটি ব্যাখ্যা করল যেস্ব সে কেন দুধ এনেছে; বলল, "দূর্ভাগ্যবশত: তোমার বাগানে আমি আমার গরুকে ঘাস খেতে দেখেছি; আমি সেজন্য

দায়ী। সুতরাং এই দুধটুকু তোমার এবং আমি তোমার জন্য ততদিন পর্যন্ত দুধ আনবো যতদিন পর্যন্ত গরুটির পাকস্থলী থেকে ঘাসটুকু না পরিস্কার হবে।"

আমি তাকে বললাম, "এটা বলার দরকার নেই। আমার বাগানের ঘাসটুকু তোমার গরু খেয়েছে। এটা মূল্যবান কিছুই নয় এবং প্রতিদান হিসেবে আমি কিছু চাই না।" সে সবিনয় অনুরোধ জানালো যে, দুধের এই অংশটুকু আমার প্রাপ্য। এরপর সে আমাকে দুধ দেওয়া অব্যাহত রাখলো যতদিন পর্যন্ত না গরুর পেট থেকে ঘাস পরিস্কার না হলো।

রবি মোল্লার এই আচরণ আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল এবং অজ্ঞতার পর্দা আমার চোখ থেকে সরে গেল। পথ প্রদর্শনের আলো আমার হৃদয়ে ঝিকমিক করে উঠল এবং নিজেকে এই বলে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম যে, 'এইরকম ঋজু একজন ব্যক্তির ধর্ম নিশ্চিতভাবে সরল পথ। একটি ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই যে ধর্ম রবি মোল্লার মত দয়ালু, ন্যায় নিষ্ঠ এবং প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির জন্ম দেয়।' অতএব আমি কলেমা শাহাদাত উচ্চারণ করলাম।

এই ঘটনা এবং এরকম আরও বহু উদাহরণ প্রমাণ করে যে, একজন বিশ্বাসীর নৈতিকতা নিখুঁত করতে সূফীরা এবং তাদের পদ্ধতিই ইসলাম বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তাসাউফ দুইভাবে কাজ করে: প্রথমত, বিশ্বাসীদের নৈতিকতা নির্ভেজাল করতে এবং দ্বিতীয়ত সূফীদের দৃষ্টান্তমূলক আচরণ অনুসরণ করে ইসলামের বিস্তার লাভ। অমুসলিমদের নিকট এটা ইসলামের সমবেদনাপূর্ণ চেহারা দেখায় এবং ইসলামের নির্ভুল গঠন প্রকাশে সহায়তা করে।

ইসলাম হল আইন, ঈশ্বর সচেতনতা 'ফাতওয়া' এবং 'তাকওয়া'। ইসলামের বৈধ দিক হলো 'ফাতওয়া'। যা প্রাসাদের স্তম্ভস্বরূপ। অন্যদিকে সূফী বৈশিষ্ট্য 'তকাওয়া' হলো সেই প্রাসাদের পরিপূরক অংশ। যা মূল কাঠামোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং শক্তিশালী করে। তাসাউফ মুসলিমদের নৈতিকতা মজবুত করার সাথে সাথে ইসলামের এই দুই দিককে একত্রিত করে। তাসাউফ মানবজাতিকে কুরআন এবং বিশ্বব্রাহ্মাণ্ড সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং এই ব্রহ্মামাণ্ডে তার জায়গা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। তাসাউফের নীতি হলো আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান। যা অনেকটা মে'রাজের দৃশ্যের মত- মে'রাজ হলো আল্লাহর কাছে উর্ধ্বারোহন। সংক্ষেপে সূফী পথ হৃদয় এবং আত্মার প্রশিক্ষণের জন্য দরকারী। প্রতিটি মুসলিমের এটির প্রয়োজন আছে।

'আমরা কি তাসাউউফ ব্যতীত চলতে পারি?' এ প্রশ্নটি অনেকটা এরকম যে হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, ইসলামিক আইন, কুরআনের তফসীর এবং অন্যান্য ইসলামী বিজ্ঞান ছাড়া চলতে পারে না। তাসাওউফকে ইসলামের অপ্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বিবেচনা করা অনেকটা

আন্তরিকতা সম্পর্কে জ্ঞান, হৃদয়ের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহকে সেবা করার উপলব্ধিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা। তাসাউফের সংজ্ঞা হলো, এসবের নেক আমল করা। এমনকি যারা এই নামকরণকে প্রত্যাখ্যান করে অথচ এ নীতিগুলোর চর্চা করে তারাও তাসাউফের চর্চা করে বলেই বিবেচনা করা হয়। নীতিমালা কার্যকর থাকলে, নামে কিছু এসে যায় না। আমরা তাসাউফকে বলতে পারি, যুদ বা দুনিয়া বিমুখতা। আল্লাহর ভয় অথবা ধর্মীয় উপলব্ধি, এগুলো সবই একই বাস্তবতা এবং একই উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। এসব কিছুই সবচে' পূর্ণাঙ্গ গুরু এবং মানবজাতির শিক্ষক মহানবী সা. এবং তাঁর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবীদের চর্চারই সংকেতবাহী।

শান্তি এবং প্রশান্তি অর্জনের লক্ষ্যে হৃদয়েরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এমনকি মহানবী সা. যাঁর উপরে কোরআন নাজিল হয়েছিল, ওহী লাভের আগে তাঁরও বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি হেরা পর্বতের গুহায় যেতেন এবং সেখানে ইবাদত এবং ধ্যান করে সময় অতিবাহিত করতেন। ইবাদতের এই বিশেষ তরিকাকে আরবীতে এ'তেকাফ বলে। ওহী লাভের পরও নবীজি এর চর্চা চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং রমজান মাসের শেষ দশদিন মসজিদে ২৪ ঘন্টা ইবাদতের জন্য নিবেদন করতেন। সিনাই পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলার আশীর্বাদধন্য হওয়ার আগে মূসা আ. চল্লিশদিন ইবাদত এবং দৈহিক কামনা বাসনা দমন করে অতিবাহিত করেছেন। ইউসুফ নবী কারাগারে দীর্ঘ বারোটি বছর অতিবাহিত করেছেন। মিশরের শাসক হওয়ার আগে তিনি বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেছেন এবং আল্লাহর বন্দেগী করার মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্বকে নিখুঁত করেছেন। এভাবে তাঁর হৃদয় ক্ষণস্থায়ী সত্ত্বাগুলো থেকে মুক্ত হয়ে কালক্রমে শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হয়েছিল।

মে'রাজের আগে মহানবী ইনশিরাহ (প্রসারণ) অধ্যায়ের অর্থ অনুধাবন করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক হৃদয় খুলে যায় এবং পবিত্র হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার হৃদয় জ্ঞান এবং স্বর্গীয় আলো দ্বারা পূর্ণ করেন। এভাবে তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর ভ্রমণের পথে অসাধারণ ব্যাপারগুলো দেখার প্রস্তুতি নেন। তখন তিনি বস্তুজগৎ থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক জগৎ এর জন্য তৈরী হন।

যদি আল্লাহর নবীরা আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এবং হৃদয় পবিত্র করণের পাঠ নেন তাহলে আমাদের মত সাধারণ মানুষের এই প্রক্রিয়া ছাড়া চলবে কী করে? একটি নাক নোংরা দ্বারা বন্ধ থাকলে ফুল এবং গোলাপের সুগন্ধ নিতে পারে না। যখন জানালা বাষ্প দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তখন আমরা এর মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার কিছু দেখতে পাই না। কিছু চোনা একটি পাত্রের পুরো পানিকে কলুষিত করে দেয়। একিভাবে, আধ্যাত্মিক ময়লা, স্বর্গীয় আলোকায়ন এবং আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ নেয়ার পক্ষে হৃদয়ে প্রবিন্ধকতার কাজ করে।

সব ধরনের জাগতিক অসুখ থেকে হৃদয়কে পবিত্র করার অর্থবহতার উপর গুরুত্ব দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন, **"একদিন সম্পত্তি বা পুত্র সন্তান কোন কিছুই কাজে আসবে না। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে নজতানু একটি সুস্থ্য হৃদয় কাজে আসবে!"** (শু'আরা, ২৬:৮৮-৮৯)

শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল প্রকার মন্দ চিন্তামুক্ত একটি পরিস্কার হৃদয়ের অধিকারী হতে পারা যায়। এ ধরনের প্রশিক্ষণের আগে হৃদয় একখণ্ড কাঁচা লোহার মত থাকে। তারপর এটাকে হাতুড়ী মেরে বাঁকা করে ইচ্ছানুযায়ী আকৃতি দেয়া যায়। একবার আধ্যত্মিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হৃদয়কে পবিত্র করার পর চোখ যা দেখতে পায় না এবং মস্তিস্ক যা বুঝতে পারে না; তাও সে দেখতে এবং বুঝতে পারে। আধ্যাত্মিক পরিব্রাজক হওয়ার আগে রুমী তার নিজের অবস্থাকে বর্ননা করেছেন। অপরিপক্ক হিসেবে যদিও তখন তিনি সেলজুক মাদ্রাসায় একটি উচ্চপদে আসীন ছিলেন। আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার কাছে যখন জগতের রহস্য উম্মোচিত হলো তাঁর এই নতুন পর্যায়কে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন, "আমি পরিশীলিত হয়েছি।"

নবীজির সাহাবীরা এই আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ তৈরী করেছেন। ইসলামের সূচনার আগে তাদের কেউ কেউ এমন হীমশীতল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে, তারা তাদের কন্যা শিশুদের জীবন্ত কবর দিতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তারাই ক্ষমা এবং কোমল হৃদয়ের স্মারক হয়ে ওঠেন।

সংক্ষেপে আমরা তাসাউফের চর্চা না করে হয়তো চলতে পারি। কিন্তু আমরা কখনোই আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে পারবো না। সূফী পদ্ধতি বাদ দিয়ে ইসলাম চর্চা করলে কেউই ইসলাম চর্চার সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না যাকে 'ইহসান' বলে (অর্থাৎ, এমনভাবে ইবাদত করা যেন আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে)।

আলতিনউলুক: আলতিনোলুক এর পাঠকদের আপনি আর কি পরামর্শ দিতে পারেন? আপনার সূফী পথে কারা আপনার আধ্যাত্মিক বন্ধু? আমরা নিশ্চিত যে তারা আপনার গ্রন্থ "ঈমান থেকে ইহসান" এর ইংরেজী তরজমার অপেক্ষা করছে, যেখানে আপনি তাসাউফের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তপবাস: এতক্ষণ আমি যা বলছি তার সাথে সুফী শাইখরা যার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সেই সম্বন্ধে কিছু উপদেশ যোগ করতে চাই। আল্লাহর প্রেরিত দূত মহানবী সা.-এর জীবন এবং অনুশাসনের অলোকে নেয়া নৈতিক প্রশিক্ষণের পদ্ধতিই হল তাসাওউফ। এর উপাদান হলো আল্লাহ এবং রসুলের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনত হওয়া। আল্লাহর সেই সমস্ত বন্ধু যারা ভালবাসার একমাত্র বস্তু হিসেবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে তাদের অন্তরের

কেন্দ্রে স্থান দিচ্ছেন তারা একই সাথে সমগ্র মানবজাতির বন্ধু। ধার্মিক মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রেখে এবং তাদের সুহবতে অংশ নিয়ে সকল মন্দ থেকে নৈতিকতাকে পবিত্র করা যায়। যাদের উচ্চস্তরের আধাত্মিক শক্তি আছে তারা অন্যান্যদের মাঝে সেই শক্তি ছড়িয়ে দিতে পারেন। যেহেতু তারা অহংকারের কুপ্রভাব থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন তাই তারা চারপাশের মানুষদের মধ্যেও সেই একই আধ্যাত্মিক শুদ্ধির স্তর প্রোথিত করতে পারবেন। এ ধরণের মানুষদের পাশে থাকলে যে কোন ব্যক্তি জীবনের সব দিক দিয়ে তার সম্প্রদায়ের জন্য উপকারী হবে।

ভালবাসার মাধ্যমে তাসাউফ শিষ্য (মুরিদ) এবং তার গুরু (শাইখ)-এর মধ্যে আধ্যাত্মিক বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করে। একবার মুরিদ শাখইকে ভালবাসতে এবং শ্রদ্ধা করতে শিখলে শাইখকে সব দিক দিয়ে অনুকরণ করতে পারবে এবং মুরিদের নৈতিকতা মজবুত হবে। সুতরাং মুসলিম হিসাবে আমাদের অন্য যে কোন পদ্ধতির চাইতে ভালবাসতে পারার পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিতৎ। আল্লাহকে আন্তরিকতার সাথে ভালবাসাই ইসলামিক নৈতিকতার ভিত্তি। আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিকে সেবা করাই হচ্ছে ভালবাসা এবং আন্তরিকতার প্রমাণ। ভালবাসা থাকলে কঠিন কাজও স্বাচ্ছন্দ্য এবং সন্তুষ্টির সাথে সম্পন্ন হয়ে যায়। সেবার মহত্ব বিচার করা হয় এর বাস্তবায়নে আত্মোৎস্বর্গের উপর। আন্তরিক সেবা আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতার নির্দেশক। এ ধরনের মানুষদের হৃদয় আল্লাহর বহি:প্রকাশের কেন্দ্র বিন্দু।

যে যত বেশী আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তার হৃদয় ততই আধ্যাত্মিক বাস্তবতার ধারক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যে যত বেশী অহংকার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে ততই সে তার মনুষত্যকে হারিয়ে ফেলে।

'জামিল' (সুন্দর) এবং 'জলিল' আল্লাহর নাম। তাঁর আরও দুইটা নাম 'রাহমান' (করুণাময়) এবং 'রাহিম' (ক্ষমাশীল)। কুরআনে তাঁর অন্যান্য নামের চাইতে এ দুটি নাম অনেক বেশী বার উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং তার প্রভুর অনুকরণে একজন মুসলিমের তার দ্বিতীয় প্রকৃতি বা স্বভাবকে ক্ষমাশীল এবং করুণাময় করা উচিৎ। এই পৃথিবীতে ক্ষমা এবং সমবেদনার অভাবেই যত অন্যায় অবিচার হয়ে থাকে। যারা ভালবাসতে জানে না তারা সহজেই নিপীড়ক এবং স্বৈরাচারী হয়ে যায়। তারা অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভীতি এবং ঘৃণাকে ব্যবহার করে। তারা এই বাস্তবতায় অজ্ঞ যে, যে কোন হৃদয়ই ভালবাসা দ্বারা জয় করা যায়। সূর্য যেমন কখনোই আলো দিতে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না ঠিক তেমনি একটি বিবেচক আত্মার পক্ষে ভালবাসতে না পারাটা এবং অন্য জীবদের প্রতি করুণা প্রদর্শন না করাটা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়।

হাল্লাজ, যারা তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করেছিল তাদের জন্য তিনি বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করার আগে যারা আমাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করেছে তাদের ক্ষমা কর।"

যদি আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক স্তর বা পর্যায় জানতে চাই তবে আমাদের উচিৎ আমাদের কাজ এবং অনুভূতিগুলোর অব্যাহত বিশেষণ করা। বিশেষত আমাদের অহংকারের ভিত্তিহীন দাবীকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অন্যথায় আমরা ইবলিস শয়তানের অবস্থায় পড়ে যাবো। যে তার ঔদ্ধত্য এবং অহংকারের জন্য ঐশ্বরিক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সে জান্নাতের ফেরেশতাদের শিক্ষক ছিল। কিন্তু সে আবেগ এবং আকাঙ্খাগুলো থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সে মানুষদের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভেবেছে এবং তার অহংকারের কারণে অভিশপ্ত হয়েছে।

মনুষ্য প্রকৃতির পাপগুলোকে মওলানা রূমী গোলাপ ঝাড়ের কাঁটার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি আমাদের উপদেশ বা পরামর্শ দেন। আমরা যেন আমাদের প্রকৃতিকে মিষ্টি গোলাপের মত করে তৈরী করি; কাঁটার মত নয়। পৃথিবীর বাগানে কাঁটা আমাদের ক্ষতির কারণ হয় কিন্তু আমাদের আত্মাকে সে রকম হতে দেয়া উচিৎ নয়। বরঞ্চ আমরা অনুর্বর মাটিকে গোলাপ বাগানে রূপান্তরিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য ও নোট

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....